সিরিজ
নারীর ফাঁদ-৪
ঐতিহাসিক উপন্যাস
ঈমানদীপ্ত
দাস্তান
আলতামাস

নারীর ফাঁদ-৪

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

নারীর ফাঁদ-৪

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাস

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

আবাবীল পাবলিকেশন্স

নারীর ফাঁদ-৪
ঈমানদীপ্ত দাস্তান
আলতামাস

প্রকাশক
মাওলানা আবদুল করীম
চেয়ারম্যান, আবাবীল পাবলিকেশন্স
১৩/১, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০০৩
দ্বিতীয় প্রকাশ
অক্টোবর ২০০৪

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার, ঢাকা

মুদ্রণ
কালার সিটি

গ্রাফিক্স
কালার ক্রিয়েশন

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

IMANDIPTO DASTAN-4 : BY ALTAMAS. PUBLISHED BY MAULANA ABDUL KARIM, ABABIL PUBLICATIONS, 13/1, KARKONBARI LANE, DHAKA-1100. 2ND EDITION : OCTOBER 2004

PRICE : TAKA 100.00 ONLY

প্রকাশকের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসনকাল। পৃথিবী থেকে– বিশেষতঃ মিসর থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। তারা সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর নানামুখী সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার পাশাপাশি বেছে নেয় নানারকম কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ। গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী ভয়াবহ অভিযানে মেতে উঠে তারা। মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করে অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী মেয়েদের। তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে একদল ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়।

ইসলামের মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরম বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দুঃসাহসিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিনিয়ে আনেন বিজয়।

সুলতান আইউবী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অস্ত্রের আঘাত হেনেছিল, ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃস্টানদের নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও ছলনাময়ী রূপসী নারীদের লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসক ও আমীরদের ঈমান ক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্র এবং সুলতান আইউবীর তার মোকাবেলা করার কাহিনী এড়িয়ে গেছেন অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ। সেইসব অকথিত কাহিনী ও সুলতান আইউবীর দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হল সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'।

বইটির মূল লেখক পাকিস্তানের প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাস। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত মূল বইটির নাম 'দাস্তান ঈমান ফোরোশূ কী'। আল্লাহ তাআলার পরম অনুগ্রহে অন্তত ৭-৮ খণ্ডে সমাপ্য অনূদিত সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'-এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠক মহলে বেশ সমাদর লাভ করেছে। এবার চতুর্থ খণ্ডটি পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম। একে একে অপর খণ্ডগুলোও যাতে আমরা যথাসময়ে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারি; আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করেন।

ভয়াবহ সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান আইউবীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ভরপুর এই সিরিজ বইটি ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়েপড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি বইটি পূর্ণমাত্রায় উপন্যাসের স্বাদও যোগাবে। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

বিনীত

মাওলানা আবদুল করীম

চেয়ারম্যান

আবাবীল পাবলিকেশন্স

সূচীপত্রঃ

*সর্পকেল্লার ঘাতক.....................৭

*ক্রুশের ছায়াতলে......................৫৩

*ভয়াবহ ষড়যন্ত্র.......................১০৭

*রক্ত চাই.................................১৬৩

*ভয়ংকর ষড়যন্ত্র.......................২০৩

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সর্পকেল্লার ঘাতক

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যখন দামেস্কে প্রবেশ করেন, তখন তার সঙ্গে ছিল সাতশ' অশ্বারোহী যোদ্ধা। সকল ঐতিহাসিক এ সংখ্যা-ই লিখেছেন। কিন্তু ইতিহাস সুলতান আইউবীর সেই জানবাজদের ব্যাপারে বে-খবর, যাদের কেউ বণিকের বেশে, কেউ সাধারণ পর্যটকরূপে এবং কেউ সিরীয় সাধারণ সৈনিকের পোশাকে– একজন, দু'জন, চারজন– এভাবে দলবদ্ধ হয়ে দামেস্কে প্রবেশ করেছিল। তাদের অধিকাংশই সুলতান আইউবীর নীরব হামলার আগেই এখানে এসে পৌঁছেছিল। আর কতিপয় প্রবেশ করেছিল তখন, যখন সুলতান আইউবীর জন্য দামেস্কের দ্বার খোলা হয়েছিল। এরা সবাই ছিল জানবাজ গোয়েন্দা। তারা সর্বপ্রকার লড়াই, সব ধরনের অস্ত্রের ব্যবহার ও নাশকতামূলক কাজে পারঙ্গম ছিল। মানসিক দিক থেকে তারা ছিল অত্যন্ত দৃঢ়, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তাদের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, তারা জীবনের পরোয়া করত না। তারা এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে ফেলত, যার কল্পনা করলে সাধারণ সৈনিকরা শিউরে ওঠত। এ কাজের জন্য এমন যুবকদের বেছে নেয়া হত, যাদের অন্তর দ্বীনি চেতনা ও দুশমনের ঘৃণায় পরিপূর্ণ থাকত। কাজকর্ম দেখলে এ জানবাজদের উন্মাদ মনে হত। সুলতান আইউবী এমন জানবাজদের কয়েকটি ইউনিট প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

সাতশ' অশ্বারোহী নিয়ে সুলতান আইউবী যখন দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হন, তার আগেই তিনি একদল জানবাজ গোয়েন্দাকে জরুরী নির্দেশনা প্রদান করে দামেস্কে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, দামেস্কের ফৌজ যদি মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়, তাহলে তোমরা নগরীতে নিজেদের বুঝ ও প্রয়োজন অনুপাতে নাশকতা পরিচালনা করবে এবং ভিতর থেকে নগরীর ফটক খুলে দেয়ার চেষ্টা করবে। তারা ছিল জনমনে ত্রাস সৃষ্টি ও গুজব ছড়ানোর কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এই জানবাজদের সংখ্যা ছিল দু' থেকে তিনশ'র মত। সে সময়কার ঐতিহাসিকগণ এদের সুনির্দিষ্ট কোন সংখ্যা উল্লেখ করেননি। শুধু লিখেছেন যে, সুলতান আইউবীর আগমনের সময় দামেস্কে দু'-তিনশ' গোয়েন্দা ও নাশকতাকারী অবস্থান করছিল।

একজন ফরাসী ঐতিহাসিক ক্রুসেড যুদ্ধের পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সুলতান আইউবীর লড়াকু গোয়েন্দাদের সম্পর্কে অনেক কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সুলতান আইউবীর এই জানবাজদের ইসলামী চেতনাকে 'ধর্মীয় উন্মাদনা' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, এই গোয়েন্দাগুলো 'মানসিক রোগী' ছিল। তারা 'ধর্মীয় উন্মাদনা'কে 'মানসিক ব্যাধি' বলে নিন্দা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে সেটি একটি মানসিক অবস্থাই ছিল বটে। একজন মুসলমান তখনই প্রকৃত ঈমানদার বলে পরিগণিত হয়, যখন ধর্ম তার মনন ও মানসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। সুলতান আইউবীর এই জানবাজদের গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতার প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন আলী বিন সুফিয়ান এবং তার দু'নায়েব হাসান বিন আব্দুল্লাহ ও জাহেদান। আর যুদ্ধের প্রশিক্ষণ পেয়েছিল অভিজ্ঞ সৈন্যদের হাতে।

সুলতান আইউবী দামেস্কে প্রবেশ করলেন। আলী বিন সুফিয়ানকে রেখে এসেছেন কায়রো। ওখানকার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ভালো নয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছেন আলী। সুলতান আইউবীর অনুপস্থিতি, তাঁর দামেস্কের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ ও খেলাফতের পতন– সবমিলে অরাজকতার আশংকা বেড়ে গেছে কায়রোতে। এসব কারণেই সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে রেখে এসেছেন। দামেস্কে এসেছেন আলীর এক নায়েব হাসান বিন আব্দুল্লাহ। তিনিই লড়াকু জানবাজদের কমান্ডার।

সুলতান আইউবী দামেস্ক কব্জা করার পর সেখানকার অধিকাংশ ফৌজ সালার তাওফীক জাওয়াদের নেতৃত্বে সুলতানের সঙ্গে যোগ দেয়। অবশিষ্ট ফৌজ, খলীফার দেহরক্ষী বাহিনী, খলীফা ও তার অনুচর আমীরগণ দামেস্ক ছেড়ে পালিয়ে যায়। ধারণা ছিল, গ্রেফতার করার জন্য সুলতান তাদের পেছনে ফৌজ প্রেরণ করবেন।

কিন্তু না, তিনি এমন কিছু করলেন না। দু'-তিনজন সালার সুলতানকে এমনও বলেছিলেন যে, এই আমীর-ওমরাদের গ্রেফতার করা আবশ্যক। অন্যথায় তারা কোথাও গিয়ে সংগঠিত হবে এবং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

'আর আমি এ-ও জানি যে, তারা খৃস্টানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং পেয়েও যাবে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'কিন্তু আমি অন্ধকারে পথ চলি না। আমাকে প্রথমে জানতে হবে, তারা কোথায় যাচ্ছে এবং কোথায় জড়ো হচ্ছে। আপনারা অস্থির হবেন না। আমার চোখ-কান পলায়নকারীদের

সঙ্গে লেগে আছে। তারা এত তাড়াতাড়ি হামলা করার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে না। আমি দেখছি, খৃস্টানরা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারা মিশরে আক্রমণ চালাতে পারে। পারে সিরিয়ায় হামলা করতে। তারা সম্ভবত আমি কি করি, দেখার অপেক্ষায় আছে। তারা হয়ত আমার পদক্ষেপের উপর ভিত্তি করে নিজেরা পদক্ষেপ নিতে চাইছে। আপনারা আমার নির্দেশনা মোতাবেক সেনা প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধ মহড়া অব্যাহত রাখুন।'

সুলতান আইউবী যাদেরকে নিজের 'চোখ-কান' বলে অভিহিত করেছিলেন, তারা হল মিশর থেকে আগত একদল গোয়েন্দা। খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ও তার আমীর-উজীরগণ যখন দামেস্ক ত্যাগ করে পালিয়ে যায়, তখন সুলতান আইউবীর এই গোয়েন্দারাও তাদের সঙ্গ নেয়। পলায়নকারীদের সংখ্যা কম ছিল না। দেশের সকল আমীর-উজীর এবং বেশ ক'জন জাগীরদার-মোসাহিবও ছিল তাদের সঙ্গে। ছিল কতিপয় সেনা সদস্য এবং চাটুকার। তারা পালিয়ে গেছে বিক্ষিপ্তভাবে। সুলতান আইউবীর গোয়েন্দাদের তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়া কঠিন ছিল না। পদচ্যুত খলীফা আল মালিকুস সালিহ ও তার আমীরগণ কোথায় যায়, কি করে, পাল্টা আক্রমণ করে কিনা এবং খৃস্টানদের থেকে তারা কী পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছে– এসব ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা-ই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এই গুপ্তচররা হল হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর নির্বাচিত লোক। তারা উদ্ভূত পরিস্থিতির রাজনৈতিক মূল্যায়নও বেশ ভাল করেই বুঝত।

তাদের একজন হল মাজেদ ইবনে মুহাম্মদ হেজাজী। সুদর্শন যুবক, সুঠাম দেহ; সর্বোপরি আল্লাহ তাকে দান করেছেন জাদুকরী মধুর ভাষা। সুলতান আইউবীর সব গোয়েন্দাই সুশ্রী, সুঠাম, স্বাস্থ্যবান ও স্বচ্চরিত্রের অধিকারী। তাদের না আছে নেশার অভ্যাস, না তারা বিলাসী। তাদের চরিত্র আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ। মাজেদ হেজাজী তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতায় তার চেহারায় নূর চমকায়। সে-ও দামেস্ক ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আরবের উন্নত জাতের একটি ঘোড়া তার বাহন। সঙ্গে আছে তরবারী আর ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা চকচকে ফলাবিশিষ্ট বর্শা।

বিজন মরুভূমিতে একাকী পথ চলছে মাজেদ। তার একজন সঙ্গীর প্রয়োজন– এমন সঙ্গী, যার দ্বারা তার এই মিশন উপকৃত হবে। মাজেদ দেখতে পায়, বেশকিছু লোক হাল্‌ব অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গী

হিসেবে তাদের একজনও তার পছন্দ হল না। কারণ, সফরসঙ্গী হিসেবে তার প্রয়োজন পদস্থ কোন সেনা অফিসার কিংবা এমন একজন লোক, যার আল-মালিকুস সালিহ সম্পর্কে জানাশোনা আছে।

পালিয়ে আসা খলীফাকে খুঁজে ফিরছে মাজেদের অনুসন্ধানী চোখ। কয়েকজন লোককে সে জিজ্ঞেসও করেছে যে, আল-মালিকুস সালিহ কোন্‌দিক গেছেন। কিন্তু কেউ কোন তথ্য দিতে পারেনি। তার জানা ছিল, আল-মালিকুস সালিহ সুলতান জঙ্গীর সমবয়স্ক ব্যক্তি নন, বরং তিনি এগার বছর বয়সের বালক মাত্র, যাকে স্বার্থপূজারী আমীরগণ তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সালতানাতের মসনদে বসিয়েছিল। শাসনক্ষমতা মূলত ছিল তাদেরই হাতে। মাজেদ হেজাজীর আন্দাজ করা কঠিন ছিল না যে, এই কিশোর খলীফা একাকী যাচ্ছেন না। তার সঙ্গে আছে তার আমীর-উজীর ও দরবারীদের বিরাট বহর। বহরে থাকছে সোনা-দানা ও মূল্যবান সম্পদ বোঝাই অসংখ্য উট।

মাজেদ হেজাজী ভেবে রেখেছে– এই কাফেলাটি পাওয়া গেলে কি করতে হবে এবং তাদের মনের কথা কিভাবে বের করা যাবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত শিকারের সন্ধান পেল না মাজেদ। সামনে পার্বত্য এলাকা। আশাপাশে সবুজের সমারোহ। পর্বতমালার গভীর প্রবেশ করে মাজেদ।

মাজেদ একস্থানে দু'টি ঘোড়া দেখতে পায়। সেখান থেকে খানিক দূরে সবুজ ঘাসের উপর শুয়ে আছে একজন পুরুষ। সঙ্গে একজন মহিলা। মহিলাও শায়িত। মাজেদ থেমে যায়। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে একটি গাছের নীচে বসে পড়ে। তার বিশ্রামের প্রয়োজন।

হঠাৎ হ্রেষারব তুলে একটি ঘোড়া। ঘোড়ার শব্দ শুনে শোয়া থেকে ওঠে বসে লোকটি। মাজেদ ভালভাবে দেখতে পায় তাকে। পোশাক-আশাকে প্রমাণ মেলে লোকটা উঁচু শ্রেণীর। মাজেদ হেজাজীর প্রতি চোখ পড়ে তার। ইশারায় তাকে নিজের কাছে ডাকে।

মাজেদ তার নিকটে চলে যায়। তার সঙ্গে হাত মিলায়। মহিলাও উঠে বসে। মহিলা নয়– এক রূপসী যুবতী। যুবতীর গলার হার প্রমাণ করছে, মেয়েটি কোন সাধারণ ঘরের সন্তান নয়। লোকটির বয়স চল্লিশের মতো মনে হল। আর যুবতীর বয়স পঁচিশেরও কম। মাজেদ হেজাজী এক দৃষ্টিতেই আন্দাজ করে নেয় দু'জনকে।

'তুমি কে?'– লোকটি মাজেদ হেজাজীকে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কি দামেস্ক থেকে এসেছ?'

'আমি দামেস্ক থেকেই এসেছি'– মাজেদ জবাব দেয়– 'কিন্তু আমি কে, সে কথা আপনাকে বলতে পারব না। আপনাদের পরিচয় বলুন?'

'বোধ হয় আমরা একই পথের পথিক'– লোকটি মুচকি হেসে বলল– 'তুমি সম্ভ্রান্ত লোক বলে মনে হচ্ছে।'

'আমি সম্ভ্রান্ত না বদমাশ, তা কি আপনি নিশ্চিত হতে চান?'– দু'ঠোঁটের মাঝে মুচকি হাসির রেখা টেনে মাজেদ বলল– 'যার সঙ্গে এমন একটি রূপসী যুবতী আছে আর যুবতীর গলায় এত মহামূল্যবান হার আছে এবং সঙ্গে আরো মূল্যবান সম্পদ আছে, সে যে একজন পথচারীকে বদমাশ আর দস্যু মনে করবে, তা বিচিত্র কিছু নয়। আমি দস্যু নই। তবে নিজের জীবন বিলিয়ে হলেও আপনাদেরকে দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। দামেস্ক থেকে পালিয়ে আসা কিছু লোক পথে দস্যুর কবলে পড়েছিল। আমি পথে তাদের দু'টি লাশও দেখে এসেছি। পরিস্থিতিটা দস্যু-তস্করদের জন্য খুবই অনুকূল যে, মানুষ ধন-দৌলত নিয়ে দামেস্ক থেকে পালিয়ে যাচ্ছে আর ওরা ধরে ধরে লুট করছে।'

সহসা মেয়েটির লাবণ্যময় চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। সঙ্গী পুরুষটির গা ঘেঁষে জড়সড় হয়ে বসে। লোকটির মুখমণ্ডলেও ভীতির ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এবার মাজেদ হেজাজী বুঝে গেছে, এরা কারা এবং কী এদের মিশন। মাজেদ তাদের মনে ভীতি সৃষ্টি করে নিজের জাদুকরী ভাষার কারিশমা দেখাতে শুরু করে। কথা প্রসঙ্গে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সমালোচনা করে এবং এমনভাবে খলীফা আল-মালিকুস সালিহ'র প্রশংসা করে, যেন তিনিই জগতের একমাত্র মহান ব্যক্তিত্ব। মাজেদ তাদেরকে আরো প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বলল– 'সালাহুদ্দীন আইউবী দামেস্ক থেকে পলায়নরত আপনার ন্যায় লোকদের সম্পদ লুণ্ঠন এবং তাদের সুন্দরী মেয়েদের ছিনিয়ে নেয়ার জন্য এদিকে তার ফৌজ লেলিয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা, এই মেয়েটি আপনার কী হয়?'

'আমার স্ত্রী।' লোকটি জবাব দেয়।

'আর দামেস্কে ক'টি রেখে এসেছেন?' মাজেদ জিজ্ঞেস করে।

'চারটি।' লোকটি জবাব দেয়।

'আল্লাহ করুন, এই পঞ্চমজন আপনার সঙ্গে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে যায়।' মাজেদ বলল।

'আচ্ছা, আইউবীর ফৌজ এখান থেকে কত দূরে?'– লোকটি জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কি সৈন্যদেরকে লুট করতে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, দেখেছি'– মাজেদ জবাব দেয়– 'যদি বলি, আমিও সালাহুদ্দীন আইউবীর একজন সৈনিক, তাহলে আপনি কী করবেন?'

লোকটি কাঁপতে শুরু করে। আবার পরক্ষণেই হাসতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার কম্পিত ঠোঁটের ব্যর্থ হাসির রেখা মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। বলে– 'আমি তোমাকে কিছু দিয়ে দেব। তোমার প্রতি আমার নিবেদন, তুমি আমাকে ভিখারীতে পরিণত কর না। আরো আবেদন করব, এই মেয়েটাকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিও না।'

মাজেদ হেজাজী খিল খিল করে হেসে ফেলে। হাসি বন্ধ করে বলে– 'ধন আর নারীর মোহ মানুষকে ভীরু ও দুর্বল করে তোলে। কেউ যদি মাথার উপর তরবারী উঁচিয়ে বলে, সঙ্গে যা আছে দিয়ে দাও; তাহলে আমি নিজের তরবারীটা কোষমুক্ত করে বলব, আগে আমাকে খুন কর, তারপর আমার সঙ্গে যা পাও নিয়ে যাও। জনাব! বলে ফেলুন, আপনি কে? দামেস্কে আপনি কী ছিলেন? আর এখন যাচ্ছেন কোথায়? সত্য বললে হয়ত আমিই হব আপনার একনিষ্ঠ মোহাফেজ। আমার মনে হচ্ছে, আপনাদের আর আমার গন্তব্য এক। আমি আইউবীর ফৌজের সেনা বটে, তবে দলত্যাগী।'

চরমভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে লোকটি। সে অকপটে নিজের আসল পরিচয় ও ইতিবৃত্ত ব্যক্ত করে মাজেদ হেজাজীর নিকট। লোকটি দামেস্কের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জাগীরদার। রাজ দরবারে তার অনেক মর্যাদা ছিল। সালতানাতের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক বিষয়ে বেশ দখল ছিল। খলীফার দেহরক্ষী বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিকই ছিল তার দেয়া। এক কথায় বলা চলে, এই লোকটি সরকারের উচ্চপর্যায়ের একজন কর্মকর্তা ছিল। সুলতান আইউবীর দামেস্ক অনুপ্রবেশের পর যখন পলায়নের প্রয়োজন দেখা দিল, তখন তার ঘর থেকে বের হতে একটু বিলম্ব হয়ে যায়। আল-মালিকুস সালিহ্ তার অনুচরদের বলে দিয়েছিলেন, আমি হাল্‌ব পৌঁছে যাব, তোমরাও সেখানে চলে এস। সে মতে এই জাগীরদারও হাল্‌ব-এর দিকেই যাচ্ছে। লোকটি এও বলে দেয় যে, আমার সঙ্গে প্রচুর সোনা-রূপা ও মণি-মাণিক্য আছে। স্ত্রী চারজনকে দামেস্কে ফেলে এসেছে। এটি সকলের ছোট ও রূপসী বলে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। লোকটি অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে জানায়, তার রক্ষীবাহিনী ও সকল চাকর-বাকর দামেস্কেই তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। তারা তার সব লুট করে নিয়ে গেছে।

লোকটির কাহিনী শুনে মাজেদ হেজাজী বেশ আনন্দিত হয়। তার বড় কাজের লোক এই জাগীরদার। অন্তত হাল্‌বের দরবার পর্যন্ত পৌঁছা যাবে এর সঙ্গে।

মাজেদ হেজাজী তাকে নিজের পরিচয় প্রদান করে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী মিশর থেকে যে ফৌজ দামেস্কে নিয়ে এসেছেন, আমি তার একটি ব্যাটলিয়নের কমান্ডার। কিন্তু আমি আল-মালিকুস সালিহ'র অনুরক্ত। এ জন্য দলত্যাগ করে আইউবীর ফৌজ থেকে পালিয়ে এসেছি এবং খলীফার দরবারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পথ চলছি। খলীফা যদি আমাকে পছন্দ করেন, তাহলে তার রক্ষী বাহিনীতে যোগ দেব।

'আমি যদি এখনই তোমাকে আমার রক্ষী বানিয়ে নেই, তাহলে তোমাকে কত বেতন দিতে হবে?' লোকটি মাজেদ হেজাজীকে জিজ্ঞেস করে– 'আমি দামেস্কে যেমন রাজা ছিলাম, ওখানেও তা-ই থাকব। আমার রক্ষী হলে তোমার ভাগ্য বদলে যাবে।'

'আপনি যদি আমাকে আপনার মোহাফেজ নিয়োগ করেন, তাহলে আপনার আর সামরিক উপদেষ্টার প্রয়োজন হবে না।'– মাজেদ হেজাজী বলল– 'আর যোগ্যতা দেখে পারিশ্রমিক আপনিই ঠিক করে নেবেন। আমি এখনই কিছু বলব না।'

মাজেদ হেজাজী লোকটির বডিগার্ড হয়ে যায়। কথাটা এভাবেও বলা যায় যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একজন গুপ্তচর একজন দরবারী জাগীরদারের ঘনিষ্ঠজনে পরিণত হয়ে যায়।

সময়টা সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত। অল্প পরেই সূর্য অস্তমিত হয়ে আঁধার নেমে আসবে। আজকের মতো আর সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় নেই। মাজেদ হেজাজীর পরামর্শে তারা ওখানে রাত কাটানোর আয়োজন করে। রাত পোহাবার পর জাগীরদার এখন নিশ্চিত– মাজেদ বিশ্বস্ত, তারই একজন।

❁ ❁ ❁

দীর্ঘ সফরের পর তারা হাল্‌ব গিয়ে পৌঁছে। সে সময়ে হাল্‌ব-এর আমীর ছিলেন শামসুদ্দীন, যিনি অল্প ক'দিন আগে খৃস্টানদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। আল-মালিকুস সালিহ্ দামেস্ক থেকে পালিয়ে তার নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার সকল আমীর ও উজীর তার সঙ্গে। দেহরক্ষী বাহিনীও তথায় পৌঁছে গেছে।

আল-মালিকুস সালিহ হাল্‌ব-এর শাসনক্ষমতা হাতে তুলে নেন। সেনা বাহিনীকেও নতুনভাবে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তার কাছে সোনাদানা ও সম্পদের অভাব ছিল না। অভাব ছিল ফৌজ, কমান্ডার ও উপদেষ্টার। তিনি এবং তার অনুচরদের ভাবনা, কিভাবে সুলতান আইউবীকে

পরাজিত করে 'খেলাফত' বহাল করা যায়। তাদের ভাবনা ও অস্থিরতা প্রমাণ করে, তাদের দুশমন খৃষ্টানরা নয়– সুলতান আইউবী। তারা এদিক-ওদিকের আমীরদের নিকট খলীফার সীল-স্বাক্ষরযুক্ত বার্তা প্রেরণ করে যে, সালতানাতের প্রতিরক্ষার জন্য তোমরা খলীফাকে সামরিক সাহায্য প্রদান কর। তাদের কারো নিকট থেকে আশাব্যঞ্জক জবাব পাওয়া গেল, কারো নিকট থেকে পাওয়া গেল মৌখিক প্রতিশ্রুতি।

এই জাগীরদার হাল্ব পৌঁছলে খলীফা তাকে স্বাগত জানান। ইনি ছিলেন খলীফার সামরিক উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য। বসবাসের জন্য হাল্বে তাকে একটি ভবন প্রদান করা হল। এখানে এসেই তিনি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, ঘর থেকে সকালে বের হচ্ছেন তো ফিরছেন মধ্যরাতে।

তার এই অনুপস্থিতির সুযোগে তার স্ত্রী ঝুঁকে পড়তে শুরু করে মাজেদ হেজাজীর প্রতি। সুযোগটাকে লুফে নেয় মাজেদ। সে আত্মমর্যাদা ও চারিত্রিক পবিত্রতা বজায় রেখে মেয়েটাকে ঘনিষ্ঠ করে নেয়। মেয়েটা মাজেদ হেজাজীর প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে যে, মাজেদ হেজাজী যে তার স্বামীর একজন দেহরক্ষী, সে তা ভুলেই গেছে। এই ফাঁকে মাজেদ অগ্রসর হচ্ছে তার মিশন নিয়ে। সে দু'-তিন দিনের মধ্যেই মেয়েটাকে পুরোপুরি মুঠোয় নিয়ে আসে। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার স্বামীর অন্য চার স্ত্রী কেমন ছিল?'

মেয়েটি বলল, 'খারাপ তেমন ছিল না। পুরাতন বিধায় তিনি তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে ফেলে আমাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছেন।'

'আর একদিন তোমাকেও ফেলে অন্য কাউকে নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে যাবে। এই আমীরদের কাজই এই।' মাজেদ বলল।

'আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে আমার মনের কথা বলি, তা আমার স্বামীকে বলে দেবে না তো? আমার সঙ্গে তুমি প্রতারণা করবে না তো!' মেয়েটি বলল।

'দেখ, আমার চরিত্রে যদি ধোঁকা-প্রতারণা বলে কিছু থাকত, তাহলে ঐ যেখানে তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তোমার স্বামীকে খুন করে সেখানেই আমি তোমাকে ও তোমাদের ধন-দৌলত ছিনিয়ে নিতাম।' মাদেজ বলল। আরো বললো, 'আমি পুরুষ, একজন নারীর সঙ্গে প্রতারণা করা পুরুষের মর্যাদার খেলাফ।'

'হৃদয়ের গোপন কথাটা আর চেপে রাখতে পারছি না আমি'– মেয়েটি বলল– 'আমি তোমাকে ভালবাসি মাজেদ! আর আজ এ কথাটাও আমি গোপন রাখছি না যে, আমি আমার স্বামীকে ঘৃণা করি। আমি কারো স্ত্রী নই। আমি

বিক্রি হওয়া মেয়ে। আমি বহুবার আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সম্ভবত আমি ভীরু। আত্মহত্যা করার সাহসটুকুও আমার নেই। আমার ইচ্ছে ছিল এক, করছি আরেক। এবার তুমি আমার ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল করে দিয়েছ যে, আত্মহত্যা আমাকে করতেই হবে।'

'তার মানে আমাকে ভালবাস বলে তুমি আত্মহত্যা করতে চাচ্ছ?'

'না'– মেয়েটি বলল– 'আমার বিশ্বাস ছিল, সালাহুদ্দীন আইউবী নুরুদ্দীন জঙ্গী অপেক্ষা যোগ্য ও মহৎ মানুষ। কিন্তু তুমি আমার সেই বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছ। আচ্ছা, সালাহুদ্দীন আইউবী কি এতই খারাপ, যেমনটা তুমি বলেছিলে?'

মাজেদ হেজাজীর ভাবান্তর ঘটে যায়। বুঝতে পারে আঘাতটা ওর কোথায় লেগেছে। বলল– 'তুমি তোমার মনের গোপন কথা আমাকে বলে দিয়েছ– তার বিনিময়ে আমিও আমার একটি গোপন কথা তোমাকে বলছি। আমি তোমার থেকে কোন ওয়াদা নেব না যে, আমার এই গোপন কথা তুমি কাউকে বলতে পারবে না। শুধু এতটুকু বলে রাখব, আমার ভেদ যদি ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে তুমিও বাঁচবে না, তোমার স্বামীও নয়। শোন, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর একজন গুপ্তচর। আমি দু'-চার দিনেই তোমার আসল পরিচয় টের পেয়ে গেছি। শোন, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে যতটা পবিত্র ভেবেছিলে, তিনি তার চেয়েও বেশী পবিত্র, বেশী মহৎ। তিনি সেইসব আমীর ও রাজা-বাদশাহদের দুশমন, যারা নারীদেরকে হেরেমে আবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি নারীদেরকে বিনোদন ও ভোগের সামগ্রী মনে করেন না। তিনি নারীর মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষা এবং পুরষদের জন্য বহু বিবাহ-বিলাসিতা পছন্দ করেন না। নারীদেরকেও তিনি সমরবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে চান। আমি তোমার স্বামীর আস্থা অর্জনের জন্য মিথ্যা বলেছিলাম যে, আইউবী দামেস্ক থেকে পলায়নকারী লোকদের লুণ্ঠন ও তাদের মেয়েদের তুলে নেয়ার জন্য বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছেন। তিনি ইসলামের পতাকাবাহী। আমি ইসলামের বিজয় ও সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্য এখানে একটি মিশন নিয়ে এসেছি।'

সহসা মেয়েটির চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। দু'হাতে মাজেদ হেজাজীর একটা হাত চেপে ধরে টেনে মুখের কাছে নিয়ে চুমো খেয়ে বলল, 'তোমার এই ভেদ কখনো ফাঁস হবে না। আমাকে বল, এখানে তুমি কেন এসেছ এবং আমি তোমার জন্য কী করতে পারি? বল, সালাহুদ্দীন আইউবী আসলে কেমন মানুষ। নুরুদ্দীন জঙ্গীর জীবদ্দশায় আমরা একটি মহিলা সংগঠন করেছিলাম।

আমরা খৃস্টানদের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলাম। জঙ্গীর স্ত্রী আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু আমি এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হয়ে কাজ করি, আমার পিতা তা পছন্দ করতেন না। তিনি একজন মোহান্ধ ও চাটুকার মানুষ। তার নিকট ক্রুশ ও চাঁদ-তারার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। যে তার হাতে ক'টি টাকা গুঁজে দেয়, তিনি তারই গোলাম হয়ে যান। তিনিই এই লোকটির কাছে আমাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। এই সওদাকে মানুষ বিবাহ বলে। তুমি তো জান, একজন মুসলিম নারী সুযোগ পেলে যুদ্ধের ময়দানে পুরুষদেরকেও তাক লাগিয়ে দিতে পারে। পারে দুশমনের হাঁটু ভেঙ্গে দিতে। কিন্তু সে নারীকেই যখন হেরেমে বন্দী করে ফেলা হয়, তখন সে পিপিলিকায় পরিণত হয়ে যায়। আমার দশাটা তা-ই হয়েছে। আমার স্বামী যদি সাধারণ মানুষ হতেন, তাহলে আমি অবশ্যই বিদ্রোহ করতাম, তার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তার শক্তি আছে, আছে সম্পদ। খলীফা আল-মালিকুস সালিহ'র রক্ষী বাহিনীর অর্ধেকই তার লোক।'

'তার আরো চারটি বউ আছে। কিন্তু তাদের অপেক্ষা আমার বয়স কম ও রূপসী বিধায় তিনি আমাকে তার খেলনা বানিয়ে রেখেছেন। আমার আত্মা মরে গেছে। বেঁচে আছে শুধু দেহটা। বাইরের জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমি বন্দী হয়ে যে জগতে পড়ে ছিলাম, সেখানে মদ আর নাচগান ছাড়া কিছুই ছিল না। হ্যাঁ, ছিল আরো একটি বিষয়। তাহল, নুরুদ্দীন জঙ্গী ও সালাহুদ্দীন আইউবীর হত্যার পরিকল্পনা।'

বলতে বলতে মেয়েটি থেমে যায়। আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে তার। বার কয়েক ঢোক গিলে দু'হাতে মাজেদ হেজাজীর বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'শুনছ কি ভাই আমার কথা? তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর না আমার স্বামীর, সেই পরিচয় বাদ দিয়েই আমি তোমাকে আমার মনের কথাগুলো বলে দিচ্ছি। আমি জানি, জানতে পারলে আমার স্বামী আমাকে শাস্তি দেবেন– নির্মম শাস্তি। কিন্তু আমি যে কোন শাস্তি ভোগ করতে প্রস্তুত আছি। আমার এখন দেহ ছাড়া আর কিছুই নেই। দেহটাও পাথর হয়ে গেছে। আমার আত্মা মরে গেছে।

'না, তোমার আত্মা জীবিত আছে'– মাজেদ হেজাজী বলল– 'আমার চোখ হৃদয়ের গভীরে দেখতে পায়। আমি দেখেছি, তোমার আত্মা বেঁচে আছে। অন্যথায় কখনো আমি তোমার সম্মুখে আমার ভেদ প্রকাশ করতাম না। আমি রূপ-যৌবনের কাছে পরাজিত হওয়ার মত মানুষ নই। আমি পুরুষ। নিজের

জীবনটা ইসলামের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছি। তুমি বলে যাও, হৃদয়ের বোঝা হাল্কা করতে থাক। আমি শুনছি। তোমার কাহিনী আমার কাছে নতুন কিছু নয়। এটা প্রতিটি মুসলিম নারীর কাহিনী। যেদিন প্রথম একজন মুসলমান হেরেম নামক ভোগ্যালয়ে রূপসী মেয়েদের বন্দী করেছিল, সেদিন থেকে ইসলামের পতন শুরু হয়েছিল। খৃস্টানদের পরিকল্পনা, তারা আমাদেরকে নারীর হাতে খুন করাবে। তারাই তাদের মেয়েদের দ্বারা আমাদের রাজা-বাদশাদের হেরেম ভরে রেখেছে।'

'আমার স্বামীর ঘরেও এই একই ঘটনা ঘটেছে'– মেয়েটি বলল– ' আমি খৃস্টান মেয়েদের আমার স্বামীর ঘরে আসতে এবং মদপান করতে দেখেছি। চোখের পানি ফেলা ছাড়া আমার তখন কিছুই করার ছিল না। আমি এ জন্যে কাঁদতাম না যে ওরা আমার স্বামীকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। আমার কান্নার কারণ ছিল, ওরা আমার থেকে সেই ইসলামকে ছিনিয়ে নিচ্ছে, যার জন্য তোমার ন্যায় আমিও আমার জীবন ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলাম।'

'আবেগ ত্যাগ কর। এস, কাজের কথা বলি। আমি যে মিশন নিয়ে এখানে এসেছি, কাজ শুরু করা প্রয়োজন'– মাজেদ হেজাজী বলল– 'আচ্ছা, স্বামীর উপর তোমার প্রভাব কেমন? তুমি কি তার মনের কথা বের করতে পারবে?'

'দু-পেয়ালা মদপান করিয়ে তার মাথাটা আমার বুকের সঙ্গে লাগিয়েই আমি তার মনের সব ভেদ বের করে ফেলতে পারব'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'কি তথ্য বের করতে হবে বল।' তারপর একটুখানি ভেবে মুচকি হেসে মেয়েটি বলল, 'তুমি আমার একান্ত ব্যক্তিগত একটি দাবি মানবে কিনা বল– আমি যদি তোমার কাজ আদায় করে দিতে পারি, তাহলে তুমি আমাকে এখন থেকে উদ্ধার করবে , আমার এই আশা পূরণ হবে কি? আমার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করবে না তো?'

'হবে, তোমার এই মনোবাসনা পূরণ হবে। আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব। তোমার ভালবাসার মূল্যায়ন করব।' মেয়েটির দাবি মেনে নেয় মাজেদ।

মাজেদ হেজাজী বলল, 'খলীফা আল-মালিকুস সালিহ এগার বছর বয়সের কিশোর। তিনি আমীর-উজীরদের খেলনায় পরিণত হয়ে আছেন। এই আমীর-উজীরগণ উম্মাহকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চায়। তাদের এই আশা যদি পূরণ হয়, তাহলে খৃস্টানরা খণ্ডিত মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে খেয়ে হজম করে ফেলবে। এই পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলবে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বলে থাকে, যে জাতি নিজ সাম্রাজ্যকে খণ্ডিত

করে, তাদের অস্তিত্ব টিকে না। আমাদের এই আমীরগণ খৃস্টানদের থেকে সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হবে না। খৃস্টানরা তাদেরকে মদদ দেবে ঠিক, কিন্তু তার বিনিময়ে তাদেরকে প্রজায় পরিণত করে ফেলবে। সুলতান আইউবী আমাকে এখানে এই তথ্য সংগ্রহ করতে পাঠিয়েছেন যে, খলীফা কী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং খৃস্টানরা তাদেরকে কিরূপ সাহায্য প্রদান করছে। এই তথ্য আমাকে যত দ্রুত সম্ভব সুলতানের নিকট পৌঁছাতে হবে। তিনি সেই মোতাবেক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। এমন যাতে না হয় যে, সুলতান কোন প্রস্তুতি-পদক্ষেপ না নিতেই খৃস্টানরা তার উপর হামলা করে বসল।'

'আচ্ছা, সালাহুদ্দীন আইউবী কি মুসলিম আমীরদের উপর হামলা করবেন?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'যদি প্রয়োজন হয়, তিনি তাতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করবেন না।'

মেয়েটি যেমন আগেগপ্রবণ, তেমন বুদ্ধিমতী। তার চোখ গড়িয়ে ঝরঝর করে পানি গড়াতে শুরু করে। বলল, 'ইসলামকে সেই দিনটিও দেখতে হল যে, একই রাসূলের উম্মত পরস্পর লড়াই করবে!'

'এছাড়া আর কোন পথ নেই যে!'– মাজেদ বলল– 'সালাহুদ্দীন আইউবী রাজা নন; আল্লাহর একজন সৈনিক মাত্র। তার মতে, দেশ-জাতিকে বিপদ ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর। এই বিপদ বাইরের দুশমনের পক্ষ থেকে আসুক কিংবা ভেতরের গাদ্দার ও স্বার্থপূজারী শাসকদের থেকে; জাতিকে রক্ষা করা সৈনিকদের পবিত্র কর্তব্য। তিনি প্রায়ই বলে থাকেন, আমি দেশের সেনাবাহিনীকে শাসকগোষ্ঠীর খেলনায় পরিণত হতে দেব না। সেই মুসলমান কাফিরদের চেয়েও বেশী ভয়ংকর, যে কাফিরদেরকে বন্ধু ভেবে বুকে জড়িয়ে নেয়। এখন তোমার কাজ হল, তুমি তোমার স্বামীর নিকট থেকে তথ্য নাও, এখানে কী পরিকল্পনা প্রস্তুত হচ্ছে।'

'আমি তোমাকে তথ্যও দেব এবং এই দু'আও করব যে, তুমি যখন এখান থেকে দামেস্ক ফিরে যাবে, তখন যেন তোমার সঙ্গে তথ্যের সঙ্গে আমিও থাকি।'

✿ ✿ ✿

'ত্রিপোলীর খৃস্টান সম্রাট রেমন্ড-এর নিকট দূত মারফত আবেদন পাঠানো হয়েছে, তিনি যেন আল-মালিকুস সালিহ'র সাহায্যে এগিয়ে আসেন' –পরদিনই মেয়েটি মাজেদ হেজাজীকে বলল– 'রাতে আমি আমার স্বামীকে মদপান করিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে অনেক কথা বললাম এবং শেষে

বললাম, তোমরা আসলে কাপুরুষ বলেই দামেস্ক থেকে পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছ। কোন মুসলমানই শাসকগোষ্ঠীর এই অপমান সহ্য করতে পারে না, যা সালাহুদ্দীন আইউবী তোমাদের করল।' মেয়েটি বলল, 'আমি তাকে এমন সব কথা বললাম যে, তিনি শিউরে ওঠলেন এবং আমার সঙ্গে অশালীন আচরণ করতে করতে বললেন, 'আইউবী দিন কয়েকের মেহমান মাত্র। ফেদায়ী ঘাতকদের প্রধান শেখ সান্নানকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সে সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার ব্যবস্থা করবে এবং তাকে তার দাবি অনুপাতে পুরস্কার দেয়া হবে। সে তার অভিজ্ঞ ঘাতক দলকে দামেস্ক পাঠাচ্ছে। তিনি আরো বললেন, আমরা বাহিনী প্রস্তুত করার জন্য অনেক সময় পাব। কারণ, শীতের মওসুম এসে গেছে। পার্বত্য এলাকাগুলোতে বরফপাত শুরু হবে। সালাহুদ্দীন আইউবী তার মরু এলাকার বাহিনীকে এত ঠান্ডা আর বরফের মধ্যে লড়াতে পারবে না।'

মাত্র শুরু। মদ আর নারী একজন পুরুষের মনের গোপন রহস্য বের করতে শুরু করেছে। মেয়েটি রাতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা কৌশলে তার স্বামীর সারাদিনের কারগুজারী শুনতে আরম্ভ করেছে। আর দিনের বেলা এই ভেদ-রহস্য কানে দিচ্ছে মাজেদ হেজাজীর।

একদিন মেয়েটির স্বামী মাজেদ হেজাজীকে বলল– 'তোমার নামে নালিশ আছে।' মাজেদ শিউরে ওঠে। ভাবে, তাহলে কি ধরা খেয়ে গেলাম! লোকটি বলল, 'শুনলাম, তুমি নাকি আমার স্ত্রীকে উত্যক্ত করছ! আমার অবর্তমানে তুমি ওর কাছে গিয়ে বসে থাকছ! আমি জানি, আমার তুলনায় তুমি সুদর্শন এবং যুবক। আমার স্ত্রী তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু এখনই বিরত না হলে আমি তোমাকে খুন করে ফেলব।'

মাজেদ হেজাজী তার মনিবকে বুঝাবার চেষ্টা করে যে, এটা আপনার ভুল ধারণা। বাস্তবে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু লোকটির মন থেকে সংশয় দূর হচ্ছে না। সে তার স্ত্রীকেও একই কথা বলে এবং তাকে বারণ করে দেয়– 'মাজেদের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করা চলবে না।'

এখনই এখান থেকে চলে যেতে চাচ্ছে না মাজেদ হেজাজী। তার মিশন এখনো সফল হয়নি। এখনো এখানকার পুরো পরিকল্পনা তার জানা হয়নি। মেয়েটিও রাগ-ধমক সহ্য করে নিয়ে উপরে উপরে মান্যতা ও আনুগত্যের ভান ধরে স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে এমন হবে না বলে অঙ্গীকার করে। স্বামী তাকে ক্ষমা করে দেয় বটে; কিন্তু সেদিনই আরো

ছয়জন দেহরক্ষী নিয়ে এসে তাদের একজনকে কমান্ডার নিযুক্ত করে মাজেদ হেজাজীকে তার অধীন করে দেয়। দায়িত্ব বুঝে পেয়েই কমান্ডার মাজেদ হেজাজীকে শতর্ক করে দেয়, তুমি মনিবের দৃষ্টিতে সন্দেহভাজন। অতএব কখনো মনিবের বাসভবনের দরজার নিকটও যেতে পারবে না। আর রাতে সামান্য সময়ের জন্যও অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

মাজেদ অম্লান বদনে কমান্ডারের নির্দেশ মেনে নেয় এবং মাথা ঝুঁকিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে।

এভাবে কেটে যায় আরো তিন দিন। তৃতীয় দিন মধ্যরাতে মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। প্রধান ফটকে একজন প্রহরী দণ্ডায়মান। মেয়েটি চেহারায় মনিবের প্রভাব ও গাম্ভীর্যসহ তাকে জিজ্ঞেস করে, 'এই তুমি কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাক, নাকি ভবনের আশপাশটাও ঘুরে-ফিরে দেখ?' প্রহরী উত্তরে কিছু বললে মেয়েটি বলল, 'তুমি নতুন মানুষ, আমাদের আগের দামেস্কের প্রহরীটা বেশ সতর্ক ও চৌকস ছিল। এখানে চাকুরী টেকাতে হলে তোমাকে তার মত হুঁশিয়ার হতে হবে। জান তো, সাহেব কড়া মেজাজের মানুষ।'

প্রহরী মনিবের স্ত্রীর প্রতি অবনত হয়ে যায়।

প্রহরীদের এক এক করে তদারকি করছে মেয়েটি। ঘুমন্ত প্রহরীদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে যায় সে। প্রধান ফটকের প্রহরী ছুটে গিয়ে কামান্ডারকে জাগিয়ে দিয়ে বলে, মনিবের স্ত্রী পরিদর্শনে এসেছেন। কমান্ডার ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায় এবং এগিয়ে এসে মনিব-পত্নীর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। মেয়েটি তাকে জরুরী নির্দেশনা দিয়ে আরেকটি তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুরু করে।

মাজেদ হেজাজী এই তাঁবুতে শুয়ে আছে। মেয়েটির কথার শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। শোয়া থেকে উঠে তাঁবুর বাইরে চলে আসে। মেয়েটি তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে, যেন তার সঙ্গে তার কোন পরিচয় নেই। সে মাজেদকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমিই বোধ হয় পুরাতন প্রহরী?' মাজেদ শ্রদ্ধার সঙ্গে জবাব দেয়, 'জি, হ্যাঁ।' মেয়েটি কমান্ডারকে বলে, 'এই লোকটিকে জলদি প্রস্তুত করে দাও, এ আমার সঙ্গে রাজ দরবারে যাবে। জলদি দু'টি ঘোড়া প্রস্তুত কর।'

'মনিব যদি আপনার কথা জিজ্ঞেস করে, তাহলে কী বলব?' কমান্ডার জিজ্ঞেস করে।

'আমি আমোদ ভ্রমণে যাচ্ছি না'– মেয়েটি শাসকসুলভ কণ্ঠে বলল–

'মনিবের কাজেই যাচ্ছি। রাষ্ট্রীয় কাজে তোমাদের অতো মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। যাও, দু'টি ঘোড়া প্রস্তুত করে ফেল।'

কমান্ডার এক রক্ষীকে আস্তাবলের দিকে পাঠিয়ে দেয়। মাজেদ হেজাজী তরবারী সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে যায়। মেয়েটি তাকে আস্তাবলের দিকে নিয়ে যায়।

মেয়েটির স্বামী কমান্ডারকে আগেই বলে রেখেছে, মাজেদের প্রতি নজর রাখবে এবং তাকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। আর এখন কিনা তার স্ত্রী নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লোকটাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে!

মেয়েটি ও মাজেদ আস্তাবলের দিকে চলে যায়। কমান্ডার নিশ্চিত হতে চায়, মনিবের স্ত্রী সন্দেহভাজন রক্ষীর সঙ্গে যাচ্ছে, তা তার মনিবের জানা আছে কিনা। মেয়েটিকে সে বাঁধাও দিতে পারছে না। কারণ, সে তার মনিবের স্ত্রী।

কমান্ডার ঘরে ঢুকে পড়ে। ভয়ে ভয়ে মনিবের কক্ষের দরজায় হাত রাখে। সামান্য ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে যায়। ভেতরে প্রদীপ জ্বলছে। কক্ষটা মদের দুর্গন্ধে ভরে আছে। মনিবের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কমান্ডার। লোকটা বিছানার উপর এমনভাবে পড়ে আছে যে, তার মাথা ও একটি বাহু পালংকের উপর থেকে ঝুলে আছে। একটি খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে আছে তার বুকে। একাধিক আঘাতের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে। রক্তে লাল হয়ে আছে তার সমস্ত দেহ, বিছানা ও মেঝে। কমান্ডার মনিবের নিকটে গিয়ে দাঁড়ায়। শিরায় হাত রেখে পরীক্ষা করে। নেই। মারা গেছে।

মেয়েটি মাজেদ হেজাজীকে জানায়, সে তার স্বামীর নিকট থেকে সব পরিকল্পনা জেনে এসেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ শুরু হয়ে গেল বলে।

প্রতিদিনের ন্যায় মেয়েটি আজও লোকটিকে মদপান করায় এবং একটু বেশি পরিমাণে করায় যে, নেশায় লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাকে অচেতন অবস্থায় ফেলে আসতে পারতো মেয়েটি। কিন্তু প্রতিশোধ-স্পৃহা তাকে পাগল করে তুলেছে। খঞ্জর দ্বারা লোকটির বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে খঞ্জরটি বুকে বিদ্ধ রেখেই বেরিয়ে আসে।

ঘটনা শুনে মাজেদ হেজাজী এতটুকুও ভয় পেল না। সে তো প্রতি মুহূর্তেই এমন লোমহর্ষক ঘটনার সংবাদ শুনে অভ্যস্ত। মাজেদ মেয়েটির এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানায় এবং বলে, 'সুস্থিরভাবে ঘোড়ায় চড়।'

তারা ঘোড়ায় আরোহন করছে। ঠিক এমন সময় রাতের নীরবতা ভেদ করে উচ্চস্বর কানে আসে– 'ঘোড়া দিও না, ওদেরকে আটক কর, ওরা খুন

করে পালাচ্ছে।'

রক্ষীরা তরবারী ও বর্শা উঁচিয়ে বেরিয়ে আসে। মাজেদ হেজাজী ও মেয়েটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছে। রক্ষীরা যে পথটা আগলে রেখেছে, তাদেরকে সে পথই অতিক্রম করতে হবে। মাজেদ মেয়েটিকে বলল, 'তুমি যদি ঘোড়া হাঁকাতে না জান, তাহলে দ্রুত আমার ঘোড়ার পেছনে চড়ে বস। ঘোড়া যথাসম্ভব দ্রুত হাঁকাতে হবে।'

মেয়েটি প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'সমস্যা নেই। আমি ঘোড়সওয়ারী জানি।'

'তোমার ঘোড়া আমার পিছনে রাখবে' বলে মাজেদ হেজাজী হাতে তরবারী তুলে নেয়।

এদিকে রক্ষীদের চেচামেচির শব্দ ধীরে ধীরে নিকটে আসছে। তারা আস্তাবলের দিকে ছুটে আসছে। মাজেদ দ্রুত ঘোড়া হাঁকায়। দেখাদেখি তার পেছন পেছন মেয়েটিও ঘোড়া ছুঁটায় । কমান্ডার গর্জে উঠে– 'থেমে যাও, অন্যথায় বাঁচতে পারবে না।'

জ্যোৎস্না রাত। মাজেদ পেছন ফিরে দেখে রক্ষীরা বর্শা উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে। মাজেদ ঘোড়ায় গতি ঘুরিয়ে দেয়। মোকাবেলা করতে হবে। সামান্য এগিয়ে গিয়ে তরবারী ঘুরাতে শুরু করে। ঘোড়ার গতি তার আশার চেয়ে তীব্র। দু'জন রক্ষী তার সম্মুখে চলে আসে এবং ঘোড়ার পায়ের নীচে পিষে যায়। একটা বর্শা ধেয়ে আসে মাজেদের দিকে। কিন্তু মাজেদ তরবারীর আঘাতে নিশানা ব্যর্থ করে দেয়।

'ধনুক বের কর'– কমান্ডার চিৎকার করে বলল। লোকটা অভিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে দু'-তিনটা তীর শাঁ করে মাজেদ হেজাজীর কানের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে চলে যায়। মাজেদ তার ঘোড়াটা ডানে-বাঁয়ে ঘোরাতে শুরু করে, যাতে তীরান্দাজ নিশানা করতে না পারে।

ইতিমধ্যে মাজেদ তীরের আওতা থেকে বেরিয়ে যায়। এখন ভয়, রক্ষীরা ঘোড়ায় চড়ে তাকে ধাওয়া করে কিনা। কিন্তু ধরা খাওয়ার ভয় নেই মাজেদের। জিন কষে ঘোড়ার পিঠে চড়তে চড়তে মাজেদ চলে যেতে পারবে অনেক দূর। লোকালয় ত্যাগ করা পর্যন্ত পেছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল না। মাজেদ মেয়েটিকে বলল, 'এবার তোমার ঘোড়াটা আমার ডান পার্শ্বে নিয়ে আস।'

মেয়েটি তার ঘোড়া মাজেদের পার্শ্বে নিয়ে আসে। মাজেদ তাকে জিজ্ঞেস

করে, 'ভয় পাওনি তো?'

মেয়েটি জবাব দেয়– 'না, কোন অসুবিধা হয়নি।'

পাশাপাশি ছুটে চলেছে দু'টি ঘোড়া। মেয়েটি দূরন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকেই উচ্চস্বরে তথ্য শোনাতে শুরু করে, যা সে তার স্বামীর নিকট থেকে সংগ্রহ করেছে। মাজেদ বলল, 'এখন কথা রাখ; আরো কিছু পথ অতিক্রম করে যাত্রাবিরতি দিয়ে তোমার সব কথা শুনব।' কিন্তু মেয়েটি বলেই যাচ্ছে। মাজেদ বারবার বলছে, 'এখন কথা রাখ, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।' মেয়েটি বলল, 'তাহলে এখানেই থেমে যাও; বেশী অপেক্ষা করতে পারব না।' মাজেদ হেজাজী এখনই যাত্রাবিরতি দিতে চাচ্ছে না! কিন্তু মেয়েটি কথা বলেই যাচ্ছে।

হাত বাড়িয়ে মাজেদ তার ঘোড়ার বাগ টেনে ধরে। এর জন্য তাকে সামনের দিকে এত ঝুঁকতে হয় যে, মাজেদ দেখতে পায়, মেয়েটির এক পাজরে তীর বিদ্ধ হয়ে আছে। মাজেদ সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থামিয়ে ফেলে।

'এই তীর এখানেই বিদ্ধ হয়েছিল'– মেয়েটি বলল– 'আমি এ কারণেই ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম, যাতে আমার অর্জিত মহামূল্যবান তথ্য মৃত্যুর আগেই তোমাকে বলে দিতে পারি।'

মাজেদ মেয়েটিকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নীচে নামায়। মাটিতে বসে মেয়েটির মাথাটা কোলের উপর রাখে। তীর বিদ্ধ জাগায় হাত লাগায় মাজেদ। অনেক গভীরে ঢুকে গেছে তীরটি। বের করার উপায় নেই। ডাক্তার হলে হয়ত পারত।

'ওটাকে ওখানেই থাকতে দাও।' মেয়েটি বলল। অতঃপর সে তার স্বামীর নিকট থেকে যা তথ্য সংগ্রহ করেছে, সব মাজেদকে জানায়। তারপর বলল, 'আমরা যে হাল্‌ব থেকে তথ্য নিয়ে পালিয়েছি, তা বোধ করি কেউ বুঝতে পারেনি। কাজেই ওদের পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন আসবে না। মোহাফেজরা পর্যন্ত জানে, আমার স্বামীর সন্দেহ, তোমার ও আমার মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে। তারা শুধু এ কথাই বলবে যে, তোমার ভালবাসার খাতিরেই আমি পালিয়েছি।'

তথ্য বলা শেষ হলে মেয়েটি মাজেদের হাতে চুমো খেয়ে বলল– 'এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব!' পরক্ষণেই নিথর হয়ে আসে তার দেহ।

মাজেদ অপর ঘোড়াটি নিজের ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে মেয়েটিকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নেয়। মেয়েটিকে এমনভাবে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে রাখে, যাতে তীর তাকে কোন কষ্ট না দেয়।

❁ ❁ ❁

মাজেদ হেজাজী যখন দামেস্কে তার কমান্ডার হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর নিকট পৌঁছে, তখন মেয়েটি শহীদ হয়েছে অন্তত বার ঘন্টা অতিক্রম হয়েছে। মাজেদ হাল্‌ব-এর রাজপ্রাসাদের পরিকল্পনার কথা বর্ণনা করে মাজেদ হেজাজী বলল, এর সবটুকু কৃতিত্ব এই মেয়েটির। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ ততক্ষণে মাজেদ হেজাজীকে এবং মেয়েটির প্রাণহীন দেহটিকে সুলতান আইউবীর নিকট নিয়ে যান। মাজেদ হেজাজী মেয়েটির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে। সুলতান আইউবী মেয়েটির লাশ নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে বলেন, 'মেয়েটিকে সামরিক মর্যাদায় দাফন করার ব্যবস্থা করুন।'

মৃত্যুর আগে মেয়েটি মাজেদ হেজাজীকে যে তথ্য দিয়েছিল, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

খলীফা আল-মালিকুস সালিহ সকল মুসলিম রাষ্ট্রের আমীরদেরকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছেন এবং তাদের সেনাবাহিনীগুলোকে এক কমান্ডারের অধীনে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন। ত্রিপোলীর খৃস্টান সম্রাট রেমন্ডের নিকট সাহায্যের আবেদন পাঠানো হয়েছিল আগেই। এই মেয়েটি নতুন যে তথ্য দিয়েছে, তাহল রেমন্ড তার বাহিনীকে এমনভাবে ব্যবহার করতে চায় যে, তারা মিশর ও সিরিয়ার মাঝখানে সুলতান আইউবীর রসদ ও সহযোগিতার জন্য আসা বাহিনীকে প্রতিহত করবে। রেমন্ড আন্দাজ করে নিয়েছে, যুদ্ধ বেঁধে গেলে সুলতান আইউবী মিশর থেকে সৈন্য তলব করবেন। তাছাড়া রেমন্ড সুলতান আইউবীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলার জন্যও দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত রাখবে। প্রয়োজন হলে সে অন্যান্য খৃস্টান সম্রাটদের কাছেও সাহায্যের আবেদন জানাবে। হাসান ইবনে সাব্বাহর ঘাতক বাহিনীর সঙ্গে সুলতান আইউবী হত্যার চুক্তি ও লেনদেন চূড়ান্ত হয়ে গেছে। ফেদায়ীরা দামেস্ক এসে পৌঁছল বলে।

পরিকল্পনার প্রতিটি অংশই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সুলতান আইউবী যে অংশটির প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করলেন, তাহল, দুশমন শীতের মওসুম শেষ হওয়ার পর আক্রমণ করবে। হাড়কাঁপানো শীত, প্রবল বর্ষণ ও বরফপাতের কারণে শীত মওসুমে এসব এলাকায় যুদ্ধ করা কঠিন ব্যাপার।

তারা সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করছে। সৈন্যরা দুর্গে অবস্থান নিয়ে থাকবে এবং আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। ঋতু পরিবর্তন হলেই তারা সিরিয়ায় হামলা করবে। খৃস্টান সম্রাট রেমন্ডকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, আইউবী বিরোধী যুদ্ধে

সহযোগিতা করলে বিনিময় দেয়া হবে অনেক স্বর্ণমুদ্রা। রেমন্ড শর্ত দেয়, বিনিময় আগে পরিশোধ কর। আল-মালিকুস সালিহ ও তার অনুচররা রেমন্ডের শর্ত মেনে নেয়।

'মুসলমানদের দুর্ভাগ্য'– দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুলতান আইউবী বললেন– 'মুসলমান আজ কাফেরদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে। প্রিয়নবীজির আত্মার এর চেয়ে বড় কষ্ট আর কী হতে পারে!'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'আমার প্রিয় বন্ধু সালাহুদ্দীন আইউবী আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন না। কিন্তু যখন তাঁকে তথ্য প্রদান করা হল, খৃস্টানদেরকে আরব ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করে আপনি ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটানোর যে স্বপ্ন দেখছেন, খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ও তার অনুগত মুসলিম আমীরগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনার সেই পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে, তখন তিনি এতই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেন যে, তেমনটা কখনো দেখিনি। তথ্যটি শোনামাত্র তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে আসে এবং তিনি কক্ষে পায়চারী শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে প্রবল আবেগঘন কণ্ঠে বললেন– 'এরা আমাদের ভাই নয়– শত্রু। মুরতাদ ভাইকে হত্যা করা যদি পাপ হয়, তাহলে এই পাপ করে আমি পরজগতে জাহান্নামে যেতে প্রস্তুত আছি, তবু ইহজগতে ইসলামকে লাঞ্ছিত হতে দেব না। যেসব মুসলিম শাসক কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়, কাফেরদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ায়, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। আমি জানি, এরা সবাই ক্ষমতা ও অর্থের লোভী। এরা ঈমান নীলাম করে ক্ষমতার নেশা পূরণ করতে চায়।' সুলতান আইউবী তরবারীর হাতলে হাত রেখে বললেন, 'ওরা শীত মওসুমে লড়াই করতে রাজি নয়। বরফময় অঞ্চলে যুদ্ধ করতে ওরা ভয় পায়। কিন্তু আমি হাড় কাঁপানো কনকনে শীতের মধ্যেও যুদ্ধ করব। আমি বরফের স্তরজমা পর্বতচূড়ায় এবং তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যেও লড়াই করব... ।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন। তিনি কখনো আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। তিনি সস্তা শ্লোগানে বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রতিটি সেনা ইউনিটের কমান্ডারদেরকে দফতরে ডেকে নিয়ে কাগজে দাগ টেনে নকশা এঁকে এবং যুদ্ধের ময়দানে মাটিতে আঙ্গুল দ্বারা রেখা টেনে নির্দেশনা প্রদান করতেন। কিন্তু সেদিন নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না তিনি। আবেগের নিকট পরাজিত হয়ে এমন সব কথা বলে

ফেললেন, যা সচরাচর আম মজলিসে বলেন না।

'তাওফীক জাওয়াদ!'– সুলতান আইউবী দামেস্কের সেনা অধিনায়ককে উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমার বাহিনী শীতের মধ্যে লড়াই করতে পারবে কিনা, তাতো এখনো জানা হল না। আমি কমান্ডারদেরকে রাতে এমন স্থানে হানা দেয়ার জন্য প্রেরণ করব, যেখানে তাদেরকে সমুদ্র অতিক্রম করে গমন করতে হবে। তখন প্রচণ্ড শীত থাকবে, বরফপাত হবে, বৃষ্টিও হতে পারে। কাজেই, চিন্তা-ভাবনা করে জবাব দাও।'

'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমার সৈন্যদের মধ্যে জযবা আছে'– তাওফীক জাওয়াদ বললেন– 'তার একটি প্রমাণ হল, তারা আমার সঙ্গে আছে; আস-সালিহ্'র সঙ্গে পালিয়ে যায়নি। আমার সৈনিকরা যুদ্ধের লক্ষ-উদ্দেশ্য বুঝে।'

'সৈনিকের মধ্যে যদি জযবা থাকে এবং তারা যদি যুদ্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত থাকে, তাহলে তারা উত্তপ্ত বালুকাময় ময়দানে দাঁড়িয়েও যুদ্ধ করতে পারে। পারে জমাটবাঁধা বরফের উপর দাঁড়িয়েও।'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আল্লাহর সৈনিকদের ঠেকাতে না পারে মরুভূমির অগ্নি-উত্তাপ, না হীমশীতল বরফ।'

সুলতান আইউবী সভার উপস্থিতিদের প্রতি একবার চোখ ঘুরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'ইতিহাস হয়ত আমাকে মাতাল বলবে। কিন্তু আমার স্থির সিদ্ধান্ত, ডিসেম্বর মাসে আমি যুদ্ধ শুরু করব। এই সিদ্ধান্ত থেকে কেউ আমাকে টলাতে পারবে না। তখন শীতের তীব্রতা থাকবে তুঙ্গে। পাহাড়-পর্বতের রং হবে সাদা– বরফঢাকা। থাকবে হাড় কাঁপানো শীত। আপনারা সবাই কি আমার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন?'

সকলের সমবেত কণ্ঠে জবাব– 'আমরা প্রস্তুত, সুলতানের যে কোন সিদ্ধান্ত শিরোধার্য।'

এবার সুলতান আইউবীর ঠোঁটে হাসি ফুঠে ওঠে। কণ্ঠ তার আবেগমুক্ত, ধীর-শান্ত। তিনি নির্দেশ দিতে শুরু করেন–

'আজ রাতেই সকল ফৌজ মহড়া শুরু করবে। সালার থেকে সিপাহী প্রত্যেকে আবরণমুক্ত থাকবে। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত একখণ্ড কাপড় ছাড়া কারো গায়ে আর কোন পোশাক থাকবে না। নামাযের পরপর সকল সৈন্য পোশাক খুলে ব্যারাক থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে। সন্নিকটে অনেক ঝিল আছে। ফৌজ সেগুলোর মধ্যদিয়ে অতিক্রম করবে। আমাদের সামরিক

ডাক্তারগণও তাদের সঙ্গে থাকবে। প্রথমদিকে সৈন্যরা ঠাণ্ডায় অসুস্থতার শিকার হতে পারে। ডাক্তারগণ তাদেরকে গরম কাপড়ে পেঁচিয়ে এবং আগুনের কাছে শুইয়ে দিয়ে চিকিৎসা করবে। আমার আশা, এই অসুস্থতার ঘটনা বেশী ঘটবে না। দিনের বেলা ডাক্তারগণ সৈন্যদের খোঁজ-খবর নেবে। প্রয়োজন হলে মিশর থেকে আরো ডাক্তার তলব করতে হবে।'

১১৭৪ সালের নভেম্বর মাসের শুরুর দিক। এই সময়টায় রাতে প্রচণ্ড শীত পড়ে। সুলতান আইউবী রাতের বেলা সামরিক জুনিয়র কমান্ডারদের তলব করেন। তিনি তাদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন–

'এবার তোমাদেরকে যে দুশমনের সঙ্গে লড়তে হবে, তাদেরকে দেখার পর তোমাদের তরবারী খাপ থেকে বাইরে বের হতে ইতস্তত করবে। কারণ, তারাও 'আল্লাহু আকবার' স্লোগান তুলে তোমাদের সামনে আসবে। তাদের পতাকাও তোমাদের পতাকারই ন্যায় তারকাখচিত থাকবে। তারাও সেই কালেমা পাঠ করে, যা তোমরা পড়। তোমরা তাদেরকে মুসলমান মনে করবে; কিন্তু তারা মুরতাদ। আল্লাহু আকবার স্লোগান দিয়ে তোমাদের মুখোমুখি এসে তারা কোষ থেকে যে তরবারী বের করবে, তা খৃস্টবাদীদের সরবরাহ করা তরবারী। তাদের তূনীরে খৃস্টবাদীদের তীর। তোমরা ঈমানের প্রহরী আর তারা ঈমানের ব্যাপারী। সুলতান আস-সালিহ বাইতুলমালের সোনাদানা ও সমুদয় সম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। সেই সম্পদ তিনি এই উদ্দেশ্যে ত্রিপোলীর খৃস্টান সম্রাটের হাতে তুলে দিয়েছে, যাতে সে তোমাদের পরাজিত করতে তাকে সামরিক সহযোগিতা দেয়। এই পরাজয় তোমাদের নয়– ইসলামের। এই ধনভাণ্ডার কারো ব্যক্তিগত নয়– জাতির। এগুলো দেশের জনগণেরই প্রদত্ত যাকাতের অর্থ। সেই সম্পদ এখন মদ-বিলাসিতায় ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই সম্পদ কাফেরদেরকে বন্ধু বানানোর কাজে ব্যয়িত হচ্ছে, তোমরা কি জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠনকারী এই দস্যুটাকে সুলতান মেনে নেবে?'

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, 'না, না, আমরা এমন লোকদের ক্ষমতার স্বপ্নসাধ চিরতরে মিটিয়ে দেব।'

সুলতান আইউবী বললেন–

'আমি যে নীতিমালার ভিত্তিতে মিশরের ফৌজ গঠন করেছি, তা-ই তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে চাই। আমার মৌলিক নীতি হল, দুশমনের অপেক্ষায় ঘরে বসে থাকা চলবে না। দুশমন আক্রমণ করলে আমি তা প্রতিহত করব, এটা কোন নীতি হতে পারে না। কুরআন আমাদেরকে যে

শিক্ষা প্রদান করেছে, তাহল, যুদ্ধ আছে তো লড়াই কর। যুদ্ধ নেই, যুদ্ধের প্রস্তুতিতে নিমগ্ন থাক। তোমরা যখনই টের পাবে যে, দুশমন তোমাদের উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, তোমরা দুশমনের উপর তখনই হামলা কর। স্মরণ রেখ! যারা মুসলমান নয়, তারা তোমাদের বন্ধু নয়। কাফের যদি তোমার পায়ে সেজদাও করে, তবু তাকে বন্ধু মনে কর না।

আমার দ্বিতীয় মূলনীতি হল, তোমরা ইসলামী সাম্রাজ্য ও দেশের জনগণের ইজ্জতের প্রহরী। তোমাদের শাসকগোষ্ঠী যদি আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলে, জাতি যদি পাপ করতে করতে ধ্বংস হয়ে যায় এবং দুশমন তোমাদের উপর জয়ী হয়, তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্ম বলবে, এই জাতির সৈন্যরা অযোগ্য ও দুর্বল ছিল। মনে রাখবে, জয়-পরাজয়ের সিদ্ধান্ত হয় যুদ্ধের মাঠে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর বিলাস-প্রিয়তা ও স্বার্থপরতা দেশের সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে দেয়। কিন্তু পরাজয়ের দায় চাপানো হয় সেনাবাহিনীর কাঁধে। কাজেই, তোমাদের যে খলীফা ও শাসকগোষ্ঠী জাতিকে লাঞ্ছনায় নিক্ষিপ্ত করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দাও। আমি যে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি, তার রূপ কেমন হবে, তা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারব না। আমি শুধু এটুকু জানি, একটি ভয়াবহ ও কঠিন যুদ্ধ সংঘটিত হবে। কঠিন এই অর্থে যে, আমি তোমাদেরকে চরম এক সংকটাপূর্ণ অবস্থায় লড়াচ্ছি। আরেক সমস্যা হল, তোমাদের সংখ্যা কম। সংখ্যার এই অভাব পুষিয়ে নিতে হবে জযবা ও ঈমানী শক্তি দ্বারা।'

সুলতান আইউবী কমান্ডারদের এ-ও অবহিত কবেন যে, তোমাদের মধ্যে দুশমনের চর ঢুকে আছে। তারা কি কি পন্থায় কাজ করছে, তিনি তারও বিবরণ প্রদান করেন।

❁ ❁ ❁

'তোমরা বিশ্বাস কর না যে, সালাহুদ্দীন আইউবী মুসলমান'– হাল্‌বে নিজ সৈন্যদেরকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এক আমীর বলল– 'খলীফার মর্যাদা একজন নবীর সমান। নাজমুদ্দীন আইউবীর এই মুরতাদ ছেলেটা খলীফাকে কস্‌রে খেলাফত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং সিরিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মিশর ও সিরিয়ার রাজা হয়ে বসেছে। তোমরা যদি খোদার আজাব-গযব থেকে রক্ষা পেতে চাও, প্রলয়ংকারী ভূমিকম্প ও ব্যাপক বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাস থেকে নিরাপদ থাকতে চাও, তাহলে সালাহুদ্দীন আইউবীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সালতানাতের গদি ফিরিয়ে আন।

শীতকাল শেষ হলেই আমরা দামেস্কে আক্রমণ করব। তার আগে আমরা সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করব এবং তোমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নিতে থাক।'

'একটি জাতির চরিত্র ও চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করতে না পারলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করা যায় না'– আল-মালিকুস সালিহ'র নিকট রেমন্ড কর্তৃক প্রেরিত খৃস্টান সেনাবাহিনীর এক সামরিক উপদেষ্টা বলল– 'আমরা তোমাদের এলাকায় এসে যুদ্ধ করব না। আইউবীর সাহায্যে মিশর থেকে যে বিশেষ ফোর্স আগমন করবে, আমরা পথে তাদেরকে প্রতিহত করব এবং সুযোগমত আইউবীকে কোথাও ঘিরে ফেলব। আপনার বাহিনী দামেস্কে হামলা করবে। শীতের মওসুমে না আপনি হামলা করতে পারবেন না– না আইউবী। এই সময়টাকে আপনি কাজে লাগান। আমি যে আশংকা অনুভব করছি, তাহল, আপনার জাতি আপসে লড়াই করতে ইতস্তত করতে পারে। আপনি আপনার নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোর জনগণকে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলুন। এর জন্য উত্তম হাতিয়ার হল আপনার ধর্ম ও কুরআন। এই লক্ষ্য অর্জনে আপনি ধর্ম, কুরআন ও মসজিদকে ব্যবহার করুন। মুসলমানদের নিকট ধর্ম একটি স্পর্শকাতর বিষয়। তারা ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু শুনলে অমনি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আপনি সহযোগিতা করলে আমরা দামেস্কেও এ লক্ষ্যে কাজ করতে পারি।'

'পাঁচ পাঁচটি বছর কেটে গেল; কিন্তু আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে খুন করতে পারলাম না! লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আসে'– সুলতান আইউবীকে হত্যার জন্য গমনকারী ফেদায়ী ঘাতক বলল– 'আইউবীর উপর আমাদের চারটি হামলা ব্যর্থ হয়েছে। তাও এত শোচনীয়ভাবে যে, তাতে আমাদের কিছু লোক মারা গেছে এবং গ্রেফতার হয়েছে। হাসান ইবনে সাব্বাহর আত্মা আমাকে তিরস্কার করছে– তুমি কি আইউবীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে পারলে না? তুমি কি লুকিয়ে কোথাও তাকে তীরের নিশানা বানাতে পারলে না? তুমি কি মৃত্যুর ভয়ে ভীত? তুমি আমার সঙ্গে কী বলে অঙ্গীকার করেছিলে, তা কি ভুলে গেছ? কাজেই আমি এখন আর এক মুহূর্তের জন্যও একথা শুনতে চাই না যে, সালাহুদ্দীন আইউবী জীবিত।'

'তিনি আর বেশীদিন জীবিত থাকবেন না।' এক ফেদায়ী বলল। তাঁর সঙ্গীরা তার বক্তব্যে সমর্থন ব্যক্ত করল।

সুলতান আইউবী দামেস্ক আগমনের সময় তাঁর ভাই আল-আদেলকে মিসরের সেনাবাহিনীর প্রধান অধিনায়ক নিযুক্ত করে আসেন। তিনি তাঁকে

নির্দেশ দিয়ে আসেন যে, সেনাভর্তি বেগবান করে তোল এবং সামরিক মহড়া অব্যাহত রাখ। তিনি তাকে সুদানের ব্যাপারেও সতর্ক করে আসেন এবং বলে আসেন, সুদানের পক্ষ থেকে সামান্যতম সামরিক তৎপরতা যদি চোখে পড়ে, তাহলে তুমি ব্যাপকহারে সেনা অভিযান পরিচালনা করবে।

সুলতান আইউবী তাঁর ভাইকে সদা রিজার্ভ বাহিনী ও রসদ প্রস্তুত রাখতে নির্দেশ দিয়ে আসেন। দামেস্কের অভিযান সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা যাচ্ছিল না, পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে। এখন সুলতান যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন, তাতে তার সেনা সহযোগিতার প্রয়োজন। কিন্তু গুপ্তচর মাজেদ হেজাজীর সংগৃহীত তথ্য মোতাবেক খৃস্টান সম্রাট রেমন্ড মিশর ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সুলতান আইউবীর রিজার্ভ সেনা ও রসদ আগমন প্রতিহত করবে– এই তথ্যের ভিত্তিতে সুলতান আইউবী সময়ের আগেই মিশর থেকে স্পেশাল ফোর্স ও রসদ এনে রাখা আবশ্যক মনে করেন। এই বাহিনীকে শীতের মধ্যে যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তিনি দীর্ঘ একটি বার্তাসহ একজন দূতকে কায়রো প্রেরণ করেন।

পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য কতজন করে পাঠাতে হবে সুলতান পত্রে তাও উল্লেখ করেন। সঙ্গে এই নির্দেশনাও প্রদান করেন যে, সকল সৈন্য যেন একত্রে না আসে। বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে রাতের বেলা একদল অপরদল থেকে দূরত্ব বজায় রেখে পথ চলবে। দিনে সফর বন্ধ রাখবে। এই ফোর্স আগমন যথাসম্ভব গোপন রাখবে।

আল-আদেল তাঁর ভাই সালাহুদ্দীন আইউবীরই হাতে গড়া। পয়গাম পাওয়ামাত্র তিনি বাহিনী রওনা করিয়ে দেন এবং বিষয়টা গোপন রাখার জন্য পন্থা অবলম্বন করেন যে, কয়েকজন সেনা সদস্যকে ছদ্মবেশে উটে চড়িয়ে এই নির্দেশনা দিয়ে রাস্তায় পাঠিয়ে দেন, তোমরা ডানে-বাঁয়ে ছড়িয়ে গিয়ে পরস্পর দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল করবে। কোন সন্দেহভাজন লোক দেখলে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। প্রয়োজন বোধ করলে গ্রেফতার করে ফেলবে।

বাহিনীর সৈন্যরা দিন কয়েক পরই দামেস্ক পৌঁছতে শুরু করে। সুলতান আইউবী তাদেরকেও রাতের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তার সঙ্গে তিনি নতুন ভর্তিরও নির্দেশ জারি করেন।

❁ ❁ ❁

দামেস্কের প্রত্যন্ত এলাকা। ঘন বনজঙ্গল আর খানাখন্দকে ভরা গোটা অঞ্চল। সেখানে শত শত বছরের পুরাতন একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ

বিদ্যমান। তার অভ্যন্তরে কেউ কখনো অনুপ্রবেশ করেছে বলে জানা যায়নি। রাতে মানুষ তার পাশ দিয়েও হাঁটে না। দুর্গটা এক সময় সামরিক কাজে ব্যবহৃত হলেও এখন তা ব্যবহারের অনুপযুক্ত। যোগাযোগের ক্ষেত্রেও স্থানটি অনুপযোগী। সে কারণে দেশের সামরিক বাহিনীর কখনো সেদিকে চোখ যায়নি। সুলতান আইউবীর আমলে দামেস্কের প্রতিরক্ষার জন্য অন্যত্র একটি দুর্গ তৈরি করে নেয়া হয়েছিল। এই পুরাতন দুর্গটি 'সর্পকেল্লা' নামে পরিচিত। কথিত ছিল যে, দুর্গের ভেতর এক জোড়া নাগ-নাগিনী বাস করে। তাদের বয়স হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। এও বলা হত যে, দুর্গটি সেকান্দারে আজম নির্মাণ করেছিলেন। কারো মতে, ইরানের বাদশা দারা এর নির্মাতা। অনেকের মতে, দুর্গটি তৈরি করেছিল বনী ইসরাঈল।

সে যা হোক, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, কয়েকশ' বছর আগে এখানে এক পারস্য রাজা আগমন করেছিলেন। জায়গাটা তার পছন্দ হয়ে গেলে তিনি এখানে এই দুর্গটি নির্মাণ করেন এবং তার অভ্যন্তরে নিজের জন্য একটি মনোরম মহল তৈরি করেন। কিন্তু মহলটি আবাদ করার জন্য তার কোন স্ত্রী ছিল না। খুঁজে পেতে তিনি এক রাখাল কন্যাকে পছন্দ করেন। কিন্তু মেয়েটি ছিল অন্য এক যুবকের বাগদত্তা। দু'জনের মধ্যে ছিল গভীর ভালবাসা। রাজা মেয়েটির পিতামাতাকে অগাধ সম্পদ দিয়ে বাগিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে নেয়। যুবক বাদশার নিকট এসে বলল, মহারাজ! শখ করে মহল নির্মাণ করেছেন এবং আমার বাগদত্তা প্রেমিকাকে ছিনিয়ে এনেছেন! কিন্তু এই দুর্গে বাস করা আপনার কপালে জুটবে না। আপনি এখানে থাকতে পারবেন না। যুবকের কথায় বাদশা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে দুর্গে নিয়ে হত্যা করে ফেলে এবং লাশটা নিকটেই এক স্থানে পুঁতে রাখে। অপরদিকে মেয়েটি বাদশাকে বলল, আপনি আমার দেহটা ক্রয় করেছেন, আমার হৃদয়টাকে কখনোই আপনি দখল করতে পারবেন না।

বাদশাহ রাখাল কন্যাকে রাজকীয় সাজে সাজিয়ে প্রথম দিনের মতো মহলে প্রবেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে মহলের মেঝে ধসে যায়, ছাদ ও দেয়াল তাদের মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ে। দু'জনই মহলের ছাদ ও দেয়াল চাপা পড়ে মারা যায়। বাদশাহর সেনাদল ছুটে এসে মহলের ধ্বংসাবশেষ সরাতে শুরু করে। এসময় ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে দু'টি নাগ বেরিয়ে আসে। সেনারা তাদেরকে বর্শা, তীর-ধনুক আর তরবারী দ্বারা মারার চেষ্টা করে। কিন্তু নাগ দু'টোর গায়ে না লাগে বর্শা, না বিদ্ধ হয় তীর, না আঘাত হানে তরবারী। বাদশার সেনাদল

ভয়ে পালিয়ে যায়। এ কথাও প্রসিদ্ধ ছিল যে, এখনো রাতের বেলা দুর্গের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে রাখালের পোশাক পরিহিত একটি মেয়েকে ভেড়া চড়াতে দেখা যায়। মাঝে-মধ্যে একটি যুবক চোখে পড়ে। এক কথায়, সবাই বিশ্বাস করত যে, দুর্গটা জ্বিন-পরীর আবাস।

সুলতান আইউবী যে সময়টায় খলীফা ও আমীরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন, ঠিক তখন দামেস্কে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, সর্পকেল্লায় এক বুজুর্গ আত্মপ্রকাশ করেছেন, যিনি দু'আ করলে মানুষের সব রোগ ভাল হয়ে যায় এবং তিনি ভবিষ্যতের সংবাদ বলে দিতে পারেন। কে একজন শহরে সংবাদটা বলামাত্র মুহূর্তের মধ্যে দাবানলের ন্যায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে তাকে 'ইমাম মাহদী' আখ্যা দিতে ভুল করেনি। মানুষ সেখানে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আবার এই ভয়ে পিছিয়ে যায় যে, ওটা রাখালের কন্যা ও তার বাগদত্তার কিংবা পারস্যের রাজার প্রেতাত্মা কিনা! নাকি জ্বিন-ভুতের কারসাজি। অনেকে দূরে দাঁড়িয়ে দুর্গের দিকে তাকায়, কিছু দেখা যায় কিনা। জনা তিন-চারেক লোক দাবি করে, তারা কালো দাড়ি ও সাদা চোগা পরিহিত এক ব্যক্তিকে দুর্গের বাইরে আসতে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকে যেতে দেখেছে। মানুষ বুজুর্গের কারামত নিয়ে বলাবলি করছে। কিন্তু এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, যে বলবে, আমি দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করেছি এবং বুজুর্গ লোকটি আমার জন্য দু'আ করেছেন।

একদিনের ঘটনা। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর রক্ষী বাহিনীর এক সিপাহী ডিউটি পালন শেষে বাইরে ঘোরাফেরা করছিল। লোকটার সুদর্শন চেহারা, সুঠাম দেহ। তাঁগড়া যুবক। হঠাৎ সম্মুখ থেকে নূরানী চেহারার এক ব্যক্তি এগিয়ে আসে। মুখে কালো দাড়ি, পরনে সাদা চোগা, মাথায় অতীব আকর্ষণীয় পাগড়ি, হাতে তসবীহ। সিপাহীর সামনে এসেই লোকটি দাঁড়িয়ে যায়। হাত বাড়িয়ে চিবুক ধরে সামান্য উপরে তুলে আবার ছেড়ে দেয়। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'আমি কখনো ভুল করি না; তোমার বাড়ি কোথায় দোস্ত?'

'বাগদাদ'– মিষ্টি ভাষায় সিপাহী জবাব দেয়– 'আপনি আমাকে চেনেন নাকি?'

'হ্যাঁ, দোস্ত! আমি তোমাকে চিনি'– আগন্তুক জবাব দেয়– 'তবে বোধ হয় তুমি নিজেকে চেন না।'

লোকটি যে ধারায় কথা বলছে, তাতে সিপাহী প্রভাবিত হয়ে পড়ে। বস্তুত তার নূরানী চেহারা, আকর্ষণীয় দাড়ি, সাদা পোশাক ও পাগড়ী যে কোন

মানুষকে প্রভাবিত না করে পারে না। এসব না থাকলে হয়ত সিপাহী তাকে মাতাল বলে এড়িয়ে যেত। কিন্তু লোকটার ভাবভঙ্গি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও কথার ধরণ সুলতান আইউবীর সৈনিককে কাবু করে ফেলে।

'আচ্ছা, তুকি কি তোমার পূর্বপুরুষকে জান, তারা কারা ছিলেন এবং কী ছিলেন?' লোকটি সিপাহীকে জিজ্ঞেস করে।

'না!' সিপাহী জবাব দেয়।

'দাদার কথা জান না?'

'না।'

'তোমার পিতা বেঁচে আছেন?'

'না।'– সিপাহী জাবাব দেয়– 'আমি যখন দুধের শিশু, তখনই তিনি মারা যান।'

'তোমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কি রাজা ছিলেন?'– আগুন্তুক জিজ্ঞেস করে– 'পরদাদা?'

'কেউ নয়,' সিপাহী জবাব দেয়– 'আমি কোন রাজবংশের সন্তান নই। আমি সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবীর রক্ষী বাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিক। আপনি বোধ হয় ভুল করছেন। আমার গঠন-আকৃতির সঙ্গে আপনার পুরনো কোন বন্ধুর মিল আছে হয়ত। আপনি আমাকে অন্য কেউ মনে করেছেন।'

লোকটি এমন ভাব দেখায়, যেন সে সিপাহীর কথাটা শুনেইনি। তার হাত ধরে ডান হাতের তালুর রেখাগুলো গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে। তারপর তার কাঁধে হাত রেখে মাথাটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে ঝুঁকে তার মুখমণ্ডলের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মধুর ভাষায় ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বলে– 'তবে এই সিংহাসনে আমি কাকে দেখতে পাচ্ছি? এই মুকুটটার মালিক কে? তোমাকে কে বলল, তুমি রাজবংশের সন্তান নও? আমার বিদ্যা আমাকে ধোঁকা দিতে পারে না। আমার চোখ ভুল দেখতে পারে না। আচ্ছা, তুমি কি বিয়ে করেছ?'

'না।' সিপাই ভয়ার্ত কণ্ঠে জবাব দেয়– 'বংশের একটি মেয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে আছে।'

'হবে না' লোকটি বলল– 'এই বিয়ে হবে না।'

'কেন?' চকিত হয়ে সিপাহী প্রশ্ন করে।

'তোমার জুড়ি অন্য কোথাও' লোকটি বলল– 'কিন্তু মেয়েটি অন্যত্র আটকা পড়ে আছে। শোন বন্ধু! তুমি মজলুম, প্রতরাণার শিকার। তুমি বিভ্রান্ত।

তোমার ধনভাণ্ডারের উপর সাপ বসে আছে। একজন রাজকন্যা তোমার পথপানে তাকিয়ে আছে। কেউ যদি তোমাকে তথ্য প্রদান করে, মেয়েটি কোথায়, তাহলে কি তুমি জীবনের বাজি রেখে তাকে উদ্ধার করবে?'

এই বলে লোকটি যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে হাঁটা দেয়।

সিপাহী ছুটে গিয়ে তার পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং বলে– 'আমার হাত ও চোখে আপনি কী দেখেছেন? আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? আপনি আমাকে কেন বিভ্রান্ত ও অস্থির করে চলে যাচ্ছেন!'

'আমি কিছুই নই' লোকটি জবাব দেয়– 'আমার আল্লাহর সত্তাই সবকিছু। গোটা তিন-চারেক মহান পবিত্র আত্মা আমার হাতে আছে। এরা আল্লাহ পাকের সেই প্রিয়জনদের আত্মা, যারা অতীত ও ভবিষ্যতকে সমানভাবে জানতেন। আমি কিছু অজিফা পালন করি। এক রাতে আমি নির্দেশ পাই যে, তুমি সর্পকেল্লায় চলে যাও। একব্যক্তি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন। ওখানে যেতে আমি ভয় পেতাম। কিন্তু এটা খোদার নির্দেশ। কাজেই এখন আর ভয় কিসের। আমি সর্পকেল্লায় চলে গেলাম। প্রথম রাতেই অজিফা যপকালে আত্মাগুলো পেয়ে যাই। তারা আমাকে এমন শক্তি দান করে যে, আমি মানুষের চেহারা ও চোখের প্রতি তাকালে তাদের দাদা ও পরদাদার ছবি দেখতে পাই। কিন্তু এই অবস্থা সবসময় থাকে না। মাঝে-মধ্যে দেখা যায়। তোমাকে দেখামাত্র আমার কানে একটি আত্মার কণ্ঠ ভেসে আসে। এই যুবকটিকে দেখ! ছেলেটা রাজপুত্র। কিন্তু সে তার ভাগ্যলিপি সম্পর্কে অনবহিত। রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও সে সিপাহী বেশ ধারণ করে অন্যের সুরক্ষার জন্য পাহারাদারী করে। এখন আমার সেই অস্বাভাবিক অবস্থা চলে গেছে, এখন আমি তোমাকে একজন সিপাহীরূপেই দেখছি। আমি জ্যোতিষী নই, গায়েবও জানি না। আমি একজন দরবেশ মাত্র। আল্লাহ-বিল্লাহ করে দিন কাটাই। কিন্তু তারপরও আবদার যখন করেছ, কিছু জানার চেষ্টা করব এবং আমি যেখানকার কথা বলি, তোমাকে সেখানে যেতে হবে। পারবে বেটা?'

'হ্যাঁ, পারব! আপনি যথায় বলেন, তথায়ই গিয়ে আমি হাজির হব।'

'সর্পকেল্লায় এসে পড়।'

'ঠিক আছে আসব, অবশ্যই আসব।'

'পাকসাফ হয়ে মন-মস্তিষ্ককে দুনিয়ার ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত করে আসবে। খবরদার, কাউকে বলবে না, আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল এবং রাতে তুমি কোথাও যাচ্ছ। একদম চুপি চুপি এসে পড়বে।' বলল লোকটি।

❁ ❁ ❁

ধনভাণ্ডার, রাজকন্যা ও সিংহাসনের লোভে না পেলে সুলতান আইউবীর এই সৈনিক যত সাহসীই হোক রাত্রিকালে স্বর্পকেল্লায় যেত না। রাতের শেষ প্রহরে সুলতান আইউবীর বাসগৃহের পেছন দরজায় তার পাহারা ছিল। তার পূর্ব পর্যন্ত পুরো রাত তার ঘোরাফেরা করার সুযোগ রয়েছে। রাত খানিকটা গভীর হলে সিপাহী চুপি চুপি স্বর্পকেল্লা অভিমুখে হাঁটা দেয়। কেল্লার দ্বার পর্যন্ত পৌঁছামাত্র ভয়ে তার গা ছমছম করে ওঠে। দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে– 'আমি এসে গেছি, আপনি কোথায়?'

তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কোথা থেকে একটি মশাল বেরিয়ে আসে এবং তার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। তার মনের ভয় আরো বেড়ে যায়। সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে। মশালটি এক ব্যক্তির হাতে। লোকটি নিকটে এসে সিপাহীকে জিজ্ঞেস করে, 'হযরত আজ পথে কোথাও কাকে দেখেছিল, তুমিই কি সেই লোক?'

সিপাহী বলল, হ্যাঁ, আমিই সেই লোক।'

মশালবাহী লোকটি বলল, 'আমার পেছনে পেছনে আস।'

'তুমি কি মানুষ?' ভয়জড়িত কণ্ঠে সিপাহী তাকে জিজ্ঞেস করে।

'তুমি চোখে যা দেখছ, আমি তা-ই। মন থেকে ভীতি দূর করে ফেল। মাথা থেকে সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেল। চুপচাপ আমার পেছনে পেছনে আস'– মশালবাহী লোকটি সম্মুখের দিকে হাঁটছে আর কথা বলছে– 'তুমি হযরতকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবে না। তিনি যা নির্দেশ দেন, তা-ই করবে।'

ঘোর অন্ধকার। ছাদঢাকা আঁকা-বাঁকা সরু পথ। ডান-বাম করে কয়েকটি রাস্তা অতিক্রম করে মশালবাহী লোকটি একটি দরজার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং উচ্চস্বরে বলে, 'হযরত! অনুমতি হলে তাকে নিয়ে আসি।' ভেতর থেকে জবাব আসে, 'আস'। মশালবাহী একদিকে সরে যায় এবং সিপাহীকে ইঙ্গিতে বলে, 'যাও, ভেতরে চলে যাও।'

সিপাহী ভেতরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু কী আশ্চর্য! এই ভয়ানক স্থানে আকর্ষণীয় মহামূল্যবান জিনিসপত্রে সাজানো মনোরম এক কক্ষ। যুগপৎ বিস্ময় ও ভীতি চেপে ধরে সিপাহীকে। একধারে অদৃশ্যপূর্ব কারুকার্যখচিত নয়ন মাতানো একটি পালংক। তাতে তাতোধিক মনোহরী জাজিম বিছানো। তার উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গুরুগম্ভীর মুখে বসে আছে সেই ব্যক্তি। চোখ বন্ধ করে তাসবীহ যপ করছে লোকটি। সে-ই ইঙ্গিতে সিপাহীকে বসতে বলল। সিপাহী

বসে যায়। মন মাতানো সুগন্ধিতে মৌ মৌ করছে কক্ষটি।

হযরত চোখ খোলেন, সিপাহীর প্রতি তাকান এবং হাতের তাসবীহটি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'গলায় পরে নাও'। সিপাহী তসবীহটি হাতে নিয়ে চুমো খায়। তারপর গলায় পরিধান করে নেয়। কক্ষে মিটমিট করে একটি প্রদীপ জ্বলছে। হযরত হাত তালি দেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশের আরেকটি কক্ষের দরজা খুলে যায়। একটি মেয়ে বেরিয়ে আসে। অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী। মাথার চুলগুলো খোলা। সোনালি তারের ন্যায় ঝিকমিক করছে। চুলগুলো ছড়িয়ে আছে দু'কাঁধের উপর। এমন রূপসী মেয়ে এর আগে কখনো সিপাহী দেখেনি। মেয়েটির হাতে সুদর্শন একটি পেয়ালা। পেয়ালাটা সিপাহীর তাতে দেয় সে। হযরত বসা থেকে উঠে দাঁড়ান। চলে যান অন্য কক্ষে। সিপাহী পেয়ালাটা হাতে নিয়ে একবার মেয়েটির প্রতি একবার পেয়ালার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে। মুখ খুলে মেয়েটি। বলল– 'হযরতের আসতে একটু দেরী হবে। তুমি এগুলো পান কর।' মেয়েটির ঠোঁটে হাসি– মন মাতানো অকৃত্রিম হাসি। সিপাহী পেয়ালাটা ঠোঁটের সঙ্গে লাগায় এবং এক ঢোক পান করে মেয়েটির প্রতি তাকায়।

'তোমার মতো সুশ্রী যুবক আমি মাঝে-মধ্যে দেখি'– সিপাহীর কাঁধে হাত রেখে মেয়েটি বলল– 'পান কর! এই শরবত আমি তোমার জন্য মনের মাধুরি মিশিয়ে তৈরি করে এনেছি। হযরত আমাকে বলেছিলেন, আজ রাতে তোমার পছন্দের এক যুবক আসবে; কিন্তু আমি ছেলেটার পরিচয় জানি না।'

সিপাহী প্রথমে থেমে থেমে দু'তিন চুমুক পান করে। তারপর ঢক ঢক করে গিলতে শুরু করে। পেয়ালাটা শূন্য হয়ে যায়। মেয়েটি ধীরে ধীরে সিপাহীর একেবারে গা ঘেঁষে বসে। সিপাহী অনুভব করে, মেয়েটি তার তেলেসমাতী রূপ আর জাদুকরী দেহটা নিয়ে শরবতের ন্যায় তার কণ্ঠনালী অতিক্রম করে শিরায় শিরায় মিশে গেছে।

হযরত ফিরে এসেছেন। তার হাতে কাচের একটি বল, আকারে যেন একটি নাশপতী। তিনি বলটি সিপাহীর হাতে দিয়ে বললেন, এটি চোখের সামনে ধর। এর ভেতর দিয়ে প্রদীপের শিখার দিকে তাকাও এবং তাকিয়ে থাক।

সিপাহী কাচের বলটির মধ্যদিয়ে প্রদীপের দিকে তাকায়। তাতে চোখের সামনে কয়েকটি রংও শিখায় দেখতে পায়। মেয়েটির রেশমী এলোমেলো চুল তার গণ্ড স্পর্শ করেছে। মেয়েটি তাকে এমনভাবে বাহুবন্ধনে আগলে রেখেছে যে, সিপাহী তার দেহের উষ্ণতা ও সুবাস অনুভব করছে। এবার তার কানে

জাদুকরী এক সুরেলা কণ্ঠ ভেসে আসতে শুরু করে– 'আমি সুলায়মানের সিংহাসন দেখতে পাচ্ছি। আমি সুলায়মানের সিংহাসন দেখতি পাচ্ছি।' কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে অনুভব করে কণ্ঠটা হযরতের। কিন্তু পরক্ষণেই সেটি তার নিজের কণ্ঠে পরিণত হয়ে যায়। সিপাহী এখন সেই জগতের বাসিন্দা, যা সে কাচের বলের মধ্যদিয়ে দেখছিল। সিপাহী সুলায়মানের সিংহাসন দেখতে পাচ্ছে। নূরানী চেহারার এক বাদশাহ তার উপর বসে আছেন। তার ডানে-বামে ও পেছনে চার-পাঁচটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েগুলো এতই রূপসী যে, মনে হচ্ছে হুর-পরী।

'হ্যাঁ হ্যাঁ'– সিপাহী বলে ওঠল- 'আমি সুলায়মানের সিংহাসন দেখতে পাচ্ছি।'

মেয়েটির বিক্ষিপ্ত চুলগুলো সিপাহীর বুকে-পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। সিপাহী কাচের মধ্যে দেখছে, সুলায়মানী সিংহাসনের নিকটে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি বলছে– 'এই রাজা তোমার দাদা, যিনি সাত রাজ্যের বাদশাহ। সুলায়মান বাদশাহর জিন-পরীরা তার দরবারে সিজদা করে। তুমি তোমার দাদাকে চিনে নাও। এই সিংহাসন তোমার উত্তরাধিকার সম্পদ।'

সিংহাসনটা সিপাহীর চোখের সম্মুখ থেকে সরে যেতে শুরু করে। সিপাহী চীৎকার করে ওঠে– 'উনি সিংহাসন নিয়ে গেলেন। ওরা দৈত্য। অনেক বড় বড়। ওরা সিংহাসনটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে।'

এখন কাচের বলের মধ্যে কয়েক বর্ণের কতগুলো শিখা রয়ে গেছে শুধু। শিখাগুলো তিরতির করে কাঁপছে, যেন উদ্বেলিত হয়ে নাচছে। সিপাহী অনুভব করে, যেন কোন বস্তু তার নাকের সঙ্গে লেপটে আছে। কাচের বলটি তার চোখের সামনে থেকে আপনা-আপনি সরে যায়। সিপাহী তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

তন্দ্রাভাব কেটে যায় সিপাহীর। এখন সে প্রকৃতিস্থ। মেয়েটি তার মাথায় হাত বুলাচ্ছে। চোখ খুলে দেখতে পায়, সে জাজিমের উপর বসে আছে। মেয়েটির একটি বাহু তার মাথার নীচে। মেয়েটি আধা শোয়া আধা বসা। সিপাহী উঠে বসে। রাজ্যের বিস্ময় তার মাথায়, বেজায় অস্থির। তার মুখ থেকে প্রথম কথা বের হয়– 'তিনি বলছিলেন, এটি তোমার দাদার সিংহাসন। এটি তোমার পৈত্রিক সম্পদ।'

'হযরতও একথাই বলেছেন।' মেয়েটি অত্যন্ত কোমল ও আন্তরিক কণ্ঠে বলল।

'হযরত কোথায়?' সিপাহী জিজ্ঞেস করে।

'তিনি আজ আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না।' মেয়েটি জবাব দেয়।

'তুমি বলেছিলে রাতের শেষ প্রহরে তোমার ডিউটি আছে। সেজন্য আমি

তোমাকে জাগিয়ে দিলাম। এখন মধ্যরাত। তুমি এবার চলে যাও।'

সিপাহী ওখান থেকে উঠতে চাচ্ছে না। সে মেয়েটির নিকট জানতে চায়– 'আমি স্বপ্ন দেখলাম, না বাস্তব।'

মেয়েটি বলল– 'না, তুমি স্বপ্ন দেখনি, এটা হযরতের বিশেষ কেরামত। তার প্রতি নির্দেশ, তিনি কোন ভেদ নিজের কাছে রাখতে পারবেন না। যার ভেদ তার নিকট পৌঁছিয়ে দেবেন। কিন্তু এই হালত তার মাঝে-মধ্যে দেখা যায়, সব সময় থাকে না। আবার কখন দেখা দেবে বলতে পারব না।'

সিপাহী মেয়েটির কাছে অনুনয়-বিনয় করতে শুরু করে। মেয়েটি বলল. 'তুমি আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছ। আমার আত্মাটা আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। আমি প্রয়োজন হলে তোমার জন্য নিজের জীবনও উৎসর্গ করে দেব। আমি তোমাকে কোনদিন যেতে দেব না। কিন্তু তোমার কর্তব্য পালন করাও তো জরুরী। এখন চলে যাও। আগামী রাতে আবার এস। আমি হযরতকে বলব, যেন তিনি তোমার ভেদ তোমাকে দিয়ে দেন।'

সিপাহী দুর্গ থেকে বের হয়। তার পা উঠছে না। তার মস্তিষ্কে দাদার তখতে সুলায়মানী জেঁকে বসেছে। হৃদয়টা দখল করে আছে মেয়েটা। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। কিন্তু দুর্গের ধ্বংসস্তূপটা তার কাছে রাজমহলের ন্যায় হৃদয়কাড়া মনে হচ্ছে। আনন্দের ঢেউ খেলছে তার মনে। এখন তার মনে কোন ভীতি নেই, অস্থিরতা নেই।

❁ ❁ ❁

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পূর্ণ দৃষ্টি সৈন্যদের প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধ পরিকল্পনায় নিবদ্ধ। তিনি নিজের ও উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের আরাম হারাম করে রেখেছেন। ইন্টেলিজেন্স ইনচার্জ হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ্ শত কর্মব্যস্ততার মধ্যে এ চিন্তাও মাথায় রেখেছেন যে, সুলতান আইউবী নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে সবসময় উদাসীন থাকেন। তাঁর দেহরক্ষী কমান্ডার একাধিকবার হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর নিকট অভিযোগ করেছেন যে, সুলতান অনেক সময় তাকে কিছু না জানিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যান এবং তিনি ভেতরে আছেন মনে করে আমরা শূন্যকক্ষ পাহারা দেই। কমান্ডার সুলতান আইউবীর সঙ্গে দু'-চারজন গার্ড ছায়ার মত জড়িয়ে রাখতে চায়। কমান্ডারকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, ফেদায়ী ঘাতকদল পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে সুলতান আইউবীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে দামেস্কে ঢুকেছে। এই সংবাদ কমান্ডারকে আরো বেশী পেরেশান করে তুলে। কিন্তু সুলতান আইউবী নিজে এতই বেপরোয়া যে,

হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ যখন তাকে বললেন, 'মহামান্য সুলতান! আপনি কখনো গার্ড ছাড়া বের হবেন না।' তখন সুলতান মুখে মুচকি হাসি টেনে তার পিঠ চাপড়ে বলেন, 'আমাদের প্রত্যেকের জীবন আল্লাহর হাতে। রক্ষীদের উপস্থিতিতে খুন করার উদ্দেশ্যে আমার উপর চারবার হামলা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল, আমি আরো ক'দিন বেঁচে থাকব। আমি আল্লাহর পথে চলছি। তিনি যদি ভিন্ন কিছু কামনা করেন, তাহলে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারব না। মোহাফেজরা পারবে না আমার মৃত্যু ঠেকিয়ে রাখতে।'

'কিন্তু তারপরও মোহতারাম সুলতান!'– হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ বললেন– 'আমার এবং রক্ষী বাহিনীর কর্তব্য তো এমন যে, আমরা আপনার বিশ্বাস ও আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারি না। আমি ফেদায়ীদের সম্পর্কে যে তথ্য পেয়েছি, তাতে রাতেও আমাকে আপনার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত।'

'আমি তোমার ও তোমার রক্ষী বহিনীর কর্তব্যবোধকে শ্রদ্ধা করি'– সুলতান আইউবী বললেন– 'কিন্তু যখন আমি মোহাফেজবেষ্টিত হয়ে বাইরে বের হই, তখন আমার নিকট মনে হয় যেন জনগণের উপর আমার কোন আস্থা নেই। নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের অভাব থাকলেই কেবল শাসকগোষ্ঠী জনগণকে ভয় করে থাকে।'

'ভয় জনগণের নয় মাননীয় সুলতান!'– হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ বললেন– 'আমি ফেদায়ীদের প্রসঙ্গে বলছি।'

'ঠিক আছে, আমি সাবধান থাকব।' সুলতান আইউবী হেসে বললেন।

সর্পকেল্লা থেকে ফিরে এসে রক্ষী সিপাহী তার ডিউটিতে চলে যায়। দিনটা সে এই মানসিক অবস্থার মধ্যে কাটায় যে, কল্পনায় তখ্তে সুলায়মান ও মেয়েটিকে দেখতে থাকে। সন্ধ্যা গভীর হওয়ামাত্র আবার সে দুর্গ অভিমুখে হাঁটা দেয়। এবার তার মনে কোন ভয় নেই। দুর্গের ফটক অতিক্রম করে অন্ধকারে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বলল– 'আমি এসে পড়েছি। অগ্রসর হতে পারি কি?'

তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সে মশালের আলো দেখতে পায়। মশালটা তার থেকে খানিকটা দূরে এসে থেমে যায়। মশালধারী বলল– 'কক্ষে ঢুকে অবশ্যই হযরতের পায়ে সিজদা করবে। আজ তিনি কাউকে সাক্ষাৎ দিতে রাজি নন, তুমি যখন এসে পড়েছ, তোমার জন্য ব্যবস্থা করা হবে।'

গতরাতের ন্যায় আজও আঁকাবাঁকা গলিপথ অতিক্রম করে সিপাহী মশলবাহী লোকটির পেছনে পেছনে হযরতের কক্ষের দরজার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়। হযরত তাকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করেন। সিপাহী কক্ষে ঢুকে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে এবং নিবেদন করে– 'হযরত! আমাকে কী দেখাবেন বলেছিলেন, দেখিয়ে দিন।'

হযরত হাততালি দেন। সঙ্গে সঙ্গে গতরাতের মেয়েটি পাশের কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে। সিপাহীকে দেখে তার দিকে তাকিয়ে মুচকি একটি হাসি দেয়– ভূবন মতানো হাসি। সিপাহী মেয়েটিকে নিজের কাছে বসানোর জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। হযরত মেয়েটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– 'লোকটা আজো এসে পড়েছে। আমি কি এখানে তামাশা দেখাতে বসেছি!'

'আপনি এই গুনাহগারকে ক্ষমা করে দিন'– মেয়েটি বলল– 'লোকটা বড় আশা নিয়ে অনেক দূর থেকে এসেছে।'

কিছুক্ষণ পর। কাচের ছোট্ট গোলকটি সিপাহীর হাতে। তার আগে মেয়েটি তাকে শরবত পান করিয়েছে। এখন তার পেছনে বসে পিঠটা নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বাহু দ্বারা তাকে জড়িয়ে রেখেছে, যেন মা তার শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসে আছে। সিপাহী হযরতের সুরেলা কণ্ঠ শুনতে পায়– 'আমি সুলায়মান বাদশাহর রাজপ্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। আমি সুলায়মান বাদশাহর সিংহাসন দেখতে পাচ্ছি।' আওয়াজটা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে থাকে, যেন বক্তা আস্তে আস্তে দূর থেকে দূরান্তে চলে যাচ্ছে।

'উহ!'– হতচকিত হয়ে সিপাহী বলল– 'এমন প্রাসাদ ইহজগতের কোন রাজা-বাদশাহর হতে পারে না।'

'আমি এই প্রাসাদে জন্মলাভ করেছিলাম'– সিপাহী কারো কণ্ঠ শুনতে পায়– 'আমি এই প্রাসাদেই জন্মলাভ করেছিলাম।' পরক্ষণে এটি তার নিজের কণ্ঠে পরিণত হয়ে যায়। তারপর সে অনুভব করে, যেন তারই অস্তিত্বের মধ্যে এই আওয়াজটি সঞ্চারিত হচ্ছে– 'আমি এই প্রাসাদে জন্মলাভ করেছিলাম।'

কিন্তু পরক্ষণেই এখন আর কোন সাড়াশব্দ নেই। সিপাহী এখন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। এখন তার চোখের সামনে একটি মহল ভাসছে এবং নিজে তার বাইরে একটি বাগানের ভেতর ঘোরাফেরা করছে। এখন আর কাচের মধ্যদিয়ে নয়, এসব সে বাস্তবেই প্রত্যক্ষ করছে। ইচ্ছে করলে এখন সে বাগান, ফুল ইত্যাদি হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে, শুকতে পারে। এখন সে কারো সিপাহী নয়– রাজপুত্র।

হঠাৎ মহলটি সিপাহীর দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যায়। এখন সে বিস্ময়কর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তাকিয়ে দেখে, সে মেয়েটির কোলে বসে আছে। মেয়েটিকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে সে। মেয়েটি বলে– 'হযরত বলে গেছেন, এই লোকটি (অর্থাৎ তুমি) রাজপুত্র ছিল। এখনো সে রাজপুত্র হতে পারে। তিনি জানতে চেষ্টা করছেন, তোমার সিংহাসন কে দখল করে আছেন। তিনি বলে গেছেন, তুমি যদি সাত-আট দিন এখানে থাক, তাহলে সবকিছু জানতে পারবে এবং তোমাকে সবকিছু দেখানো হবে।'

❁ ❁ ❁

পরের রাত। সিপাহী স্বর্পকেল্লার উক্ত কক্ষে উপবিষ্ট। চার দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে সে। মেয়েটি আগের পেয়ালাটিতে করে তাকে শরবত পান করায় এবং কাচের বলটি তার হাতে দেয়। কারো কিছু বলার অপেক্ষা না করেই সে বলটি চোখের সামনে ধরে তার মধ্যদিয়ে দীপশিখা দেখতে থাকে। শিখার মধ্যে রং-বেরঙের আলোর খেলা দেখতে পায় সে। হযরত তার জাদুকরী ধারায় কিছু বলতে শুরু করেন। ইতিপূর্বে সে কয়েকবার এররূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। প্রথম সে কাচের বলের মধ্যে তখ্‌তে সুলায়মান এবং দ্বিতীয়বার শাহে সুলায়মান দেখেছিল। কিন্তু পরক্ষণে আর তার হাতে বলটি থাকত না। বলটির মধ্যদিয়ে যখন সে কিছু দেখতে শুরু করত, তখনই হযরত কিংবা মেয়েটি সিপাহীর হাত থেকে বলটি নিয়ে যেত।

আজ তৃতীয় রাতে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। কালো দাড়িওয়ালা হযরত তার সামনে বসে পড়ে এবং তার চোখে চোখ রেখে জাদুকরী ভাষায় ক্ষীণ কণ্ঠে বলছে– 'এটি ফুল, এটি বাগিচা। আমি বাগানে আছি।' দেখাদেখি সিপাহীও একই কথা উচ্চারণ করছে। মেয়েটি সিপাহীর গা ঘেঁষে বসে তার চুলে বিলি কাটছে।

সিপাহী একটি বাগিচা দেখতে পায়। বাগানটি উঁচু-নীচু। সর্বত্র ফুলের সমারোহ। যেদিকে চোখ পড়ে শুধু ফুল আর ফল। মন মাতানো সৌরভ মৌ মৌ করছে। সিপাহী দেখতে পায়, বাগিচার মধ্যে একটি মেয়ে পায়চারী করছে। মেয়েটি অত্যন্ত রূপসী। তার গায়ে এক রংয়ের পোশাক। কিন্তু তা দুনিয়ার কোন রং নয়। সিপাহী এখন সর্পকেল্লার কক্ষে নয়। কালো দাড়িওয়ালা হযরত আর সঙ্গের মেয়েটি থেকে সম্পূর্ণ বেখবর ও সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছে সে। বাগিচায় অপরূপ সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে দুর্গ থেকে বেরিয়ে তার দিকে ছুটে যায়। মেয়েটিও তার দিকে দৌড়ে আসে। মেয়েটির শরীর

থেকে ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে। সিপাহী সুলায়মান বাদশাহর বংশের রাজপুত্র। মেয়েটির সঙ্গে তাকে মানিয়েছে বেশ। দু'জন বাগিচার এক কোণে চলে যায়। ওখানে গুহাসম একটি জায়গা। গুহাটিও ফুল দিয়ে সাজানো। মেঝেতে ঘাসের ন্যায় মখমল বিছানো।

ফুলসজ্জিত গুহার এক কোণ থেকে সুন্দর একটি কলসি বের করে আনে মেয়েটি। তার থেকে কি যেন ঢেলে পেয়ালায় নিয়ে সিপাহীর হাতে দেয়। মদ। মেয়েটির রূপ আর ভালবাসার নেশা সিপাহীকে আগে থেকেই মাতাল করে রেখেছে। এবার মদের নেশা তাকে আরো মাতাল করে তুলে। মেয়েটি বলল, 'তুমি থাক। আমি এক্ষুণি আসছি।' বলেই স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। মুহূর্ত পর সিপাহী মেয়েটির চীৎকার শুনতে পায়– আর্তচিৎকার। সিপাহী বাইরের দিকে ছুটে যায়। এদিক-ওদিক তাকায়। কিন্তু মেয়েটি নেই কোথাও। সে চিৎকারের শব্দ অনুসরণ করে দৌড়াতে থাকে। মেয়েটির হৃদয়বিদারক চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সিপাহী ক্ষুব্ধ হয়ে তরবারী হাতে নিয়ে মেয়েটিকে খুঁজতে থাকে। পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করছে সে। অবশেষে খুঁজতে খুঁজতে সিপাহী এক বৃদ্ধাকে দেখতে পায়। বৃদ্ধা তাকে জানায়, তুমি যাকে খুঁজছ, তাকে আর পাওয়া যাবে না। যে ব্যক্তি তোমার প্রেয়সীকে নিয়ে গেছে, সে তোমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী। তাকে তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। তাকে যে নিয়ে গেছে, সে এখন সেই সিংহাসনে আরোহণ করবে, যেখানে তোমার বসবার কথা ছিল। ছুটাছুটি করে লাভ নেই। বেঁচে থাক, সময় সুযোগ মতো তাকে খুন করে তোমার প্রিয়াকে উদ্ধার করে এন। মেয়েটি তোমার বিরহে নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

'আমার প্রিয়াকে যে নিয়ে গেল, সে কে?' সর্পকেল্লার মহলের কক্ষে ফিরে এসে সিপাহী জিজ্ঞেস করে– 'আর আমি এসব কী দেখলাম?'

'তুমি তোমার অতীত জীবন দেখেছ'– হযরত বললেন– 'আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি।'

'না, আমি ওখান থেকে ফিরে আসতে চাই না'– অস্থির ও ব্যাকুল কণ্ঠে সিপাহী বলল– 'আমাকে ওখানেই পাঠিয়ে দিন।'

'ওখানে গিয়ে তুমি কী করবে?'– হযরত জিজ্ঞেস করেন– 'যার জন্য যাওয়া, তাকে অন্য কেউ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সে তো এখন অন্যের দখলে। তুমি যতক্ষণ না তাকে হত্যা করবে, ততক্ষণ ওকে ফিরে পাবে না। আমি চাই না তুমি কাউকে হত্যা কর। আর তুমি তাকে হত্যা করতে পারবেও না।'

'হযরত!'– সিপাহী গর্জে ওঠে– 'কাউকে খুন করে যদি আমি পৈত্রিক সিংহাসন আর প্রেয়সীকে ফিরে পেতে পারি, তাহলে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর চেয়েও মর্যাদাবান এবং ক্ষমতাসম্পন্ন লোককে আমি খুন করব।'

'তারপর সেই খুনের দায় আমার ঘাড়ে চাপাবে, না দোস্ত!' হযরত বললেন।

সিপাহী তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে মাথা ঠুকতে শুরু করে– 'হযরত! হযরত!' বলে ক্রন্দন করতে থাকে।

হযরত সিপাহীকে আবার সেই জগতে পৌঁছিয়ে দেন, যেখানে তখ্‌তে সুলায়মানী ছিল, মহল ও বাগিচা ছিল। সিপাহীর কানে আওয়াজ আসতে শুরু করে– 'এই তো সেই ব্যক্তি, যে তোমার দাদাকে হত্যা করেছে, তোমার পিতাকে হত্যা করেছে। তোমার সিংহাসন ও মুকুট ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তোমার প্রেয়সী এরই হাতে বন্দী।'

'না না, ইনি নন'– সিপাহী ভয়জড়িত কণ্ঠে বলল– 'ইনি তো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।'

'আরে ইনিই তো তোমার ভাগ্যের হন্তা।'– সিপাহীর কানে আওয়াজ আসতে শুরু করে– 'ইনি তোমার সুলতান হতে পারেন না। ইনি কুর্দী আর তুমি আরব। তুমি বল, সালাহুদ্দীন আইউবী আমার দাদার ঘাতক, আমার পিতার ঘাতক, আমার সিংহাসন ও রাজমুকুট ছিনতাইকারী। ভেদ বেরিয়ে এসেছে, রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। তুমি প্রতিশোধ নাও। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকে।'

সিপাহী এই জাদুময় পরিবেশে চক্কর কাটছে আর জপ করছে– 'সালাহুদ্দীন আইউবী আমার দাদার হন্তারক, আমার পিতার ঘাতক, আমার সিংহাসন ও রাজমুকুট ছিনতাইকারী, আমার প্রেমের সংহারক, আমার ভাগ্যের খুনী।'

এখন তার দৃষ্টির সামনে শুধুই সালাহুদ্দীন আইউবী। সালাহুদ্দীন আইউবী তার চোখের সামনে হাঁটছেন, চলাফেরা করছেন। সিপাহী হাতে খঞ্জর তুলে নিয়ে তার পেছনে পেছনে হাঁটছে। কিন্তু খুন করার মওকা পাচ্ছে না।

হঠাৎ প্রেয়সী মেয়েটি চোখে পড়ে সিপাহীর। পিঞ্জিরায় আবদ্ধ মেয়েটি। সালাহুদ্দীন আইউবী যেন পিঞ্জিরার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছেন। মেয়েটি সিপাহীর প্রতি করুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। সুলতান আইউবীর চেহারাটা ধীরে ধীরে হিংস্র হয়ে ওঠছে। সিপাহী বলা বন্ধ করে। এবার তার কানে শূন্য থেকে আওয়াজ ভেসে আসে– 'সালাহুদ্দীন আইউবী আমার দাদার ঘাতক, আইউবী আমার পিতার হন্তারক...।'

❁ ❁ ❁

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নিজ কক্ষে তাঁর উপদেষ্টাবৃন্দ ও ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ে কথা বলছেন। নতুন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করছেন তিনি। সর্পকেল্লায় গিয়ে আসা মোহাফেজ সিপাহী এই মুহূর্তে সুলতানের প্রহরায় বাইরে দণ্ডায়মান। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর উপদেষ্টা প্রমুখ কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। সুলতান আইউবী একাকী কক্ষে থেকে যান। সিপাহী হন হন করে কক্ষে ঢুকে পড়ে এবং সুলতানের মাথার উপর তরবারী উঁচিয়ে বলে ওঠে– 'তুমি আমার দাদার ঘাতক, তুমি আমার পিতার ঘাতক।' সুলতান চকিতে তার দিকে ফিরে তাকান– 'ওকে মুক্ত করে দাও, ও আমার স্ত্রী।' সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় ক্ষোভের সাথে সিপাহী সুলতান আইউবীর উপর তরবারীর আঘাত হানে। সুলতানের হাতে কিছু নেই। তিনি কৌশলে আঘাত প্রতিহত করেন। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে রক্ষী কমান্ডারকে ডাক দেন এবং উঠে ছুটে গিয়ে নিজের তরবারীটা হাতে তুলে নেন। সিপাহী আরো অধিক ক্ষুব্ধ হয়ে পুনরায় আঘাত হানে। সিপাহীর টার্গেট যদি সুলতান আইউবী না হতেন, তাহলে তার মতো অভিজ্ঞ সৈনিকের একটি আঘাতও ব্যর্থ হতো না। সুলতান আইউবী শুধু তার আক্রমণ প্রতিহত করেন। নিজে একটি আঘাতও করলেন না। ডাক শুনে কমান্ডার যখন ছুটে আসে, তখন সুলতান তাকে বললেন, ওকে আঘাত কর না; অক্ষত ধরে ফেল।

সিপাহী চক্কর কেটে কমান্ডারের উপর আঘাত হানে। ইতিমধ্যে তিন-চারজন বডিগার্ড কক্ষে ঢুকে পড়ে। সিপাহী এতই ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত যে, সে একের পর এক আঘাত হেনে কাউকেই তার কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। তার লক্ষ্য সুলতান আইউবীকে হত্যা করা। তাই তাকে উদ্দেশ করে গর্জন করে বলছে– 'তুমি আমার দাদার ঘাতক, আমার পিতার ঘাতক, তুমি আমার সিংহাসন ও রাজমুকুট কেড়ে নিয়েছ।'

অবশেষে তাকে পাকড়াও করা হল। তার থেকে তরবারী ছিনিয়ে নেয়া হল।

'ধন্যবাদ আমার মোহাফেজ!'– সুলতান আইউবী ক্ষোভ জাহির করার পরিবর্তে সিপাহীর প্রশংসা করে বললেন– 'সালতানাতে ইসলামিয়ার জন্য তোমার মত দক্ষ অসিবাজের প্রয়োজন রয়েছে।'

রক্ষী কমান্ডার ও অন্যান্য সিপাহীরা বিস্ময়ে হতবাক যে, ঘটনা কী ঘটল! সুলতান আইউবী কমান্ডারকে বললেন– 'ডাক্তার এবং হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে এক্ষুণি নিয়ে আস।'

চারজন বডিগার্ড সিপাহীকে ঝাঁপটে ধরে রেখেছে। সিপাহী চিৎকার করছে– 'ইনি আমার ভালাবাসার ঘাতক। ইনি আমার ভাগ্যের হন্তারক।'

এক বডিগার্ড হাত দ্বারা সিপাহীর মুখটা চেপে ধরে। কিন্তু সুলতান বললেন– 'ওকে বলতে দাও, মুখ থেকে হাত সরিয়ে নাও'– তিনি সিপাহীকে উদ্দেশ করে বললেন– 'বলতে থাক দোস্ত! বল, তুমি কেন আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে?'

'ওকে মুক্ত করে দিন'– সিপাহী চীৎকার করে বলল– 'আপনি ওকে পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করে রেখেছেন। হযরত আমাকে বলেছেন, আমি নাকি আপনাকে খুন করতে পারব না। আসুন, আমার মোকাবেলা করুন, আপনি নিজেকে রক্ষা করার জন্য কাপুরুষের ন্যায় এতগুলো লোক জড়ো করেছেন। তরবারী বের করুন, আমার তরবারীটা আমাকে দিয়ে দিন, আপনি ময়দানে আসুন। '

সুলতান আইউবী অপলক তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সিপাহীর প্রতি তাকিয়ে আছেন। বডিগার্ড সুলতানের নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। হামলাকারী সিপাহীকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। তার অপরাধ লঘু নয়। হত্যার উদ্দেশ্যে সুলতান আইউবীর উপর হামলা করেছে। সুলতান যদি উদাসীন থাকতেন কিংবা কক্ষে সিপাহীর প্রবেশ দেখে না ফেলতেন, তাহলে তাঁর খুন হয়ে যাওয়া নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সুলতান আইউবী তাকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন না। সিপাহী বকে যাচ্ছে উন্মাদের ন্যায়। এমন সময়ে ডাক্তার এসে গেছেন। তার খানিক পর হাসান ইবনে আব্দুল্লাহও এসে পড়েন। ভেতরের পরিস্থিতি দেখে তিনি হতবাক্ হয়ে যান।

'একে নিয়ে যান।'– সুলতান আইউবী ডাক্তারকে বললেন– 'লোকটা বোধ হয় হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে।'

'লোকটা চারদিন ছুটি কাটিয়ে এসেছে' রক্ষী কমান্ডার বললেন– 'আসার পর থেকে লোকটা কোন কথা বলছে না।'

সিপাহীকে টেনে-হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তারও সঙ্গে চলে যান। সুলতান আইউবী হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে অবহিত করলেন, 'এই সিপাহী হত্যার উদ্দেশ্যে আমার উপর হামলা করেছে।' হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ সন্দেহ ব্যক্ত করলেন, 'লোকটা ফেদায়ী হতে পারে।' সুলতান বললেন, 'যে কারণেই হোক, লোকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।' সুলতান হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে বললেন, 'একে ভালভাবে জিজ্ঞাসাবাদ কর, তথ্য নাও।'

দীর্ঘক্ষণ পর ডাক্তার সুলতান আইউবীর নিকট ফিরে এসে তথ্য প্রদান করেন, আপনার এই সিপাহীকে লাগাতার কয়েকদিন পর্যন্ত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে এবং তার উপর হেপটানিজম প্রয়োগ করা হয়েছে। ডাক্তার তার নিঃশ্বাস শুঁকে বুঝতে পারেন যে, লোকটাকে নেশাকর দ্রব্য খাওয়ানো বা পান করানো হয়েছে। তিনি সুলতান আইউবীকে জানান, 'হেপটানিজম চিকিৎসা শাস্ত্রে বিস্ময়কর কোন বিষয় নয়। এর উদ্ভাবক হল হাসান ইবনে সাব্বাহ। আপনার হয়ত জানা আছে, হাসান ইবনে সাব্বাহ এক প্রকার নেশাকর শরবত আবিষ্কার করেছে। যে-ই তা পান করে, তার চোখের সামনে অত্যন্ত সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য ভেসে ওঠে। সেই অবস্থায় যে কথাই তার কানে দেয়া হোক, তা তার সামনে বাস্তব সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। হাসান ইবনে সাব্বাহ এই নেশা আর হেপটানিজমেরই ভিত্তিতে একটি জান্নাত তৈরি করে রেখেছে, যাতে কেউ একবার প্রবেশ করলে আর বের হতে চায় না। সে মাটির চাকা আর কংকর মুখে দিয়ে মনে করে, অতি সুস্বাদু খাবার খাচ্ছে। কাঁটার উপর দিয়ে হেঁটে মনে করে গালিচার উপর দিয়ে চলছে। হাসান ইবনে সাব্বাহ দুনিয়া থেকে চলে গেছে ঠিক, কিন্তু তার এই শরবত আর প্রক্রিয়া দুনিয়াতে রেখে গেছে। তার অনুসারীরা 'ঘাতক চক্র' হিসেবে অবির্ভূত হয়েছে। এরা কার্যসিদ্ধির জন্য সুন্দরী নারী আর 'শরবতের' ব্যবহার করে। আমি যতটুকু বুঝেছি, এই সিপাহী আপনাকে হত্যা করার লক্ষ্যে এই হেপটানিজম প্রক্রিয়ার শিকার।'

ডাক্তার সিপাহীকে ঔষধ সেবন করান। অল্প সময়ের মধ্যেই ঔষধ ক্রিয়া করতে শুরু করে। সিপাহী শান্ত হয়ে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ে। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ জানতে পারেন যে, সিপাহী ইতিমধ্যে চারদিনের ছুটিতে গিয়েছিল। কিন্তু ছুটিটা কোথায় কাটিয়ে এসেছে, তা কেউ জানে না। সর্পকেল্লা সম্পর্কে শহরে যে গুজব ছড়িয়েছে, হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ গোয়েন্দা মারফত সে সংবাদ পেয়ে গেছেন। মানুষ বলাবলি করছে, সর্পকেল্লায় এক বুজুর্গ আত্মপ্রকাশ করেছেন, যিনি অদৃশ্যের খবর বলতে পারেন এবং মানুষের মনোবাসনা পূরণ করে দেন। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর এক গুপ্তচর রিপোর্ট করেছে, আমি কালো দাড়িওয়ালা এক বুজুর্গকে দু-দু'বার দুর্গে ঢুকতে দেখেছি। কিন্তু হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। তিনি মনে করেছেন, এ ধরনের পীর-বুজুর্গদের উৎপাত-আনাগোনা তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অনেক সময় মানুষ উন্মাদ-

দেওয়ানাকে বুজুর্গ মনে করে তাদের পিছনে ছুটতে শুরু করে।

দুর্গের আশপাশে চলাচলকারী লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাদের এক ব্যক্তি জানায়, 'হ্যাঁ, আমি কালো দাড়ি ও সাদা চোগা পরিহিত এক ব্যক্তিকে দুর্গে আসা-যাওয়া করতে দেখেছি।' এরূপ একাধিক সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ সেদিনই সূর্যাস্তের কিছু আগে একটি সেনাদল প্রেরণ করে কেল্লায় হানা দেন। সৈন্যরা মশাল নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। দুর্গের অভ্যন্তরে আঁকা-বাঁকা পথ। বিধ্বস্ত দেয়াল ও ছাদের ধ্বংসাবশেষ। কয়েকটি কক্ষ এখনো অক্ষত আছে। সৈন্যরা দুর্গের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ এক কোন থেকে শোরগোল ভেসে আসে। কয়েকজন সিপাহী সেদিকে দৌড়ে যায়। ওখানে দু'জন সিপাহী মাটিতে পড়ে তড়পাচ্ছে। তাদের বুকে তীর বিদ্ধ হয়ে আছে। ইতিমধ্যে আরো তিন-চারটি তীর ছুটে আসে। পড়ে যায় আরো তিন-চারজন সিপাহী। কয়েকজন সিপাহী এই ভয়ে পেছনে সরে যায় যে, এরা মানুষ নয়– ভূত-প্রেত হবে নিশ্চয়ই। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ ছিলেন বাস্তববাদী মানুষ। তিনি সিপাহীদের উৎসাহ প্রদান করে বললেন, এই তীর মানুষই ছুঁড়ছে। তিনি অবরোধের বিন্যাস পরিবর্তন করে ঘেরাও সংকীর্ণ করতে শুরু করেন। কিন্তু তারা কোথাও কোন মানুষ দেখতে পেলেন না। কেবল অজ্ঞাত স্থান থেকে দু'-চারটি তীর ছুটে আসছে আর তাতে দু'-চারজন সিপাহী জখম হচ্ছে।

হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ আরেক দল সৈন্য ডেকে আনেন। রাত গভীর হয়ে গেছে। তিনি অনেকগুলো মশালেরও ব্যবস্থা করেন। সিপাহী যে কক্ষটিতে যাওয়া-আসা করেছিল, এক সেনা ইউনিটের কমান্ডার সে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই ভয়ংকর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এমন সাজানো-গোছানো মনোরম একটি কক্ষ দেখে কমান্ডার ভয় পেয়ে যায়। জিন-ভূতের আবাস কিনা কে বলবে। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে তলব করা হল। তিনি এসে ভেতরে প্রবেশ করে সামানপত্র দেখতে শুরু করলেন। আস্তে আস্তে রহস্য উন্মোচিত হতে লাগল। ইতিমধ্যে কয়েকজন সিপাহী কালো দাড়িওয়ালা লোকটিকে কোথাও থেকে ধরে নিয়ে আসে। তার সঙ্গে অতিশয় রূপসী একটি মেয়ে। তার পরক্ষণেই ধরা পড়ল অন্য এক স্থানে লুকিয়ে থাকা আরো ছয়জন। তাদের হাতে তীর-ধনুক। কালো দাড়িওয়ালা নিজেকে দুনিয়াত্যাগী নির্জনবাসী বুযুর্গ দাবি করে সাধু সাজতে চেষ্টা করে। কিন্তু সঙ্গের রূপসী যুবতী ও তীর-ধনুক-সজ্জিত সেনা বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা

তাকে মিথ্যুক বলে প্রমাণিত করে। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ তাদের সামানপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রসহ তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন।

কক্ষে পাওয়া গেছে তিন-চারটি সোরাহী ও পানপাত্র। বস্তুগুলো রাতেই হাকীমের হাতে তুলে দেয়া হয়। হাকীম সেগুলো নাকে শুঁকেই বলে দিলেন, আমি হাসান ইবনে সাব্বার যে শরবত উদ্ভাবনের কথা বলেছিলাম, এগুলো থেকে তারই ঘ্রাণ পাচ্ছি। মেয়েটিসহ গ্রেফতারকৃত সবাইকে কয়েদখানায় বন্দী করে রাখা হল।

পরদিন ভোরবেলা। এখনো সূর্য উদিত হয়নি। জিজ্ঞাসাবাদের প্রথম ধাপেই মেয়েটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে দেয়– 'লোকগুলো ফেদায়ী ঘাতক।' কালো দাড়িওয়ালা লোকটি নতুন শপথ নিয়ে এসেছে, হয়ত সুলতান আইউবীকে হত্যা করে ফিরবে, অন্যথায় নিজে জীবন দেবে। মেয়েটি জানায়, এই মোহাফেজ সিপাহীকে কালো দাড়িওয়ালা ফাঁদে ফেলেছে এবং নেশা পান করিয়ে তার উপর হেপটানিজম প্রয়োগ করেছে। সেই নেশা আর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে এমন ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে সুলতানকে হত্যা করার জন্য ছুটে এসেছে। আশা ছিল, সুলতান আইউবী এই সিপাহীর হাতে নিহত হবেন। সেজন্য তিনি নিশ্চিন্তে দুর্গে বসে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি গুপ্তচরবৃত্তির জন্যে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু কোন তথ্য নিতে পারেননি। সিপাহীকেও কোথাও দেখতে পাননি। আর সন্ধ্যার সময় হঠাৎ ফৌজ হানা দিয়ে বসে।

কালো দাড়িওয়ালা লোকটি বড় কঠিন হৃদয়ের মানুষ প্রমাণিত হল। সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, মেয়েটির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তার সঙ্গীরাও প্রথম প্রথম অস্বীকার করে। কিন্তু হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ যখন তাদেরকে পাতাল কক্ষে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন শুরু করে, তখন এক এক করে অপরাধের কথা স্বীকার করে। কালো দাড়িওয়ালা ব্যক্তিকে যখন তাদের সামনে উপস্থিত করা হল, তখন আর তার অস্বীকার করার কোন উপায় থাকল না। সঙ্গীদের করুণ দৃশ্য দেখামাত্র তার কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। তাকে বলা হল, সব ঘটনা খুলে বললে তোমাকে স্বসম্মানে রাখা হবে। অন্যথায় তুমি বাঁচতেও পারবে না, মরতেও পারবে না। হাড়-গোশত একাকার হওয়ার আগে সত্য সত্য বলে দাও। লোকটি কক্ষে নির্যাতনের উপকরণ ও পন্থা-পদ্ধতি দেখে সব কথা বলে দিতে সম্মত হয়ে যায়।

তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক সে ফেদায়ী ঘাতকদলের সদস্য।

ফেদায়ীদের পৃষ্ঠপোষক শেখ সান্নানের বিশেষ ভক্ত। কিন্তু সে নিজ হাতে হত্যা করে না। হাসান ইবনে সাব্বাহ আবিষ্কৃত বিশেষ পন্থায় অন্যকে দিয়ে খুন করায় সে। সকল ঐতিহাসিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ হাসান ইবনে সাব্বাহকে অস্বাভাবিক মেধা দান করেছিলেন, যা সে শয়তানী কাজে ব্যবহার করেছে।

কালো দাড়িওয়ালা জানায়, সুলতান আইউবীকে হত্যা করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে চারবার হামলা করা হয়েছিল। তার প্রতিটি হামলা ব্যর্থ হওয়ার পর আমাকে আবার বিশেষ পন্থা প্রয়োগ করার জন্য পাঠানো হয়েছে। সে জানায়, সুলতান আইউবীর উপর যে ক'টি হামলা হয়েছে, সবক'টিই হয়েছে সরাসরি। তাতে প্রমাণিত হয়েছে, সুলতানকে সোজা পথে হত্যা করা যাবে না। সে তার দলের ছয়জন অভিজ্ঞ লোক ও একটি মেয়েকে নিয়ে দামেস্ক চলে আসে। এসে সর্পকেল্লায় আস্তানা বানায়। এই চক্রটি রাতের অন্ধকারে তাতে প্রবেশ করে। তাদেরই দলের লোকেরা শহরে গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, দুর্গে একজন দরবেশ আত্মপ্রকাশ করেছেন, যার হাতে গায়েবী শক্তি আছে এবং ভবিষ্যতের কথা বলে দিতে পারেন। এই গুজবের উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ দুর্গে আসুক এবং লোকটিকে অস্বাভাবিক শক্তিধর পীর-বুজুর্গ বলে বিশ্বাস করুক। তিনি প্রভাব বিস্তার করে এক বা একাধিক লোককে হাত করে নিয়ে তাদের দ্বারা সুলতান আইউবীকে হত্যা করাবে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হল না, একজন মানুষও দুর্গে এল না। কারণ, মানুষ জানত, এই দুর্গে এমন দু'টি নাগ-নাগিনী বাস করে, যাদের বয়স হাজার বছর অতিক্রম করেছে। এখন তারা মানুষের রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং যাকে পায় তাকেই গিলে ফেলে।

এই চক্রের প্রধান কালো দাড়িওয়ালা লোকটি একজন অভিজ্ঞ ঘাতক। তার মাথায় পরিকল্পনা আসে যে, উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সুলতান আইউবীর বাহিনীর কোন সিপাহীকে ব্যবহার করতে হবে। সে কয়েকদিন পর্যন্ত খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করে, রক্ষী বাহিনীর সিপাহীরা কোথায় থাকে এবং তাদের ডিউটি কোন্ দিন পড়ে। কিন্তু সে সুলতান আইউবীর দফতর ও বাসগৃহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। কারণ, এ দু'টো হল সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ এলাকা। কোন নাগরিক কিংবা সাধারণ কোন সৈনিক সে এলাকায় ঢুকতে পারে না। এক পর্যায়ে লোকটি এই সিপাহীর সন্ধান পায় এবং কোন প্রকারে জানতে পারে যে, সে সুলতান আইউবীর

দফতরের রক্ষীসেনা। অর্থাৎ এই লোকটি অনায়াসে সুলতানের দফতর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। দলনেতা এই সিপাহীর উপর নজর রাখতে শুরু করে। তখন তার বেশভূষা ছিল অন্যরকম। একদিন এই সিপাহী বাইরে বের হয়। ঘাতক নেতা তাকে দেখতে পায়। সে পথেই তার গতিরোধ করে এবং এমনভাবে এমন ধারার কথা বলে, যাতে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষও প্রভাবিত না হয়ে পারে না। লোকটা ঘাতকচক্র নেতার জাদুকরী জালে আটকে যায় এবং রাতে দুর্গে চলে যায়।

দুর্গের একটি মনোরম কক্ষে যে আয়োজন-ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল, তা পাথরকে মোমে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এক তো ছিল কক্ষের সাজগোজ, পরিপাটি ও মহামূল্যবান জাজিম বিছানো; তদুপরি যাদুকরী রূপ-যৌবন ও সুডৌল-সুঠাম দেহের অধিকারী অর্ধনগ্ন একটি মেয়ে। মেয়েটির উন্মুক্ত রেশমী চুলে জাদুর আকর্ষণ, যা কিনা একজন দুনিয়াত্যাগী আবেদের মধ্যেও পাশবিকতা জাগিয়ে তোলে। আসল বস্তু হল 'শরবত', যা পান করিয়ে নেশা সৃষ্টি করা হয়। কাচের গোলকটি ব্যবহার করা হয় দৃষ্টিতে ভেল্কিবাজি সৃষ্টি করার জন্যে। সিপাহীর মস্তিষ্কে এই ধারণা দেয়া হয় যে, সে রাজবংশের সন্তান এবং তার বংশ তখ্‌তে সুলায়মানীর উত্তরসূরী।

এই সিপাহী যখন উক্ত কক্ষে প্রবেশ করে, তখন কক্ষের সাজসজ্জা ও মূল্যবান জিনিসপত্র তাকে প্রভাবিত করে ফেলে। কালো দাড়িওয়ালা ঘাতকনেতা তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তারও একটি ক্রিয়া ছিল। উপরন্তু পার্শ্বে একটি রূপসী মেয়েকে পেয়ে সে রীতিমত কাবু হয়ে যায়। মেয়েটি তাকে যে শরবত পান করায়, তাতেও নেশা ছিল। সেই নেশার ক্রিয়া এমন ছিল যে, তাতে মানুষ বাস্তব জগত থেকে সম্পর্কহীন হয়ে মন ভোলানো সুদৃশ্য এক কল্পনার জগতে চলে যায়। আর সেই অবস্থায়ই তাকে হেপটানাইজ করা হয় এবং তার মস্তিষ্কে কাঙ্ক্ষিত কল্পনা ঢেলে দেয়া হয়। তার হাতে কাচের যে গোলকটি দেয়া হয়, তার মধ্য দিয়ে দীপ শিখার কয়েকটি রং দেখা যায়, যা মূলত ভেল্কি ছাড়া কিছু নয়। কাচের গঠন এমন যে, তার মধ্যদিয়ে অতিক্রমকারী আলো সাতটি বর্ণে প্রতিভাত হয়, যা মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে। পরক্ষণে একটি রূপসী মেয়ে সিপাহীর পার্শ্বে বসে যায় এবং কথায় কথায় প্রকাশ করে যে, সে তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে। কালো দাড়িওয়ালা লোকটি জাদুকরী সুরেলা কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করে। তার উচ্চারিত শব্দমালা সিপাহীর কানে পৌঁছে তার মস্তিষ্কে

কাঙ্খিত কল্পনা সাজিয়ে তোলে। কালো দাড়িওয়ালা আন্দাজ করে নেয় যে, সিপাহী এখন প্রকৃতিস্থ নেই। সেই অবস্থায় তার হাত থেকে কাচের গোলকটি নিয়ে গিয়ে তার চোখে চোখ রাখে এবং তাকে হেপটানাইজ করে।

সিপাহী যাকে নিজের আওয়াজ মনে করে, তা মূলত কালো দাড়িওয়ালা ব্যক্তির কণ্ঠস্বর। তারপর সে এমন এক স্তরে গিয়ে উপনীত হয়, যেখানে সে নিজের কল্পনাকে বাস্তব মনে করে তাতে একাকার হয়ে যায়। এবার দুর্বলমনা সিপাহী সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। কালো দাড়িওয়ালা ব্যক্তি তাকে বাস্তব জগতে নিয়ে এসে নিজে অন্য কক্ষে চলে যায় এবং মেয়েটি একাকী সিপাহীর সঙ্গে থেকে যায়। সে সিপাহীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মন-মস্তিষ্কে জেঁকে বসে। এই উদ্দেশ্য সাধনে সে এমন আচরণ ও এমন কথা বলে, যার ক্রিয়া থেকে অন্তত এই সিপাহী রক্ষা পেতে পারে না। সিপাহীকে শুধু 'তখ্‌তে সুলায়মানী' প্রদর্শন করিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় এবং ধারণা দেয়া হয় যে, ভেদ এখনো অবশিষ্ট আছে। সিপাহী সম্পূর্ণরূপে তার জালে ফেঁসে যায়। এবার সে কাকুতি-মিনতি শুরু করে যে, অবশিষ্ট ভেদও বলে দাও। তাকে বলা হল, ঠিক আছে, তুমি আরো কয়েকদিন আমার নিকট থাক। সিপাহী কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে পুনরায় দুর্গে চলে যায়।

সিপাহী টানা চার দিন চার রাত সর্পকেল্লার কক্ষে অবস্থান করে। এ সময়টায় তাকে লাগাতার নেশা ও হেপটানিজমের ক্রিয়াধীন রাখা হয় এবং তার নিষ্ক্রীয় মস্তিষ্কে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কল্পনা সৃষ্টি করে এই বক্তব্য ঢেলে দেয়া হয় যে, সালাহুদ্দীন আইউবী সিপাহীর পিতা ও দাদার ঘাতক এবং তিনি তাদের সিংহাসন দখল করে আছেন। সিপাহীকে একটি রূপসী মেয়ে দেখানো হয় এবং তারপর দেখানো হয়, সুলতান আইউবী মেয়েটিকে পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করে রেখেছেন। চারদিন পর তাকে সেই অবস্থায়ই দুর্গ থেকে বের করে দেয়া হয়। সে ডিউটিতে চলে যায় আর সুযোগ পাওয়া মাত্র সুলতান আইউবীর উপর হামলা করে বসে।

✿ ✿ ✿

সিপাহী অচেতন হয়ে পড়ে আছে। হাকীম তার মস্তিষ্ক থেকে নেশার ক্রিয়া দূর করার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করেন। লোকটি বাস্তবতা ও কল্পনার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। হাকীম তার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য একাধিক পন্থা অবলম্বন করেন।

দু'দিন পর সিপাহী চোখ খুলে। সে এমনভাবে উঠে বসে, যেন এতক্ষণ

গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে ছিল এবং স্বপ্ন দেখছিল। উঠে বসেই বিস্মিত চোখে চারদিক তাকাতে শুরু করে। ডাক্তার জিজ্ঞেস করে, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? সে জবাব দেয়, ঘুমিয়ে ছিলাম। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে তার অনেক সময় কেটে যায়। কিন্তু তেমন কিছু বলতে পারল না। সে বলল, চোগা পরিহিত কালো দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তি তাকে সর্পকেল্লায় নিয়ে গিয়েছিল। সে সেখানকার কিছু ঘটনাও শোনায়। কিন্তু তখ্‌তে সুলায়মানী ইত্যাদি যে দেখেছিল, তা তার মনে নেই। তার একথাও স্মরণ নেই যে, সে সুলতান আইউবীর উপর হামলা করেছিল।

সিপাহী অসত্য বলে ধোঁকা দিচ্ছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকে সুলতান আইউবীর নিকট নিয়ে যাওয়া হল। সে একজন সৈনিকের ন্যায় সুলতানকে সালাম করে। সুলতান তার সঙ্গে স্নেহসুলভ কথা বলেন। কিন্তু সিপাহীর মনে রাজ্যের বিস্ময়, এদের কী হয়ে গেল, এরা আমার সঙ্গে এমন আচরণ করছে কেন! শেষ পর্যন্ত তাকে তার কৃতকার্য সম্পর্কে অবহিত করা হল। শুনে সে চিৎকার করে ওঠে– 'মিথ্যা কথা, আমি আমার সুলতানের উপর হামলা করতে পারি না। সুলতান আইউবী বললেন, 'আমার এই সিপাহী নিরপরাধ। এ কী কাজ করেছে, তা তাকে স্মরণ করানোরও প্রয়োজন নেই।'

ক্রুশের ছায়াতলে

সুলতান আইউবী জরুরী বৈঠক তলব করেছেন। বৈঠকে অন্যদের সঙ্গে দামেস্কের আমীর একং সেনা কর্মকর্তাগণও উপস্থিত। কারো মন-মেজাজই ভালো নয়। শত্রুরা সুলতান আইউবীর নিবেদিতপ্রাণ একজন রক্ষীসেনাকে দিয়ে তাঁর উপর সংহারী আক্রমণ চালিয়েছে ভেবে আইউবীর সামরিক কর্মকর্তাগণ হতবাক। আল্লাহর মেহেরবানী, সুলতান এবারও রক্ষা পেয়ে গেছেন!

বৈঠকে উপস্থিত সবাই ক্ষুদ্ধ-ক্রুদ্ধ। তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আস-সালেহ ও আমীর-উজীরদের থেকে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। তাদের ধারণা, সুলতান তাদেরকে হামলা সম্পর্কে আলোচনা করতে ডেকেছেন।

সুলতান আইউবীর বক্তব্য শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা গর্জে ওঠলেন। তারা শত্রু থেকে প্রতিশোধ নেয়ার পক্ষে কথা বলতে শুরু করেন। সুতলান আইউবী ঠাণ্ডা মাথায় মুখে মুচকি হাসির রেখা টেনে বললেন– 'উত্তেজনা, ক্রোধ ও আবেগ পরিহার কর। দুশমন তোমাদেরকে উত্তেজিত করে এমন তৎপরতায় জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করতে চায়, যা তোমাদের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনতে পারে। আমার গোটা পরিকল্পনাই এক ধরনের প্রতিশোধমূলক তৎপরতা। কিন্তু এ প্রতিশোধ ব্যক্তির জন্য নয়– দ্বীনের জন্য। আমার জীবন, আমার ব্যক্তিস্বত্ত্বা, তোমাদের জীবন ও ব্যক্তিস্বত্ত্বার গুরুত্ব এর বেশী নয় যে, আমরা ইসলামী দুনিয়ার মোহাফেজ। ইসলামের ও ইসলামী ভূখণ্ডের জন্য আমাদেরকে জীবন দিতে হবে। আমরা যুদ্ধের ময়দানে মারা যেতে পারি। প্রতারিত হয়ে শত্রুর হাতেও প্রাণ হারাতে পারি। শাসক আর মুজাহিদদের মধ্যে এই পার্থক্য। শাসক হেফাজত করে নিজেকে আর ক্ষমতাকে। কিন্তু মুজাহিদ দেশ, জাতি ও দ্বীনের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়। আস-সালেহ ও তার আমীর-উজীরগণ তাদের রাজত্বের হেফাজত করছে। তাদের পরাজয় অবধারিত।'

সুলতান আইউবী গোয়েন্দা উপপ্রধান হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে বললেন– "দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মালিকানাবিহীন যেসব পরিত্যক্ত প্রাসাদ আছে, সেগুলো গুড়িয়ে দাও।' তিনি এই নির্দেশও জারি করেন যে, 'দেশের মসজিদগুলোর ইমামদেরকে বলে দাও, যেন তারা এই মর্মে বয়ান করেন যে,

দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের মালিক আল্লাহ এবং গায়েবের অবস্থা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর ও বান্দার মাঝে যোগাযোগের মাধ্যমে হতে পারে না। আল্লাহ সরাসরি যে কারো কথা শুনেন। কোন মানুষের সামনে সেজদাবনত হওয়া মস্তবড় পাপ। তোমরা দেশবাসীকে ভিত্তিহীন বিশ্বাস ও কল্পনাবিলাস থেকে রক্ষা কর।'

সুলতান আরো বললেন, 'তোমরা সৈনিকদেরকে বুঝাও, যুদ্ধের ময়দানে যেমন তোমরা নিজেদের দেহকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে থাক, তেমনি বিশ্বাস ও মনন-মানসকেও দুশমনের হামলা থেকে রক্ষা করে চল। আর এই আক্রমণ তরবারীর নয়– মুখের আক্রমণ। দেহের জখম একদিন ভাল হয়ে যায়, দেহ আহত হয়েও লড়াই করে থাকে। কিন্তু মানুষের বিশ্বাস, মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তাধারা আহত হয়ে পড়লে দেহ বেকার হয়ে যায়। তোমরা নেশার ক্রিয়া তো দেখেছ। নেশাগ্রস্ত হয়ে আমার একজন দেহরক্ষী আমারই উপর হামলা করে বসেছে! কিন্তু পরে যখন তার মস্তিষ্ক থেকে নেশা দূর হয়ে গেল, তখন আর সে স্বীকারই করল না যে, সে আমার উপর হামলা করেছে। এই নেশার মধ্যে একটি রূপসী নারীর নেশাও ছিল। তোমরা মানুষের মধ্যে দায়িত্বশীলতা এবং ইসলাম ও মুসলমানের মর্যাদার অনুভূতি জাগ্রত কর। তাদের মধ্যে নাগরিক কর্তব্যবোধ ও জাতীয় মর্যাদার নেশা সৃষ্টি কর। দেশ ও জাতির মর্যাদার অনুভূতি এবং এই মর্যাদার সংরক্ষণ তাদের ঈমানের অংশে পরিণত কর। তাহলে অন্য কোন নেশা তাদেরকে ঘায়েল করতে পারবে না।'

সুলতান আইউবী আক্রমণের যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন, তাতে দুর্গের পর দুর্গ জয় করে সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। হেম্‌স, হামাত ও হাল্‌বের দুর্গ হল সবচে' শক্ত ও প্রসিদ্ধ। হাল্‌বের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও অত্যন্ত শক্তিশালী। হাল্‌ব দুর্গ এই শহর থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত। এগুলো ছাড়াও আরো কয়েকটি দুর্গ আছে, যেগুলোর অধিকাংশ পাহাড়ী ও দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। সবচে' বড় সমস্যা হচ্ছে ঐসব এলাকার শীত। শীতের সঙ্গে বরফপাত যোগ হয়ে এক অসহনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে। এ কারণে ঐসব এলাকায় শীত মওসুমে কখনো যুদ্ধ হয়নি। তাই বিরুদ্ধবাদীরা তাদের বাহিনীকে দুর্গে ঢুকিয়ে রেখেছে। এই সময়ে কেউ হামলা করতে পারে, তা তাদের কল্পনার বাইরে। তাদের খৃস্টান উপদেষ্টারাও তাদেরকে এই পরামর্শই প্রদান করেছে। অপরদিকে সুলতান আইউবী এই শীতের মওসুমেই লড়াই করার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। গোয়েন্দারা তাঁকে একের পর এক সংবাদ পৌঁছাচ্ছে।

সুলতান আইউবী গোয়েন্দা মারফত জানতে পারেন যে, হাল্‌বের মসজিদগুলোর ইমাম ও খতীবরা জনগণকে বুঝাবার চেষ্টা করছে , সালাহুদ্দীন আইউবী একজন পাপিষ্ট মানুষ। তিনি রাজত্বের লোভে ও সামরিক শক্তির দাপটে খুতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দিয়েছেন। তারা সুলতান আইউবীকে বিলাসপ্রিয় ও চরিত্রহীন মানুষ হিসেবে অভিহিত করছেন। তারা বলছেন, জুমার খুতবায় খলীফার নাম উল্লেখ করা না হলে খুতবা পরিপূর্ণ হয় না। আর অসম্পূর্ণ খুতবায় গুনাহ হয়। সরাইখানা, হাট-বাজর এবং রাস্তাঘাটেও মানুষ বলাবলি করছে যে, সালাহুদ্দীন আইউবী একজন চরিত্রহীন মানুষ, নামের মুসলমান। সেই সঙ্গে লোকদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্যও উত্তেজিত করা হচ্ছে।

আস-সালেহ'র সৈন্য কম। তার অর্ধেক সৈন্য সেনাপতি তাওফীক জাওয়াদের নেতৃত্বে সুলতান আইউবীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তাই তার স্বার্থপূজারী মুসলিম আমীর ও শাসকমণ্ডলী এভাবে জনসাধারণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছে। খৃস্টানরা তাদের মদদ যোগাচ্ছে।

গোয়েন্দারা সুলতান আইউবীকে তথ্য প্রদান করে যে, হাল্‌বে জনসাধারণ সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। সব মানুষ যুদ্ধের জন্য উন্মাদ ও উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে। তবে বয়সী মুসলমানরা খুবই অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে এবং বলছে, এটা কেয়ামতের লক্ষণ যে, মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ হবে। কিন্তু তাদের আওয়াজ আইউবী বিরোধী লোকদের ধ্বনি ও অপবাদ প্রচারণার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রবীণদের এই আওয়াজ ছিল খৃস্টানদের বিপক্ষে। তারা তাকে স্তব্ধ করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বস্তুত আইউবী বিরোধী মুসলমানদের পুরো কার্যক্রমই খৃস্টানদের পরিকল্পনা। যেসব ইমাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে মুসলমানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে প্রস্তুত নন, তাদেরকে অপসারণ করে অন্য ইমাম নিয়োগ দেয়া হয়।

উপযুক্ত বিনিময় হাতে নিয়ে ত্রিপোলীর খৃস্টান সম্রাট রেমন্ড তার কয়েকজন সামরিক কমান্ডারকে উপদেষ্টা হিসেবে হাল্‌ব প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে একজন বিশেষ গোয়েন্দা কর্মকর্তাও ছিলেন, যিনি নাশকতা পরিচালানায় বেশ দক্ষ।

পদচ্যুৎ খলীফা আল-সালেহ বিলম্ব না করে তাকে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে দেন। সৈন্যরা বিভিন্ন দুর্গে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। মসুলের গবর্নর সাইফুদ্দীন, গবর্নর পদমর্যাদায় ভূষিত গোমস্তগীন নামক এক কেল্লাদার, সুলতান আস- মালিকুস সালিহ ও ইয়াজ্জুদ্দীন বাহিনীর কমান্ডারদের

অন্যতম। রেমন্ড তাদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মিশর থেকে সালাহুদ্দীন আইউবী এবং যে রসদ ও ফোর্স আসবে, তিনি তাদেরকে প্রতিহত করবেন এবং আইউবী যেখানেই অবরোধ আরোপ করবেন, সেখানেই খৃস্টান বাহিনী বাহির থেকে হামলা করে অবরোধ ভেঙ্গে ফেলবে।

❁ ❁ ❁

দামেস্কে সুলতান আইউবী দুই-তিন দিন পরপর কমান্ডারদের নিয়ে বৈঠক করছেন। সামরিক প্রশিক্ষণ নিজেও পর্যবেক্ষণ করছেন এবং কমান্ডারদের থেকেও রিপোর্ট গ্রহণ করছেন। রাতের বেলা উদোম শরীরে প্রশিক্ষণ দিয়ে তিনি তার বাহিনীকে হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছেন। আশপাশে অনেক টিলা আছে। তিনি মরুভূমিতে চলাচলে অভ্যস্ত ঘোড়াগুলোকে টিলায়-পাহাড়ে উঠানামা করার অভ্যাস গড়ে তুলেছেন।

ওদিকে হাল্‌বেও দু'-তিনটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেখানকার কমান্ডাররা সংবাদ পেয়েছে যে, সুলতান আইউবী রাতের বেলা তার বাহিনীকে সামরিক মহড়া করাচ্ছেন। কিন্তু এ বিষয়টাকে তারা কোন গুরুত্ব দেয়নি। বলছে, আইউবীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে; আমাদের মুখোমুখি হলে সে হামলা করার স্বাদ বুঝতে পারবে। সেই কমান্ডারদের একজনও ইন্টেলিজেন্স বিষয়ে অভিজ্ঞ নয়। খৃস্টানরা দামেস্কে তাদের গোয়েন্দা পাঠিয়ে রেখেছিল। শেখ সান্নানের ঘাতক ও নাশকতাকারী দলটিও তাদের। খৃস্টান সম্রাট রেমন্ডও তার একজন বিশেষ দূত প্রেরণ করেছেন দামেস্কে। সুলতান আইউবী কেন রাতের বেলা সামরিক মহড়া করাচ্ছেন, তার রহস্য উদ্‌ঘাটনে আত্মনিয়োগ করে রেমন্ড-এর বিশেষ গোয়েন্দা। হাল্‌বে কমান্ডারদের কনফারেন্সে বিষয়টি এখনো উত্থাপন করেনি সে। ঘটনার রহস্য এখনো তার জানা হয়নি।

সুলতান আইউবী হাল্‌ব ও মসুল ইত্যাদি এলাকায় গোয়েন্দা জাল বিছিয়ে রেখেছেন। তাঁর গোয়েন্দা তৎপরতা নিয়ন্ত্রিত হয় হাল্‌ব থেকে। দলনেতা একজন বিজ্ঞ আলিমের বেশে হাল্‌বে অবস্থান করছেন এবং গোয়েন্দাদের থেকে তথ্য গ্রহণ করে দামেস্ক পৌঁছাবার ব্যবস্থা করছেন। তিনি তার গোয়েন্দাদের নিরাপত্তা বিধান ও বিপদ দেখা দিলে তাদেরকে লুকিয়ে ফেলার বন্দোবস্তও করে রেখেছেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে গাল-মন্দ এবং সমালোচনা করার কাজে তিনি সকলের বাড়া। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আমীর-উজীর এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। তার গোয়েন্দা সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ সবক'টি স্থানেই অবস্থান নিয়ে আছে। আল-মালিকুস

সালেহ'র মহলের বডিগার্ডের মধ্যেও তার গোয়েন্দা রয়েছে। দু'জন গোয়েন্দা বিশেষ প্রহরীর পদ নিয়ে খলীফার কেন্দ্রীয় কমান্ডের সেই প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যেখানে তাদের যুদ্ধ বিষয়ে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। খৃস্টান গোয়েন্দাদের কমান্ডার এসেই সর্বপ্রথম দামেস্কে তাদের গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে সংহত ও কার্যকর করা এবং হাল্‌বে সুলতান আইউবীর যেসব গোয়েন্দা রয়েছে, তাদের সন্ধান বের করার কাজে আত্মনিয়োগ করে।

❁ ❁ ❁

সুলতান আইউবী যে দু'জন গুপ্তচর হাল্‌বে হাইকমান্ডের প্রহরীদের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল, তাদের একজনের নাম খলীল।

একটি ভবনের কতগুলো কক্ষ। তার একটি হলরুম। এখানে ভোজসভা, নাচ-গানের আসর ও দরবার অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত সাজানো-গোছানো একটি কক্ষ। হাল্‌বে আমীর-উজীরদের খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের পর এখন কক্ষটি আরো পরিপাটি, আরো সুসজ্জিত। অপরূপ সুন্দরী ও অভিজ্ঞ যুবতী মেয়েরা এখানে নাচ-গান করে। এখন কয়েকটি খৃস্টান মেয়েও এসে যোগ দিয়েছে এখানে। এরা সুশিক্ষিত পেশাদার মেয়ে। খলীফা আস-সালিহ'র আমীর-উজীরগণ এদের আঙ্গুলের ইশারায় ওঠ্-বস করে। এদের আসল কর্তব্য, আস-সালিহ'র বিশিষ্ট দরবারী আমীর ও সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কমান্ডারদের উপর নজর রাখা এবং অনুধাবন করা যে, তাদের মধ্যে সুলতান আইউবীর অনুগত কেউ আছে কিনা। তাছাড়া খলীফার পদস্থ কর্মকর্তাদের মনে খৃস্টান-প্রীতি ও ক্রুশের অনুগত্য সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালানোও তাদের অন্যতম দায়িত্ব।

মাঝে-মধ্যে ভোজের আয়োজন হয় হলটিতে। তখন নাচ-গানের আসর বসানো হয়। উজাড় হয় হাড়ি হাড়ি মদ। সব শেষে অপকর্মের চরমে পৌঁছে যায় মজলিস। কখনো কখনো সামরিক বিষয়ে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এখানে।

রক্ষীবাহিনীর দু'জন প্রহরী কোমরে তরবারী ও হাতে বর্শা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সবসময়। তিন-চার ঘন্টা পরপর প্রহরী বদল হয়।

খলীল সুলতান আইউবীর গুপ্তচর। আইউবীর আরেক গোয়েন্দা তার সহকর্মী। দু'জনের ডিউটি পড়ে একসঙ্গে। তারা এখান থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে। অনেক তথ্য দমেস্কে পৌঁছিয়েও দিয়েছে।

একদিন সন্ধ্যা বেলা। নতুন এক নর্তকীর আগমন ঘটে হলে। আজ ভোজসভার আয়োজন আছে। মেহমানরাও আসছেন। নর্তকী-গায়িকা এবং অন্যান্য মেয়েরাও আসছে। খলীল ও তার সঙ্গী তাদের সবাইকে চিনে। দূর-

দূরান্তের কেল্লাদারগণও এসেছেন। এক ব্যক্তি এসেছে নতুন। ইনি রেমন্ড-এর প্রেরিত গোয়েন্দাদের কমান্ডার। তার পরিচয়টা জেনে নেয় খলীল। এবার লোকটার তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করতে হবে খলীলকে।

তাকে ছাড়া আরো একটি নতুন মুখ দেখতে পায় খলীল। এই মুখ একটি মেয়ের। খলীল মেয়েটিকে আজ তিন-চার দিন ধরে দেখছে। নতুন আসা মেয়ে।

একদিন ডিউটি শেষ করে সঙ্গীসহ কর্মস্থল ত্যাগ করছে খলীল। হঠাৎ মেয়েটা এসে সামনে দাঁড়ায়। খলীল উঠে থমকে দাঁড়ায়। অপলক জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় তার প্রতি। মেয়েটাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে খলীলের। কে এই মেয়েটা? খলীলের মনে কৌতূহল। আবার ভাবে, না পরিচিত কেউ নয়। মানুষের চোহারায় চোহরায় মিল থাকে। খলীল দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। কিন্তু মেয়েটা তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং তাকাতে তাকাতে সামনের দিকে চলে যায়। খলীল ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটার প্রতি তাকায়। মেয়েটাও তাকায় তার প্রতি।

পরদিনও এমনি ঘটনা ঘটে। তার আগেই খলীল মেয়েটার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়। জানতে পারে, মেয়েটা নর্তকী।

মেয়েটা দেখতে যেন রাজকন্যা। খলীল একজন সাধারণ সিপাহী। এমন একটি মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক জমতে পারে না। রাজকন্যারূপী নর্তকীরা তো আমীরদের সম্পদ। কিন্তু এই মেয়েটাকে দেখে খলীলের অন্য একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে গেছে– যাকে দেখতে ঠিক এই মেয়েটিরই ন্যায়।

❁ ❁ ❁

এগার-বার বছর আগের কথা। খলীল তখন আঠার বছরের যুবক। দামেস্কের সামান্য দূরে এক গ্রামে বাস করত এবং পিতার সঙ্গে ক্ষেতে-খামারে কাজ করত। হাসি-খুশি স্বভাবের মানুষ খলীল। উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন মেধাবী ছেলে। পাড়ার শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের কাছেই প্রিয়।

তখন হিজরতের পালা চলছিল। খৃস্টানদের দখল করা এলাকাসমূহ থেকে মুসলমান পরিবারগুলো খৃস্টানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলিমশাসিত এলাকায় চলে যাচ্ছিল। স্থানীয় লোকেরা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করত এবং তাদের বসবাস করার সুযোগ করে দিত।

এমনি একটি পরিবার কোথা থেকে হিজরত করে খলীলদের গ্রামে চলে আসে। সেই পরিবারের একটি মেয়ের নাম হুমায়রা। তখন তার বয়স ছিল এগার কি বার বছর। অত্যন্ত সুন্দরী ও ফুটফুটে একটি মেয়ে।

গ্রামবাসীরা এই পরিবারটিকে সাদরে বরণ করে নেয় এবং মাথা গোজার ঠাঁই

করে দিয়ে চাষাবাদ করে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহের জন্য জমি-জিরাত দান করে। হুমায়রার ভাই-বোন সবাই ছোট। সংসারে কর্মক্ষম লোক একমাত্র পিতা। খলীল এই অসহায় পরিবারটির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। খলীলের কথাবার্তা ভাল লাগে হুমায়রার কাছে। হুমায়রাকেও ভাল লাগে খলীলের। হুমায়রা খলীলের ঘরে আসা-যাওয়া করতে শুরু করে। সুযোগ পেলেই খলীলের কাছে গল্প শুনে হুমায়রা। হুমায়রাকে শুনানোর জন্য মজার মজার গল্প বানিয়ে নিয়েছে খলীল। ভাব গড়ে ওঠে দু'জনের মাঝে।

এভাবে মাস চারেক সময় কেটে যায়। ক্ষেত-খামারে কাজ করা তখন আর ভাল লাগছে না হুমায়রার পিতার। দামেস্ক শহরটা সেখান থেকে নিকটে। হুমায়রার পিতা সকালে শহরে চলে যান এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসেন। এভাবে কেটে যায় এক বছর। হুমায়রার পিতাকে কিছু করতে দেখছে না কেউ। কিন্তু সংসার চলছে বেশ ভালভাবেই।

খলীলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে হুমায়রা। তাকে ছাড়া একদণ্ডও ভাল লাগে না মেয়েটার। সবসময় খলীলের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চায় সে। খলীল ক্ষেতে গেলে হুমায়রাও চলে যায় সেখানে।

হুমায়রার বয়স এখন তের বছর। ভাল-মন্দ বুঝতে শুরু করেছে। প্রেম-ভালবাসা, মন দেয়া, মন নেয়া এসব এখন হুমায়রার অবোধ্য নয়।

একদিন খলীল হুমায়রাকে জিজ্ঞেস করে– 'আচ্ছা, তোমার আব্বা এখন কী কাজ করেন?'

হুমায়রা উত্তর দেয়– 'আমি জানি না। আমি শুধু এটুকু জানি যে, আমার বাবা ভাল মানুষ নন। তিনি শহর থেকে যখন আসেন, নেশা করে আসেন।'

হুমায়রা খলীলকে আরো নতুন একটি তথ্য প্রদান করে– 'ইনি আমার পিতা নন। আমার মা-বাপ দু'জনই মারা গেছেন। আমার বয়স যখন পাঁচ-ছয় বছর, তখন ইনি আমার ভার নেন এবং আমাকে তার ঘরে নিয়ে লালন-পালন করেন। পরে আমি তাকেই পিতা ডাকতে শুরু করি। আমাকে তিনি আপন মেয়ের মত আদর করেন এবং নিজের মেয়ের মতই আচরণ করেন। কিন্তু মানুষটা ভাল নন।'

এভাবে কেটে গেছে দু'টি বছর। খলীলের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে হুমায়রা। হুমায়রা এখন পরিপূর্ণ যুবতী। হৃদয়কাড়া সুশ্রী মুখাবয়ব। যৌবন-রসে টইটুম্বর ও নজরকাড়া দেহ।

একদিন খলীলের নিকট গিয়ে হাজির হয় হুমায়রা। মুখে অস্থিরতা ও

মলিনতার ছাপ। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে কথা বলে খলীলের সঙ্গে– 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, বাবা বিয়ের নামে আমাকে এক অপরিচিত ব্যক্তির হাতে তুলে দিতে চাচ্ছেন। বাবার সঙ্গে একজন লোক এসেছিল। তিনি লোকটাকে অনেক খাতির-যত্ন করলেন এবং কিছুক্ষণ পর আমাকে ডেকে তার কাছে নিয়ে বসালেন। লোকটা আমাকে খুব নীরিক্ষন করে দেখল। আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে কেন ডাকলেন বাবা? জবাবে তিনি আমতা আমতা করে যা বলতে চাইলেন, তাতেই আমার মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি হয়।' হুমায়রা খলীলকে বলল, 'আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চাই না।'

খলীল বলল– 'ঠিক আছে, আমি আমার আব্বা-আম্মার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।'

হুমায়রা যে লোকটাকে পিতা বলে ডাকে, সে তার পিতা নয়। কাজেই হুমায়রার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার কোন ভাবনা নেই। সে যুগে মেয়েদের কোন মর্যাদা ছিল না। অর্থের বিনিময়ে মেয়েদেরকে অন্যের হাতে তুলে দেয়ার প্রচলন ছিল। শাসক ও ধনবান লোকেরা হেরেম বানিয়ে রেখেছিল। তারা নিত্যনতুন সুন্দরী যুবতী মেয়েদের ক্রয় করত। হুমায়রাকে যদি তার পিতা বিক্রি করার পরিকল্পনা করেও থাকে, সে সমাজের রীতি অনুযায়ী তা অপরাধ ছিল না।

খলীল ধনবান পিতা-মাতার সন্তান নয়। হুমায়রাকে নিয়ে পালিয়ে কোথাও আত্মগোপন করা অপেক্ষা বেশী কিছু করার সুযোগ তার নেই। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কী করবে খলীল? ভাবনায় পড়ে যায় সে। হুমায়রার প্রতি তার ভালবাসা এতই গভীর যে, বিষয়টা উপেক্ষাও করতে পারছে না খলীল।

খলীলের ভাবতে ভাবতে কেটে যায় অনেক সময়– দু'দিন। তৃতীয় দিনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারল না সে।

খলীল ক্ষেতে গিয়ে কাজে লেগে যায়। এমন সময় একদিক থেকে নারী কণ্ঠের চিৎকার ভেসে আসে তার কানে। একটি মেয়ে যেন তাকেই ডাকতে ডাকতে দৌড়ে আসছে। খলীল হঠাৎ চমকে উঠে মাথা তুলে তাকায়। হুমায়রা। হুমায়রা-ই তাকে ডাকতে ডাকতে তার দিকে পাগলিনীর ন্যায় ছুটে আসছে। পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে তিনজন লোক। তাদের একজন হুমায়রার পিতা। অপর দু'জনকে চিনে না খলীল।

হুমায়রার চিৎকার শুনে পাড়ার অনেক মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। কিন্তু তারা সবাই তামাশা দেখছে শুধু। তারা এই ভেবে হুমায়রার সাহায্যে এগিয়ে আসছে না যে, পেছনের লোকগুলোর মধ্যে হুমায়রার পিতাও আছেন।

খলীল হুমায়রার দিকে এগিয়ে যায়। হুমায়রা কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানায়, এরা আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে। বাবা আমাকে এদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। হুমায়রার পিতা হুমায়রাকে খলীলের সম্মুখ থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। খলীল তাকে ধমক দেয়– 'খবরদার! এর গায়ে হাত দেবেন না। আগে আমার সঙ্গে কথা বলুন।'

'এ আমার কন্যা'– হুমায়রার পিতা বলল– 'তুমি কে আমাকে ঠেকাবার?'

'এ আপনার কন্যা নয়'– খলীল বলল– 'আমি সব জানি।'

অপর দু'জন হুমায়রার দিকে এগিয়ে আসে। একজন হাতে তরবারী তুলে নেয়। খলীলের হাতে কোদাল। সেটি দ্বারা লোকটার মাথায় আঘাত করে সে। লোকটার হাত থেকে তরবারীটা পড়ে যায়। পরক্ষণেই রক্তাক্ত মাথায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে লোকটি। খলীল তরবারীটা হাতে তুলে নেয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতেও তরবারী। খলীল তরবারী চালনা ও তরবারী আঘাত প্রতিহত করার কলা-কৌশল জানে না। তারপরও লোকটার দু'-একটা আঘাত প্রতিহত করে সে। কিন্তু বেশীক্ষণ টিকতে পারল না খলীল। ভারী কি একটা বস্তু আঘাত হানে তার মাথায়। হঠাৎ দু'চোখের সামনের সব অন্ধকার হয়ে যায়। খলীল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

খলীলের যখন জ্ঞান ফিরে, তখন সে নিজের ঘরে। হঠাৎ ধড়মড় করে শোয়া থেকে উঠে বসে সে। চোখে মুখে প্রচন্ড ক্রোধ। তার পিতা ও দু'-তিনজন লোক এগিয়ে এসে তাকে ধরে ফেলে শান্ত করার চেষ্টা করে– 'তুমি অনেকক্ষণ যাবত অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলে। এইমাত্র তোমার জ্ঞান ফিরেছে। শুয়ে থাক। হুমায়রা এই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। তাকে নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না।'

খলীল চিৎকার করে ওঠে– 'লোকটা মেয়েটাকে বিক্রি করে ফেলেছে! আহ! আমি বুঝি হুমায়রাকে হারিয়ে ফেললাম। খলীলকে বুঝানো হল, হুমায়রাকে যথারীতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়েই বিদায় করা হয়েছে।'

খলীলের মাথার অবস্থা ভাল নয়। বসার চেষ্টা করলেই মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। বড়রা তাকে উপদেশ দেন, হুমায়রাকে নিয়ে ভাবা তোমার পক্ষে ঠিক হবে না। ও এখন অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী।

খলীল সুস্থ্য হয়ে যখন বাইরে বের হয়, ততক্ষণে হুমায়রার পিতা পরিবারসহ এলাকা ত্যাগ করে চলে গেছে।

❁ ❁ ❁

হুমায়রাকে হারিয়ে পাগলের মত হয়ে গেছে খলীল। মেয়েটির ভালবাসা আর

তার মুখডাকা পিতার প্রতিশোধস্পৃহা অস্থির করে তুলেছে তাকে। কাজ-কর্মে মন বসছে না তার। মাঝে-মধ্যে দামেস্ক গিয়ে হুমায়রার পিতাকে খুঁজে বেড়ায় খলীল। তার পিতা-মাতা তাকে অনেক ভাল ভাল মেয়ে দেখায়; কিন্তু কাউকেই পছন্দ হচ্ছে না তার। তার মন-মস্তিষ্কে চেপে বসে আছে হুমায়রা।

এক-দেড় বছর পর্যন্ত এভাবেই সময় কাটে খলীলের। একদিন দামেস্কে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে জানতে পারে, সেনাবাহিনীতে লোক নেয়া হচ্ছে। খলীল সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে যায়।

খলীলকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অশ্বচালনা, তীরন্দাজি ও অন্যান্য অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ নেয়। একটা ব্যস্ততা পেয়ে যায় খলীল। এবার হুমায়রার ভাবনা ধীরে ধীরে কেটে যেতে শুরু করে তার মাথা থেকে। স্বাভাবিক জীবন ফিরে পায় সে। খলীল পুনরায় একজন কর্মতৎপর যুবকে পরিণত হয়।

এ সেই সময়কার কথা, যখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। মানুষ তখনো শুধু নুরুদ্দীন জঙ্গীকেই চিনে। সুলতান আইউবী এ পর্যন্ত একবার রণাঙ্গনে হাজির হয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করতে পেরেছেন মাত্র। সেটি ছিল এক রক্ষক্ষয়ী লড়াই। তিনি এই প্রথমবার দুশমনকে চোখে দেখেছেন। তিনি খৃস্টানদের নির্যাতনের শিকার লুণ্ঠিত একটি পরিবারের করুণ দৃশ্য দেখলেন। তিনি জানতে পারলেন, খৃস্টানরা বহু মুসলিম যুবতী মেয়েকে তাদের হাতে কব্জা করে রেখেছে। এসব দেখে-শুনে তার ভেতরে জাতীয় চেতনা ও ইসলামী মূল্যবোধ জেগে উঠে। সেই চেতনা ও বোধ-বিশ্বাস তাঁকে সেই সৈনিকদের সারিতে নিয়ে দাঁড় করায়, যারা বেতন-ভাতা ও গনীমতের জন্য নয়– আল্লাহর নামে লড়াই করে ও জীবন কুরবান করে।

তিন-চার বছর পর সালাহুদ্দীন আইউবীকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করে কায়রো প্রেরণ করা হয়। খৃস্টানরা সুদানীদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে সমুদ্রের দিক থেকে মিসরের উপর হামলা চালালে সুলতান আইউবী নুরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। নুরুদ্দীন জঙ্গী তাঁর একটি বিশেষ বাহিনীকে কায়রো পাঠিয়ে দেন। খলীল ছিল সেই বাহিনীর একজন সদস্য। খলীল সেই বিচক্ষণ সৈনিকদের একজন, যারা তরবারীর পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগায়। তাকে পঞ্চাশ সদস্যের এক বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। মিশরে আসার পর তার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা পুরোপুরি জাগ্রত হয়ে ওঠে। গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবীর পরামর্শে খলীলকে তাঁর যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তাকে একাধিকবার কমান্ডো ও গেরিলা

অভিযানে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তাকে দেশের বাইরে কখনো পাঠান হয়নি। তাকে দেশের অভ্যন্তরে শত্রু-চরদের তথ্য সংগ্রহ, পশ্চাদ্ধাবন ও গ্রেফতার করার কাজে নিয়োজিত করা হয়। এ কাজে বড় দক্ষ খলীল।

এখন ১১৭৪ সাল। নুরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের পর যখন সুলতান আইউবী সাতশ' অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে দামেস্ক দখল ও আল-মালিকুস সালিহকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে রওনা হন, তখন তিনি তার গোয়েন্দা দলকে আগেই দামেস্ক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা বিভিন্ন বেশে দামেস্ক অনুপ্রবেশ করে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সুলতান আইউবী যখন দামেস্ক দখল করে ফেলেন এবং খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ও তার আমীর-উজীর-দেহরক্ষীগণ দামেস্ক ছেড়ে পালিয়ে যায়, তখন আলী বিন সুফিয়ানের নায়েব হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ– যিনি গোয়েন্দাদের সঙ্গে দামেস্ক ঢুকে গিয়েছিলেন– কয়েকজন গোয়েন্দাকে সেদিকে পাঠিয়ে দেন, যেদিকে আস-সালিহ ও তার দেহরক্ষীরা পালিয়েছিল। এই গোয়েন্দাদেরকে কতগুলো বিশেষ নির্দেশনা ও বিভিন্ন মিশন বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল। খলীল ছিল তাদের একজন। তার এক সঙ্গীও ছিল সেই দলে।

এই গোয়েন্দা দলটি যখন হাল্‌ব পৌঁছে, তখন সেখানে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। আস-সালিহ'র সাঙ্গপাঙ্গদের এই মুহূর্তে সৈন্যের প্রয়োজন। তাদের মনে প্রবল আশংকা, সুলতান আইউবী তাদের ধাওয়া করবেন এবং হামলা চালাবেন। ফলে তারা সেই অস্থির পরিস্থিতিতে যাকেই পেয়েছে, সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নিয়েছে। খলীল এবং তার সঙ্গী নিজেদেরকে দামেস্ক থেকে পালিয়ে আসা সৈনিক পরিচয় দিয়ে বাহিনীতে ঢুকে পড়ে।

সুলতান আইউবীর এই গোয়েন্দারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আস্তানা তৈরি করে নেয়।

খলীল অত্যন্ত সুশ্রী ও শক্তসামর্থ যুবক। অতিশয় বাকপটু। এই সুবাদে তাকে রাজপ্রাসাদের প্রহরী নিযুক্ত করা হয়। কৌশলে সঙ্গীকেও সাথে রাখে।

✿ ✿ ✿

দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে ব্যস্ত হয়ে পড়ে খলীল। ভুলে গেছে হুমায়রার কথা। একদিনও– একবারও তার মনে পড়ছে না ভালবাসার মানুষটির কথা। এসব ভাবনার সুযোগই পায়নি খলীল। কিন্তু এই নতুন মেয়েটি খলীলকে স্মরণ করিয়ে দিল হুমায়রার কথা।

খলীল হুমায়রাকে হারিয়েছে সাত-আট বছর হয়ে গেছে। তখন মেয়েটির বয়স ছিল ষোল বছর। মেয়েটি অত্যন্ত রূপসী। কিন্তু তার মুখাবয়বে হুমায়রার

সেই নিষ্পাপতা ও সরলতা এখন অনুপস্থিত। দু'জনের মুখোমুখি হওয়ার সময় তার পরনে ছিল সংক্ষিপ্ত পোশাক। বলা চলে অর্ধনগ্ন। কাজেই অশালীন এই মেয়েটি হুমায়রা হতে পারে না। মেয়েটা তৃতীয়বার যখন খলীলের মুখোমুখি হয়, তখন খলীল আরো নিরীক্ষা করে দেখে। মেয়েটিও তাকিয়ে থাকে খলীলের প্রতি। এবার কথা বলে মেয়েটি– 'তোমার নাম কী?'

খলীল নিজের ছদ্মনাম বলে, যে নাম এখানে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার সময় লিখিয়েছিল। তারপর প্রশ্ন করে– 'তুমি আমার নাম জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'তুমি আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখছ। তাই নামটা জিজ্ঞেস করলাম।' হুমায়রা এমনভাবে জবাব দেয়, যেন তার মধ্যে সভ্যতার লেশমাত্র নেই– 'তুমি একজন সাধারণ সৈনিক। নিজের কাজ কর; ওসব ভেবে লাভ নেই।'

আজ রাতেই ভোজসভা। রেমন্ডের গোয়েন্দা বাহিনীর কমান্ডার দিন চারেক আগে এখানে এসে পৌঁছেছে। তার নাম উইন্ডসর। তারই সম্মানে এই ভোজসভার আয়োজন। উইন্ডসর একজন অভিজ্ঞ গুপ্তচর। হাল্‌বের গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যেই তার আগমন।

সূর্য ডুবে গেছে। সাজের আঁধারে ছেয়ে গেছে চারদিক। মেহমানরা আসছেন। আয়োজন চলছে। চলছে মদপানের ধারা। প্রধান অতিথি উইন্ডসর এখনো আসেননি। খলীল ও তার সঙ্গীর ডিউটি হলরুমের দরজায়।

কিছুক্ষণ পর উইন্ডসর এসে পৌঁছান। হলরুমের দরজা পর্যন্ত এসেই থমকে দাঁড়ান তিনি। গভীর দৃষ্টিতে তাকান প্রহরীদ্বয়ের প্রতি। তারপর খলীলের চেহারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

'তুমি খলীফার রক্ষীবাহিনীতে কবে ঢুকেছ?' উইন্ডসর খলীলকে জিজ্ঞেস করেন। তার কণ্ঠে গাম্ভীর্য।

'এখানে আসার পরই আমাকে রক্ষী বাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয়'– খলীল জবাব দেয়– 'তার আগে আমি দামেস্কের সেনাবাহিনীতে ছিলাম।'

'তুমি কি মিশর গিয়েছিলে?' উইন্ডসর জিজ্ঞেস করেন।

'না।' খলীল জবাব দেয়।

উইন্ডসর খলীলকে অপর প্রহরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি একে কখন থেকে জান?'

'আমরা দু'জন দামেস্কের বাহিনীতে একসঙ্গে ছিলাম'– খলীল জবাব দেয়– 'আমরা উভয়ে উভয়কে ভালভাবেই জানি।'

'আর আমি সম্ভবত তোমাদের দু'জনকেই ভালভাবে চিনি'– উইন্ডসর মুচকি

হেসে বললেন– 'একটু আমার সঙ্গে এস।'

খলীল ও তার সঙ্গীকে প্রহরা থেকে সরিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যান উইন্ডসর। লোকটা অত্যন্ত ঘাঘু ও বিচক্ষণ গোয়েন্দা। এখানে এসে পৌঁছেই তিনি গোপনে গোপনে দেহরক্ষীদের বিশ্বস্ততা যাচাই-বাচাই শুরু করে দেন। খলীলকে দেখামাত্র তার কিছু একটা মনে পড়ে যায়। মনে সন্দেহ জেগে ওঠে। পরক্ষণে খলীলের সঙ্গীকে দেখার পর তার সন্দেহ পোক্ত হয়ে যায়।

উইন্ডসর-এর সন্দেহ অমূলক নয়। খলীল ও তার সঙ্গী তিন-চার বছর যাবত সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা বিভাগে এক সঙ্গে কাজ করেছিল।

উইন্ডসর খলীল ও তার সঙ্গীকে নিজ কক্ষে নিয়ে যান। এই ভবনেরই বড় রুমটির সামান্য দূরের রুমটিই উইন্ডসরের কক্ষ। কক্ষে প্রবেশ করে তিনি রাতের আলোতে তাদেরকে পুনরায় গভীরভাবে নিরীক্ষা করে দেখেন।

'আমাকে যদি প্রমাণ দিতে পার যে, তোমরা এখানকার অফাদার এবং সালাহুদ্দীন আইউবী তোমাদের দুশমন, তাহলে আমি তোমাদেরকে শুধু ছেড়েই দেব না, বরং এমন পদে চাকুরী দেব যে, তোমাদের ভাগ্য ফিরে যাবে।'– উইন্ডসর বললেন– 'কিন্তু মিথ্যা বললে পরে অনুতাপ করতে হবে।'

'আমরা এখানকারই অফাদার।' খলীল জবাব দেয়।

'তোমরা অফাদারী কখন থেকে পরিবর্তন করেছ?'– উইন্ডসর জিজ্ঞেস করে– 'এবং কেন করেছ?'

'আল্লাহ ও রাসূলের পরই খলীফার মর্যাদা'– খলীল বলল– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর কোন মর্যাদা নেই। তিনি খলীফা নন।'

'মিশর থেকে কবে এসেছ?' উইন্ডসর জিজ্ঞেস করেন এবং জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন, 'তোমরা বোধ হয় আমাকে চেন না। আমি তোমাদেরই ন্যায় একজন গুপ্তচর। আমি যাকে একবার দেখি, নাম ভুলে যেতে পারি– চেহারা ভুলি না। আলী বিন সুফিয়ান কোথায়? মিসরে না দামেস্কে?'

'আপনি কার কথা বলছেন? আমরা তো এই নামের কাউকে চিনি না'– খলীলের সঙ্গী বলল– 'আমরা সাধারণ সিপাহী মাত্র।'

উইন্ডসর বসা থেকে উঠে দাঁড়ান। দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে একজন চাকরকে ডাক দেন। চাকর আসলে তিনি একটি মেয়ের নাম উল্লেখ করে তাকে ডেকে আনতে বললেন।

মেয়েটি পাশেরই একটি কক্ষে ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অতিশয় রূপসী একটি মেয়ে এসে কক্ষে প্রবেশ করে। খলীল জানে, এই মেয়েটি খৃস্টান। তার

সঙ্গে সেই নর্তকীও আসে, যাকে দেখলে খলীলের হুমায়রার কথা মনে পড়ে।

উইন্ডসর খৃস্টান মেয়েটির সঙ্গে আরবীতে কথা বলেন। তাকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করেন, বাইজীটাকে সঙ্গে এনেছ কেন?

মেয়েটি জবাব দেয়, 'না, মানে ও প্রস্তুত হয়ে আমার কক্ষে এসে গিয়েছিল আর আমিও প্রস্তুত হচ্ছিলাম। এর মধ্যে আপনার ডাক পেয়ে মনে করলাম, ভোজসভায় আপনার সঙ্গে যেতে হবে তাই ডাকছেন। তাই আমি একেও সঙ্গে করে নিয়ে আসলাম।'

'ঠিক আছে, অসুবিধা নেই'– উইন্ডসর বললেন– 'এসেছে যখন তামাশা দেখতে পাবে।'

উইন্ডসর খৃস্টান মেয়েটিকে বললেন, 'আমি তোমাকে অন্য এক কাজের জন্য ডেকেছি'– তিনি প্রহরীদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে মেয়েটিকে বললেন– 'এদের প্রতি ভালভাবে তাকাও, দেখ তো কিছু মনে পড়ে কিনা?'

মেয়েটি খলীল ও তার সঙ্গীর প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা করে। মাথা তুলে আবার দু'জনের মুখাবয়বে চোখ বুলায়। এবার তার ঠোঁটে মুচকি হাসির আভা ফুটে ওঠে। সে খলীল ও তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করে– 'তোমাদের জ্ঞান ফিরে এসেছিল কখন?'

খলীল ও তার সঙ্গী পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপর মেয়েটির দিকে দৃষ্টিপাত করে। খলীল উপস্থিত জ্ঞানের অধিকারী মানুষ। সে বুঝে ফেলে, এরা আমাদের চিনে ফেলেছে। কিভাবে বাঁচা যায় পন্থা খুঁজতে শুরু করে সে। এরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয় হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে। মুহূর্তে হাবা বনে যায় খলীল, যেন সে কিছুই বুঝতে পারছে না– 'আমাদের বুঝে আসছে না, আপনারা পাহারাদারী থেকে সরিয়ে এনে আমাদের সঙ্গে কেন মস্কারা করছেন। কমান্ডার দেখে ফেললে তো আমাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

'তোমরা প্রহরী নও'– উইন্ডসর বললেন– 'তোমাদের দু'জনকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রাখার চেয়ে বরং ভাল, ওখানে কেউ না দাঁড়াক। ওখানে তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই।' তিনি খলীলের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'এখানে এসে বেশ-ভূষা পরিবর্তন করে নিলে না কেন? সালাহুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ান চরবৃত্তিতে দক্ষ বটে, কিন্তু আমরাও আনাড়ী নই। নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিও না। ভালোয় ভালোয় বলে ফেল, আমরা মিশর থেকে

আসা গুপ্তচর। তোমাদের সঙ্গে আমার ও এই মেয়েটির সাক্ষাৎ আগেও হয়েছিল। তোমরা আমাকে চিনতে পারনি। কারণ, আমি তখন ছদ্মবেশে ছিলাম। কিন্তু আমি তোমাদের চিনে ফেলেছি। কেননা, এখনও তোমরা সেই বেশেই আছ, যে বেশে আড়াই বছর আগে ওখানে ছিলে। একটু চিন্তা কর; স্মরণ এসে যাবে। তোমরা দু'জন মিশরের উত্তরে একটি কাফেলায় ঢুকে গিয়েছিলে। কাফেলাটার প্রতি তোমাদের সন্দেহ ছিল। সেই কাফেলার সঙ্গে তোমরা একটি রাতও কাটিয়েছিলে। কিন্তু তোমাদের দুর্ভাগ্য, যখন তোমরা চোখ খুললে, তখন মরুভূমিতে সংজ্ঞাহীন পড়ে ছিলে। কাফেলা ততক্ষণে বহুদূরে চলে গিয়েছিল।'

খলীল ও তার সঙ্গীকে পরিচয়ের সূত্রটা স্মরণ করিয়ে দেন উইন্ডসর।

✿ ✿ ✿

আড়াই থেকে তিন বছর আগের কথা। খলীল ও তার সঙ্গী তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল। সুদানীরা সুলতান আইউবীর হাতে পরাজয়বরণ করেছিল ঠিক, কিন্তু খৃস্টানদের সহযোগিতায় মিশর আক্রমণ পরিকল্পনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তারা। মিসরের অভ্যন্তরে খৃস্টান গুপ্তচর ও নাশকতাকারীরা তৎপর। তাদেরই খুঁজে বের করার জন্য আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগ কাজ করছিল। সীমান্তে টহল বাহিনী নিয়োজিত ছিল। মিসরের গোয়েন্দারা মুসাফির ইত্যাদির বেশে সীমান্ত এলাকাগুলোতে ঘোরাফেরা করছিল।

একদিন খলীল ও তার এই সঙ্গী মিশরের উত্তরাঞ্চলীয় এক এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। দু'জনই উটের উপর সওয়ার। দীনহীন মরু মুসাফিরের বেশ তাদের। এমন সময়ে তারা একটি কাফেলা দেখতে পায়, যাতে অনেকগুলো উট ও দু'টি ঘোড়া ছিল। কাফেলায় যুবক-বৃদ্ধ-নারী–শিশু সব বয়সের লোকই ছিল।

খলীল ও তার সঙ্গী গোয়েন্দা। তারা কাফেলা থামিয়ে তদন্ত করতে পারে না। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা গমনাগমনকারী কাফেলার প্রতি নজর রাখবে এবং সামান্যতম সন্দেহ হলে নিকটবর্তী সীমান্ত চৌকিতে সংবাদ দেবে। বাহিনী সামরিক শক্তির বলে এ কাজ আঞ্জাম দেবে। এতো বিপুলসংখ্যক লোকের কাফেলার গতিরোধ করে তল্লাশি চালানো দু'জন গোয়েন্দার পক্ষে সম্ভব নয়।

খলীল ও তার সঙ্গী কাফেলার সঙ্গে এসে ভীড়ে। পরিচয় দেয়, আমরা মুসাফির এবং সামনে যাব। কাফেলার লোকেরা খলীল ও তার সঙ্গীকে তাদের দলে নিয়ে নেয়।

খলীল ও তার সঙ্গী গল্প-গুজব ও কথোপকথনের মধ্যদিয়ে জানার চেষ্টা করে, কাফেলা কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাচ্ছে। সামনের সীমান্ত চৌকিটা কোথায়, তা তাদের জানা আছে। কিন্তু তারা দেখতে পেল, কাফেলা সেই পথ এড়িয়ে এমন এক পথ ধরেছে, যে পথে কোন চৌকি নেই। অঞ্চলটাই এমন যে, সেনা টহল চৌকি এড়িয়ে পথচলা সম্ভব। কাফেলার উটপালের পিঠে যে মালামাল বোঝাই করা আছে, তাও সন্দেহজনক মনে হল। এই বিশাল বিশাল মটকা ও পেচিয়ে রাখা তাঁবুর মধ্যে কী আছে কে জানে। মালামালও অনেক।

খলীল ও তার সঙ্গী মরু যাযাবর সেজে তথ্য নেয়ার চেষ্টা করছে। কাফেলায় চারটি যুবতী মেয়েও আছে। পোশাক-পরিচ্ছদে তারা যাযাবরই নয়– রীতিমত বেদুঈনের মত। মাথার চুলের ধরণ-কাটিংও প্রমাণ করছে, সভ্যতা-ভদ্রতার ছোঁয়া তাদের গা স্পর্শ করেনি। কিন্তু তাদের মুখাবয়ব, চোখের চাহনি ও শারীরিক গঠন-আকৃতি প্রমাণ করছে, আসলে ব্যাপার অন্যকিছু এবং এটা তাদের ছদ্মবেশ।

কাফেলায় একজন বৃদ্ধ লোক আছে। তার গায়ের রং গৌর। মুখে বসন্তের দাগ। কিন্তু তার দাঁত বলছে, তার বয়স এত বেশী নয়, যতটা চেহারা দেখে মনে হচ্ছে।

এই বৃদ্ধ খলীল ও তার সঙ্গীকে নিজের সঙ্গে নিয়ে নেয় এবং অত্যন্ত স্নেহের সাথে জিজ্ঞেস করতে শুরু করে, তোমরা কোথা থেকে এসেছ এবং কোথায় যাচ্ছ?

খলীল নিজের আসল পরিচয় না দিয়ে উল্টো জানতে চাচ্ছে, কাফেলা কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাচ্ছে এবং এই মালপত্রগুলো কী?

বৃদ্ধ এত হৃদয়গ্রাহী মজার মজার কথা বলতে শুরু করে যে, খলীল ও তার সঙ্গী সুযোগ পায়নি তথ্য নেয়ার।

চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। তারপর গভীর রাত। কাফেলা চলতে থাকে। খলীল বৃদ্ধকে কাফেলার গতিপথ পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়ে বলল, এই পথে চলুন, তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌছা যাবে। সে চেষ্টা করছে কাফেলাটি সেনা চৌকির নিকট দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। খলীল স্পষ্ট বুঝতে পারছে, কাফেলা সেনা চৌকি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে।

খলীলের সন্দেহ পাকাপোক্ত হতে চলেছে। আরো একটু সামনে অগ্রসর হওয়ার পর ছাউনি ফেলার উপযোগী স্থান পাওয়া যায়। কাফেলা থেমে যায়। রাত যাপনের জন্য তাঁবু খাটায়।

খলীল ও তার সঙ্গী কাফেলা থেকে খানিক দূরে সরে গিয়ে একস্থানে বসে

পরামর্শ করে, কী করা যায়। দু'টি পন্থা অবলম্বন করা যায়। প্রথমত, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে কাফেলার মালপত্রের তল্লাশী নেয়া যায়। দ্বিতীয়ত, দু'জনের একজন চুপিচুপি এখান থেকে বেরিয়ে যাবে এবং নিকটবর্তী চৌকিতে গিয়ে সংবাদ দেবে। কিন্তু দ্বিতীয় পন্থায় আশংকা আছে। তাতে কাফেলার লোকদের মনে সন্দেহ জাগবে এবং অপরজনকে হত্যা কিংবা অপহরণ করে দ্রুতগতিতে স্থান ত্যাগ করে কেটে পড়বে।

তারা না ঘুমিয়ে জাগ্রত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কাফেলার লোকেরা আহরাদি সেরে শুয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে কাফেলার দু'টি মেয়ে চুপিচুপি তাদের নিকট এমনভাবে চলে আসে, যেন তারা সঙ্গীদের ফাঁকি দিয়ে এসেছে। তারা অত্র এলাকার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। তারা খলীল ও তার সঙ্গীকে বলল, 'আমরা যদি তোমাদেরকে একটি রহস্য জানিয়ে দেই, তাহলে কি তোমরা আমাদেরকে সাহায্য করবে?'

'রহস্য' শব্দটা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচরদের চমকে দেয়। তাদের কাজই তো রহস্য উদঘাটন করা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো এবং বিশেষ করে এই কাফেলায় যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যই তো রহস্য জানা।

মেয়েরা বলল, 'কাফেলার লোকগুলো অপহরনকারী। আমরা যে চারটি মেয়ে আছি, আমাদেরকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, আমরা জানি না।' মেয়েরা আরো জানায়, 'আমরা মুসলমান এবং এদের থেকে মুক্ত হতে চাই।'

কথায় কথায় এক মেয়ে খলীলকে সরিয়ে নিয়ে যায়। মেয়েটির কথাবার্তায় সরলতা আছে, আকর্ষণও আছে। সে খলীলকে বলল, 'তুমি যদি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করব এবং সারাজীবন তোমার সেবা করব।' মেয়েটি আরো এমন কিছু কথা বলল, যার ফলে খলীল তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। মেয়েটা খলীলের প্রতি তার ভালবাসা ও নিজের অসহায়ত্বের কথা এমনভাবে প্রকাশ করে যে, খলীল তার ও অন্যান্য মেয়েদেরকে কিভাবে মুক্ত করা যায় ভাবতে শুরু করে।

অপর মেয়ে খলীলের সঙ্গীর সঙ্গে আলাদা ঘনিষ্ঠভাবে বসে আছে এবং এ ধারায়ই কথা বলছে। একজন নারীর স্রেফ নারী হওয়াই একটা শক্তি। সেই নারী যখন হয় রূপসী-যুবতী এবং বিপদগ্রস্ত, তখন একজন পুরুষ না গলে পারে না। সে অবস্থায়ই হয়েছে খলীল ও তার সঙ্গীর। দু'জনই যৌবনদীপ্ত যুবক। তাছাড়া

একজন নারী– সে যে-ই হোক– বিপদে পড়লে সাহায্য করা তাদের সামরিক নীতির অংশ।

মেয়েরা আলাদাভাবে দুই মিশরী গুপ্তচরকে খুশী করার জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু কি যেন খেতে দেয়। এক মেয়ে উঠে পা টিপে টিপে তাঁবুতে যায় এবং ছোট একটি মশক হাতে নিয়ে ফিরে আসে। মশক থেকে শরবত ধরনের পানীয় ঢেলে দু'জনকে খাওয়ায়। অত্যন্ত সুস্বাদু শরবত। তৃপ্তি সহকারে পান করে খলীল ও তার সঙ্গী।

অল্পক্ষণ পরই দু'জনের চোখের পাতা বুজে আসে। তারা ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন যখন তাদের চোখ খুলে, তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ডুবি ডুবি করছে। সারা রাত ও সারাটা দিন ঘুমিয়ে থাকে তারা। মরুভূমির বালুকা প্রান্তরের ঝলসানো রোদও তাদেরকে জাগাতে পারেনি। সন্ধ্যাবেলা যখন তারা চোখ মেলে তাকায়, তখন কাফেলাও নেই, তাদের উটও নেই। আর তারাও সেই জায়গায় নেই, যেখানে ঘুমিয়েছিল। এ অন্য এক স্থান, যার আশপাশে মাটি ও বালির টিলা।

খলীল ও তার সঙ্গী ধড়মড় করে উঠে একটি উঁচু টিলার উপর চড়ে এদিক-ওদিক তাকায়। তারা চারদিকে সারি সারি টিলার চূড়া আর দূরদিগন্তে মরুভূমির বালু ছাড়া আর কিছুই দেখছে না।

'সেই বৃদ্ধ লোকটা আমি ছিলাম, সফরের সময় তুমি যার সঙ্গে কথা বলছিলে' রেমন্ডের গোয়েন্দা কমান্ডার বললেন– 'আমি তোমার কথাবার্তায় বুঝে ফেলেছিলাম, তুমি গোয়েন্দা এবং জানতে চাচ্ছ আমরা কারা এবং কোথায় যাচ্ছি।'

'না, সে লোকটি তুমি নও'– খলীল বলল– 'সে তো বৃদ্ধ ছিল।'

'ওটা ছিল আমার ছদ্মবেশ'– উইন্ডসর বলল– 'যা হোক আমি খুশি হলাম যে, তুমি মেনে নিয়েছ, তোমরা গুপ্তচর ছিলে এবং এখনও তা-ই আছ। আরো শুনো, যে দু'টি মেয়ে তোমাদেরকে অজ্ঞান করেছিল, এ হল তাদের একজন।'

'এখন আমরা গুপ্তচর নই'– খলীল বলল– 'আমরা এখন খলীফার অনুগত সৈনিক।'

'তুমি বকওয়াস করছ'– উইন্ডসর বললেন– 'আমি সব সময় আলী বিন সুফিয়ানের প্রশংসা করে থাকি। কিন্তু তোমাদের প্রশিক্ষণ তো অসম্পূর্ণ। তোমরা এখনো পরিচয় গোপন করা ও গঠন-আকৃতি পরিবর্তন করা শেখনি।

উইন্ডসর খলীল ও তার সঙ্গীকে জানায়– 'আমরা সামরিক সরঞ্জাম ও প্রচুর

নগদ অর্থ নিয়ে সিরিয়া যাচ্ছিলাম। কাফেলার মরুবাসী বেশের লোকগুলো ছিল সামরিক উপদেষ্টা। তারা ছিল খৃস্টান। সুদান যাচ্ছিল। তারাই সুদানী ফৌজ গঠন করে এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই তকিউদ্দীনকে এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে যে, সে অর্ধেক ফৌজ সুদান ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সালাহুদ্দীন আইউবী যদি বিচক্ষণতার পরিচয় না দিতেন, তাহলে তকিউদ্দীনের অবশিষ্ট ফৌজও সুদান থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না। ঐ মেয়েগুলোও সেই যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।"

উইন্ডসর আরো জানায়, সেদিন মিশরের উত্তরাঞ্চলে যখন খলীলদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেদিন ছাউনীতে অবস্থান করার সময় তাদের একজন লোকও ঘুমায়নি এবং তাদেরকে কথা ও নারী দেহের ফাঁদে ফেলে অজ্ঞান করার জন্য মেয়ে দু'টোকে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের কৌশল সফল হয় এবং খলীল ও তার সঙ্গীকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে কাফেলা রওনা হয়ে যায়।

ঘটনাটা খলীলের ভালভাবেই মনে আছে এবং অন্তরে কাঁটার ন্যায় বিদ্ধ হয়ে আছে। এমন একটি ভয়ংকর গোয়েন্দা দলের কাফেলা তার হাত থেকে ছুটে গেল! তার গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাসে এমন ঘটনা দ্বিতীয় আরেকটি ঘটেনি। খলীল তার হেডকোয়ার্টারে এ ঘটনার রিপোর্টই করেনি। কারণ, প্রতিপক্ষের গোয়েন্দারা তাকে ধোঁকা দিয়ে কাবু করে ফেলেছিল। এটা তার ও তার সঙ্গীর এমন একটা অপমান, যা কাউকে বলা যায় না।

এখন সেই কাফেলার একজন পুরুষ ও একটি মেয়ে তার সামনে দন্ডায়মান। খলীল ও তার সঙ্গী তাদের কয়েদী। তবে খলীল অস্ত্রত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। হয়ত তাকে এখান থেকে পালাতে হবে কিংবা জীবন ত্যাগ করতে হবে।

'তোমরা আমার একটা প্রস্তাব মেনে নাও'– উইন্ডসর বললেন– 'আমি তোমাদের উপর এমন দয়া করব, যেমনটি পূর্বে কখনও কারো উপর করিনি। তোমরা উভয়ে আমার দলে শামিল হয়ে যাও। বেতন-ভাতা যা চাইবে, তা-ই দেব। বললে দামেস্কে পাঠিয়ে দেব। যদি কায়রো পাঠাতে বল, তাতেও আপত্তি করব না। সেখানে গিয়ে তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর লোক হয়ে থাকবে; কিন্তু কাজ করবে আমাদের। তোমাদের দায়িত্ব হবে, ওখানে আমাদের যেসব গোয়েন্দা কাজ করছে, তাদের সাহায্য করা। ধরা পড়ার উপক্রম হলে তোমরা সময়ের আগে তাদেরকে সতর্ক করে ঠিকানা থেকে সরিয়ে দেবে।'

উইন্ডসর বলেই যাচ্ছেন আর খলীল ও তার সঙ্গী চুপচাপ শুনছে। তার ধারণা ছিল, এরা তার প্রস্তাব মেনে নেবে। তিনি বললেন– 'তবে এই প্রস্তাব

গ্রহণ করে নেয়ার আগে একটি শর্ত পালন করতে হবে। তাহল, এখানে তোমাদের যত গোয়েন্দা আছে, তাদেরকে ধরিয়ে দেবে এবং বলে দেবে তারা কে কোথায় আছে।'

'আপনার প্রস্তাবের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই'– খলীল বলল– 'আর এখানে কারো গোয়েন্দা আছে কিনা, তাও আমার জানা নেই।'

'তোমরা সম্ভবত বুঝতে পারছ না, আমি তোমাদের কী দশা ঘটাব'– উইন্ডসর বললেন– 'তোমরা যদি এই আশা করে থাক যে, আমি হুট করে তোমাদেরকে খুন করে ফেলব, তাহলে তোমাদের সেই বাসনা পূরণ হবে না। যে জাহান্নামে আমি তোমাদেরকে নিক্ষেপ করব, সেখান থেকে অত তাড়াতাড়ি তোমরা মুক্তি পাবে না।'

উইন্ডসর মুচকি একটা হাসি দিয়ে বললেন– 'তোমরা কি আশা কর যে, আমি মেনে নেব তোমরা গোয়েন্দা নও? তোমরা কি ভাবছ, আমি এখনো দ্বিধার মধ্যে আছি। তোমাদের অত জ্ঞান নেই যে, তোমরা আমাদের ধোঁকা দিতে পারবে। তাই যদি হত, তাহলে দু'টা মেয়ের হাতে তোমরা বোকা সাজতে না। তারা তোমাদেরকে তাদের যৌবন ও রূপের জালে আটকে ফেলেছিল।'

'শোন আমার খৃস্টান বন্ধু'– কণ্ঠস্বর দৃঢ় ও কঠিন রূপ ধারণ করল খলীলের– 'আমরা দু'জন গোয়েন্দা। তবে এটা ভুল যে, আমি কিংবা আমার এই বন্ধু সেদিন তোমার মেয়েদের রূপের ফাঁদে আটকেছিলাম। আমি পাথর। কিন্তু আমার মধ্যে একটা দুর্বলতা আছে। বেশ ক'বছর আগে পনের-ষোল বছর বয়সের একটি মেয়ে আমার চোখের সামনে বিক্রি হয়েছিল। আমি তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম। এক ব্যক্তির হাত থেকে তরবারী ছিনিয়ে নিয়েছিলাম। একজনকে জখমও করেছিলাম। তারা ছিল তিনজন আর আমি একা। তারা আমাকে কাবু করে ফেলে। সেদিন যদি আমি অজ্ঞান না হয়ে পড়তাম, তাহলে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারতাম। তারা মেয়েটাকে নিয়ে গেল। মানুষ আমাকে অচেতন অবস্থায় তুলে আমার ঘরে নিয়ে যায়।'

'তোমার বাড়ী কোথায়?' উইন্ডসরই জিজ্ঞেস করেন।

'আমি কিছুই গোপন করব না। দামেস্কের সন্নিকটে একটি গ্রাম আছে। আমি সেখানকার বাসিন্দা। আর আমার এই বন্ধুর বাড়ী বাগদাদে। এসব কথা এত খোলামেলাভাবে আমি তোমার ভয়ে বলছি না। তুমি আমাকে এত সহজে পাকড়াও করতে পারবে না। সাহস থাকে তো আমার হাত থেকে বর্শাগুলো কেড়ে নাও। তুমি যে চুলার কথা উল্লেখ করেছ, সেখানে নিক্ষিপ্ত হলে আমার

লাশ নিক্ষিপ্ত হবে।'

খলীলের বক্তব্য শুনে উইন্ডসর অবজ্ঞার হাসি হাসলেন। পার্শ্ব থেকে খৃস্টান মেয়েটি হেসে বলল– 'এই আত্মবিশ্বাসই তোমাদের জীবনের অবসান ঘটাবে।' নতুন নর্তকী খলীলের মুখপানে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'আমি বলছিলাম, আমি ঐ মেয়েটাকে রক্ষা করতে পারিনি– তার স্মৃতি কাঁটা হয়ে আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে আছে। সেই রাতে যখন আমরা দু'জন তোমাদের কাফেলার সঙ্গে ছিলাম, তখন তোমার মেয়ে দু'টো আমাকে বলেছিল, তাদেরকে বিক্রি করার জন্য অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন সেই মেয়েটির মুখাবয়ব আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে, আমি যাকে রক্ষা করতে পারিনি। আমি তোমার মেয়ে দু'টোর চেহারায় সেই মেয়েটির নিষ্পাপ চেহারা দেখতে পেয়েছি। আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে থাকা কাঁটা আমার বিবেকের উপর পর্দা ফেলে দেয়। তখন যদি আমার সেই মেয়েটির কথা মনে না পড়ত, তাহলে তোমার মেয়েরা কক্ষনো আমাকে বোকা বানাতে পারত না।'

নতুন নর্তকীর দেহ সজোরে একটা ঝাকুনী দিয়ে ওঠে। একটু পেছনে সরে গিয়ে সে পালংকের উপর ধপাস করে বসে পড়ে। চেহারাটা বিবর্ণ হয়ে যায়।

'আর এখন তো মৃত্যুও আমাকে বোকা বানাতে পারবে না'– খলীল বলল– 'আর তোমার কোন প্রলোভনই আমাকে আমার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।'

ভোজসভার হলরুমে আগত মেহমানরা উইন্ডসরের অপেক্ষা করছে। তাদের অধীর অপেক্ষা নতুন নর্তকীর জন্য। হলরুমের দরজার বাইরে যে দু'জন সান্ত্রী দন্ডায়মান ছিল, তারা এখন কোথায়, সে খবর কেউ জানে না।

বর্শা ও তরবারী এখনো খলীল ও তার সঙ্গীর সঙ্গেই আছে। উইন্ডসর যখন দেখলেন, আসামীরা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তারা ঈমান ও কর্তব্যবোধে অটল, তখন তিনি বললেন– 'ঠিক আছে, তোমাদের অস্ত্রগুলো আমার হাতে দিয়ে দাও।'

খলীল ও তার বন্ধু তাও স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে। উইন্ডসর জোরপূর্বক অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার জন্য উদ্যত হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যান। সম্ভবত তিনি তার দেহরক্ষীদের ডাকতে যাচ্ছিলেন। খলীল দ্রুত ছুটে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয় এবং বর্শার আগাটা উইন্ডসরের দিকে তাক করে কঠোর ভাষায় বলে উঠে– 'যেখানে আছ, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক; এক চুলও নড়বে না বলে দিলাম।' খলীল আরো সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে বর্শার আগাটা উইন্ডসরের ধমনীর উপর

স্থাপন করে। খলীলের সঙ্গীও তৎপর হয়ে ওঠে। সেও তার বর্শার আগা উইন্ডসরের ধমনীতে স্থাপন করে।

উইন্ডসরের ডেকে আনা মেয়েটি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পিছনে সরতে সরতে দেয়ালের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়ায়। খলীল ও তার সঙ্গী তাদেরকে ওখানেই কাবু করে ফেলে। খলীল নতুন নর্তকীকে উদ্দেশ করে বলল– 'তুমিও ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাও। চিৎকার করলে শেষ করে ফেলব বলে দিলাম।'

'তুমি যদি খলীল হয়ে থাকে, তাহলে আমি হুমায়রা'– নতুন নর্তকী বলল– 'আমি তোমাকে প্রথমদিনই চিনেছিলাম। আর তুমি আমাকে চিনতে চেষ্টা করছিলে।'

খানিক আগে খলীল তার নাম ব্যতীত আর সব লক্ষণই বলে দিয়েছিল। হুমায়রা এখানে এসে অবধি খলীলকে অবলোকন করছিল। কিন্তু খলীলের মতো সেও সন্দেহে নিপতিত ছিল। সেও ভাবছিল, মানুষে মানুষে চেহারায় মিল থাকে, আমার ধারণা সঠিক নাও হতে পারে।

'তুমিও কি গুপ্তচর?'– খলীল জিজ্ঞেস করে।

'না'– হুমায়রা জবাব দেয়– 'আমি শুধু নর্তকী। আমাকে সন্দেহ কর না খলীল। আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং তোমার সঙ্গেই থাকব। যদি জীবন দিতে হয়, তোমার সঙ্গেই দেব।

❁ ❁ ❁

ক্ষমতাচ্যুত খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ভোজসভায় এসে পৌঁছান। এসে উপস্থিত হন তার সকল আমীর-উজীর ও আমন্ত্রিত অথিতিগণ। উপদেষ্টা হিসেবে আগত খৃস্টান সেনা অফিসারগণও আছেন মেহমানদের মধ্যে। তাদের চলন-বলনের ধরণ রাজা-বাদশার মতো। তাদের একজন হল রেমন্ডের সামরিক প্রতিনিধি। তারা সকলে উইন্ডসরকে তালাশ করছে। উইন্ডসর এখনো এসে পৌঁছাননি। এখানকার সকল খৃস্টান মেয়ে হলে এসে গেছে। আসেনি শুধু একজন। নর্তকীরাও সবাই এসেছে। আসেনি কেবল নতুনজন। আস-সালিহ এসে পৌঁছানোর পর সকলের অস্থিরতা বেড়ে গেছে। আর বিলম্ব সইছে না কারো। এক চাকরকে বলা হল, তুমি উইন্ডসর ও মেয়ে দু'জনকে গিয়ে বল, সবাই এসে গেছেন, আপনাদের অপেক্ষা করছেন।

'চল, হাত-পা বেঁধে এদেরকে এখানেই ফেলে রেখে আমরা পালিয়ে যাই।' খলীলের বন্ধু বলল।

'তুমি কি একটা বিষাক্ত সাপকে জীবিত রাখতে চাও?' বলেই খলীল পূর্ব

থেকে উইন্ডসরের ধমনী স্পর্শ করে রাখা বর্শাটা পূর্ণ শক্তিতে সেঁধিয়ে দেয়। উইন্ডসরের মাথাটা দেয়ালের সঙ্গে লাগা ছিল। বর্শার আগা তার ধমনী অতিক্রম করে পিছন দিকে বেরিয়ে যায়। উইন্ডসরের মুখ থেকে সামান্য একটু গোঙ্গানীর শব্দ বেরিয়ে আসে। পরক্ষণেই অনুরূপ একটি গড়গড় শব্দ বেরিয়ে আসে খৃস্টান মেয়েটির মুখ থেকেও। খলীলের বন্ধুও একই কায়দায় মেয়েটিকেও কাবু করে ফেলে।

বর্শা দু'টো টেনে বের করে আনে তারা। উইন্ডসর ও মেয়েটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে থাকে। এবার খলীল ও তার সঙ্গী তাদের হৃদপিণ্ডের উপর বর্শা রেখে উপর থেকে সজোরে চাপ দেয়। ঠাণ্ডা হয়ে যায় দু'জন। খলীল লাশ দু'টিকে ঠেলে দেয় পালংকের নীচে।

কক্ষটা উইন্ডসরের। দেয়ালের সঙ্গে হেঙ্গারে তার চোগাটা ঝুলছিল। মাথা ঢাকার অংশটাও আছে সঙ্গে। হুমায়রা টান দিয়ে চোগাটি নিয়ে পরে ফেলে এবং মাথাটা ঢেকে নেয়। নিজের পোশাক খুলে দেহের নিম্নাংশে পুরুষের পোশাক পরিধান করে। পায়ের মোজা পরিবর্তন করে ফেলে এবং মুখটা ঢেকে নেয়। এখন এক নজরে কারো বুঝবার উপায় নেই যে, সে একজন মহিলা।

খলীল দরজা খুলে বাইরে তাকায়। বারান্দায় চাকর-বাকরদের আসা-যাওয়া ও দৌড়-ঝাপ চলছে।

তারা তিনজন বাইরে বেরিয়ে পড়ে। দরজাটা বাহির থেকে বন্ধ করে একদিকে হাঁটা দেয়। মুহূর্তের মধ্যে তারা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

খলীল ও তার সঙ্গীর জানা আছে, তাদের কোথায় যেতে হবে। বুজুর্গ আলেমের বেশে তাদের কমান্ডার যেখানে অবস্থান করছেন, সেখানে লুকাবার জায়গাও আছে। ওখান থেকে পালাবার ব্যবস্থাও আছে। এ সময়ে শহর থেকে বের হওয়া নিরাপদ নয়। সঙ্গে ঘোড়াও নেই। হাল্ব থেকে পালিয়ে তাদের দামেস্কে পৌঁছতে হবে। খুনের ঘটনা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর শহরে কী তোলপাড় শুরু হবে, সেই আন্দাজও তাদের আছে।

উইন্ডসরের খুনের ঘটনা জানাজানি হতে বেশী বিলম্ব হল না। একব্যক্তি উইন্ডসরের কক্ষের দরজা খুলেই চীৎকার করে ওঠে। পালংকের নীচ থেকে রক্ত বেয়ে বেয়ে দরজা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদময় হুলস্থূল শুরু হয়ে যায়। একটি নয়– দু'টি লাশ! জখম দু'জনের একই ধরনের!

কর্মকর্তারা ছুটে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীদের কথা মনে পড়ে যায়। তাদের উপস্থিতিতে একসঙ্গে দু'টি খুন কিভাবে হতে পারে? কর্তব্যরত সান্ত্রীদের তলব

করা হয়। কিন্তু দু'জনই উধাও। এই ভবনে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ। শাসক কিংবা গণ্যমান্য নাগরিক ছাড়া কেউ এই প্রাসাদে ঢুকতে পারে না। তাদেরকেও চেক করে ঢুকতে দেয়া হয়। রক্ষী কমান্ডারের উপর বিপদ নেমে এল। এই দুর্ঘটনার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

এই হত্যাকাণ্ড কাদের কাজ? পেশাদার ঘাতকদের, নাকি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচরদের? ফেদায়ী ঘাতকদেরও হতে পারে। এই ভাড়াটিয়া ঘাতকরা অর্থের বিনিময়ে যে কাউকে খুন করতে পারে।

কর্তব্যরত প্রহরীদেরকে খুঁজে না পাওয়ায় সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল যে, এটা সুলতান আইউবীর কাজ এবং পলাতক প্রহরীরা তারই লোক। গভীর রাত অবধি খলীল ও তার সঙ্গীকে না পেয়ে শহরে তাদের অনুসন্ধান শুরু হয়ে যায়। নতুন নর্তকী যে নেই, সে তথ্য ফাঁস হয় অনেক পরে। শহর সীল করে দেয়া হয়।

খলীল, তার সঙ্গী ও হুমায়রা ঠিকানায় পৌঁছে গেছে। তারা কমান্ডারকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। কমান্ডার তাদেরকে লুকিয়ে ফেলেন এবং বলে দেন, বাইরের পরিস্থিতি অনুযায়ী তোমাদের জানানো হবে, তোমরা কবে এবং কখন এখান থেকে বেরিয়ে পড়বে।

এই কমান্ডারের উপর কারো সন্দেহ হবে না। কারণ, মানুষ তাকে একজন বিজ্ঞ আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি বলেই জানে। যে দু'জন শিষ্যকে তিনি সঙ্গে রেখেছেন, তারাও গোয়েন্দা। হাল্‌বের তথ্যাদি দামেস্কে এরাই পৌঁছিয়ে থাকে। তিনি বাইরের পরিস্থিতির উপর নজর রাখার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেন।

হুমায়রা কমান্ডারের সম্মুখে খলীলকে তার কাহিনী শোনায়–

'তুমি যখন আমাকে আমার পিতা ও লোক দু'জন থেকে রক্ষা করার জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলে, তখন আমার পিতা তোমার মাথায় কোদাল দ্বারা আঘাত হানে। আঘাতের ফলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলে। তারা তিনজন আমাকে ধরে নিয়ে একজন মৌলভী ডেকে আনে। মৌলভী সাহেব আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস না করে আমার বিবাহ পড়িয়ে দেন। তারপর লোক দু'জন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তারা আমাকে এক রাত দামেস্কে রাখে। তারপর এমন একটি এলাকায় নিয়ে যায়, যেখানে খৃস্টানদের শাসন চলছে। তারা আমাকে নাচ-গানের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। আমি প্রথম প্রথম অমত পোষণ করি। ফলে আমার উপর এমন নির্যাতন চালানো হয় যে, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। শুরুর দিকে আমাকে উন্নত মানের খাবার দেয়া হত এবং অত্যন্ত সুস্বাদু এক প্রকার শরবত পান করাত, যার ক্রিয়ায় আমি হাসতে ও নাচতে শুরু করতাম।'

তারা নির্যাতন ও নেশার ঘোরে আমাকে নর্তকী বানিয়ে নেয়। আমি উঁচুমানের লোকদের ভোগের বস্তুতে পরিণত হই। আমাকে জেরুজালেম নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওখানে দু'ব্যক্তি আমাকে দেখে আমার মালিককে বলল, 'মূল্য যা চাইবে, তা-ই দেব, মেয়েটাকে আমাদেরকে দিয়ে যাও।' কিন্তু মালিক এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমরা একে গুপ্তচরবৃত্তি ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করে থাকি।'

হুমায়রা জানায়–

'আমাকে বেশ কয়েকবার অপহরণ করারও চেষ্টা করা হয়েছে, যা ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে। এখন আমাকে এক আমীরের ফরমায়েশে হাল্‌বে তলব করা হয়েছে।'

হুমায়রা জানায়, 'প্রথমদিন যখন আমি তোমাকে দেখি, তখন আমি নিশ্চিত বুঝেছিলাম যে, তুমি খলীল। কিন্তু পরক্ষণে মনে এই সন্দেহও জাগ্রত হয় যে, মানুষে মানুষে চেহারায় মিল থাকে। হয়ত তুমি দেখতে খলীলের মত অন্য কেউ। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি তোমাকে নিরীক্ষা করে দেখতে থাকি। তারপর তো নিশ্চিত হলাম তুমি খলীল ছাড়া আর কেউ নও।'

হুমায়রা জানায়–

'আমি নোংরা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমার চেতনা মরে গিয়েছিল। আমি একটি পাথরখণ্ডের ন্যায় এদিক-ওদিক নড়াচড়া করতে থাকি। কিন্তু তোমাকে দেখার পর আমার চেতনা জীবিত হয়ে ওঠে। আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে, তুমি খলীল। কিন্তু তোমার গঠন-আকৃতি আমাকে সেই সময়টা স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন আমার হৃদয়ে তোমার ভালবাসা ছিল এবং আমি তোমার সন্তানের মা হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম যে, সুযোগমত একসময় তোমাকে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি খলীল? তুমি খলীল প্রমাণিত হলে তোমাকে বলব, চল আমরা পালিয়ে যাই এবং যাযাবরদের ন্যায় জীবন-যাপন করি।'

হুমায়রা খলীলকে পেয়ে গেছে এবং তার সঙ্গে পালিয়েও এসেছে। কিন্তু হাল্‌ব থেকে নিরাপদে বের হওয়া তাদের পক্ষে বিরাট এক সমস্যা।

❁ ❁ ❁

খলীফার ভোজসভা এবং নাচ-গানের আসর লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। ওখানে অপেক্ষা চলছিল উইন্ডসরের। কিন্তু পৌঁছে তার লাশ। খৃষ্টান সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন যে অফিসার সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

সবচে' বেশি ক্ষুব্ধ হয় রেমন্ডের প্রতিনিধি।

উইন্ডসর অত্যন্ত চৌকস অফিসার ছিলেন। রেমন্ডের প্রতিনিধি আল-মালিকুস সালিহ, তার আমীর ও সেনা কমান্ডারদের বকাঝকা শুরু করে দেয়। তার সম্মুখে নতশীরে চুপসে আছে সবাই। তাদের অন্তরে সালাহুদ্দীন আইউবীর শত্রুতা ও ঘৃণা এত প্রবল যে, তারা খৃস্টান অফিসারদেরকে ফেরেশতা মনে করেন। তাদেরই সাহায্য-সহযোগিতায় তারা আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কাজেই তাদের তোষামোদ করা আবশ্যক। রেমন্ডের প্রতিনিধি যা-ই বলছে, তার সামনে তারা মাথানত করছে এবং জ্বি হ্যাঁ, জ্বি হ্যাঁ বলছে। রেমন্ডের প্রতিনিধি বলল–

'ঘাতকরা রাতারাতি শহর ত্যাগ করতে পারবে না। কাজেই ভোর থেকেই হাল্‌বের প্রতিটি ঘরে তল্লাশি চালানো হোক। এলাকার সমস্ত ফৌজকে এ কাজে লাগিয়ে দাও। মানুষ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার আগেই ফৌজ ঘরে ঘরে ঢুকে পড়বে। এখানকার অধিবাসীদের অস্থির করে তুলতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই ঘাতকদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়।'

'তা-ই হবে'– এক মুসলমান আমীর বললেন– 'আমরা ফৌজকে এখনই নির্দেশ দিচ্ছি, যেন তারা রাতের আঁধারেই শহরে ছড়িয়ে পড়ে।'

'না, এটা হতে পারে না'– একজন মুসলমান কেল্লাদারের কণ্ঠ। তিনি হুংকার ছেড়ে আবার বললেন– 'না, এমন হতে পারে না। তল্লাশি শুধু সেই ঘরেই নেয়া হবে, যে ঘরে ঘাতকরা লুকিয়েছে বলে প্রবল সন্দেহ হবে এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকবে।'

কেল্লাদারের এ হুংকারে অকস্মাৎ উত্তপ্ত মজলিস ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পিনপতন নীরবতা নেমে এলে হলরুমে। হঠাৎ চুপসে গেল প্রতাপান্বিত এতগুলো পদস্ত শাসক-কর্মকার্তা। এমন একটি জ্বলন্ত সত্য ভাষণ শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউ। রেমন্ডের সামরিক প্রতিনিধির নির্দেশকে কোন মুসলমান এত সাহসিকতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, তা সকলের কল্পনার বাইরে। মাথা উঁচু করে, চোখ বড় করে ও কপালে ভাজ তুলে দেখার চেষ্টা করল, লোকটা কে।

লোকটা হামাতের দুর্গ- অধিপতি। তার নাম জুরদিক। ইতিহাসে তার নাম এই জুরদিকই উল্লেখ করা হয়েছে। পুরো নাম পাওয়া যায় না। ইতিহাস তার সম্পর্কে এটুকুই বলছে যে, লোকটা সালাহুদ্দীন আইউবীর বন্ধু ছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা পর্যন্ত তিনি আইউবী বিরোধী শিবিরেরই লোক ছিলেন এবং আল-মালিকুস সালিহ'র অফাদার ছিলেন। তার প্রমাণ, তিনি এই ভোজসভায় শুধু

উপস্থিত-ই ছিলেন না; বরং আইউবী বিরোধীদের জঙ্গী কর্মকাণ্ডগুলোতেও হাজির থাকতেন। সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছিল, তিনি তাতেও উপস্থিত ছিলেন।

জুরদিক যখন একজন খৃষ্টানের মুখ থেকে শুনলেন যে, হাল্‌বের প্রতিটি ঘরে তল্লাশি চালানো হবে, তখন তার মধ্যে ইসলামী মর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। তিনি প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। তিনি বললেন– 'এখানকার প্রতিটি পরিবার মুসলমান। তাদের মধ্যে পর্দানশীল সম্ভ্রান্ত মহিলারাও রয়েছেন। আমি তাদের অবমাননা মেনে নিতে পারি না। সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোতে সৈন্য ঢুকতে পারবে না।'

'উইন্ডসরের ঘাতক এই নগরীরই মানুষ'– এক খৃস্টান অফিসার বলল– 'আমরা সব নাগরিক থেকে প্রতিশোধ নেব। উইন্ডসরের ন্যায় একজন সুদক্ষ অফিসার খুন হল। আমরা কারো ইজ্জত, কারো পর্দার পারোয়া করি না।'

'আর তোমাদের একজন অফিসার খুন হয়েছে, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।' ক্ষুব্ধ জুরদিক কম্পিত কণ্ঠে বললেন।

'চুপ কর জুরদিক!'– অনভিজ্ঞ বালক সুলতান আদেশের ভঙ্গিতে বললেন– 'এরা এতদূর থেকে আমাদের সাহায্যের জন্য এসেছেন! এরা আমাদের সম্মানিত মেহমান। তুমি কি মেহমানদারীর আদব-কায়দা ভুলে গেছ? নিমকহারামী কর না জুরদিক! যে করেই হোক, খুনীকে আমাদের ধরতেই হবে।'

খলীফার সমর্থনে আরো কয়েকটি কণ্ঠ ভেসে এল– 'ঠিক, ঠিক।'

'আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরোধী হতে পারি এবং বিরোধী-ই'– জুরদিক বললেন– 'কিন্তু আমি আমার স্বজাতির বিরোধী নই। মুহতারাম সুলতান! আপনি যদি জনসাধারণকে বিরক্ত করেন, তাহলে তারা আপনার বিরুদ্ধে চলে যাবে। আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে যে রণ প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তা দুর্বল হয়ে পড়বে।'

'আমরা জনগণের পরোয়া কখনো করি না'– রেমন্ডের প্রতিনিধি বলল– 'উইন্ডসরের ঘাতকদেরকে আমরা খুঁজে বের করবই। শহরের যেখানেই পালিয়ে থাকুক, তাদেরকে ধরবই। এ হত্যাকাণ্ড যে সালাহুদ্দীন আইউবী করিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই।'

'আমার দোস্ত!'– জুরদিক বললেন– 'তোমাদের একজন অফিসারের খুন হওয়া তেমন কোন ঘটনা নয়। তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে খুন করার জন্য কতবার চেষ্টা করেছ! পারনি, সে ভিন্ন কথা। আমি একথা বলছি না যে, আইউবীকে খুন করার চেষ্টা করে তোমরা অন্যায় করেছ। দুশমন একে অপরকে

বৈধ-অবৈধ যে কোন পন্থায়ই ঘায়েল করার চেষ্টা করে। তোমাদের উইন্ডসরকে যদি আইউবী-ই খুন করিয়ে থাকেন, তাহলে পার্থক্য শুধু এটুকু যে, তাকে হত্যা করার প্রচেষ্টায় তোমরা সফল হওনি; কিন্তু তিনি সফল হয়েছেন। তোমরাও তো তার কয়েকজন অফিসারকে খুন করিয়েছ। তারপরও তো তিনি জনসাধারণকে বিরক্ত করেননি।'

সমস্ত মুসলিম আমীর ও কর্মকর্তা জুরদিকের বিপক্ষে কথা বলতে শুরু করেন। তারা খৃস্টানদেরকে নারাজ করতে চাচ্ছেন না। কিন্তু জুরদিক একাই সকলের মোকাবেলা করেন এবং নিজের অভিমতের উপর সুদৃঢ় থাকেন যে, নগরীর ঘরে ঘরে নির্বিচারে তল্লাশী চালানো যাবে না।

'তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, তুমিও এই খুনের ঘটনায় জড়িত রয়েছ?' এক খৃস্টান উপদেষ্টা বলল– 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর অনুগত।'

'যদি হালবের মুসলিম পরিবারগুলোকে অন্যায়ভাবে পেরেশান করা হয়, তাহলে আমি যে কারো হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারি'– জুরদিক বললেন– 'আর আইউবীর বন্ধুও হয়ে যেতে পারি।'

'আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে আছি, আমাদেরই নির্দেশ চলবে।' খৃস্টান প্রতিনিধি বলল।

'এখানে তোমরা ভাড়ায় এসেছ'– জুরদিক বললেন– 'এদেশে শাসন চলবে আমাদের। আমরা মুসলমান। পরিস্থিতি আমাদেরকে আপসে যুদ্ধে করাচ্ছে। মুসলিম-অমুসলিমে কখনো সখ্য হতে পারে না। যদি বল, তোমরা পারিশ্রমিক ছাড়া এসেছ, তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছি। দুর্গ অধিপতির পদ থেকেও আমি অব্যাহতি গ্রহণ করছি। আমি তোমাদের সকলকে জানিয়ে দিতে চাই যে, আমার জাতির একটি নিরপরাধ লোককেও যদি কষ্ট দেয়া হয়, আমি তার প্রতিশোধ নেব।'

কার যেন ইশারায় দু'ব্যক্তি জুরদিককে বাহিরে নিয়ে যায়। তার অনুপস্থিতিতে খৃস্টান প্রতিনিধি সভাসদদের উদ্দেশ করে বলল– 'পরিস্থিতি এমন যে, দুর্গ অধিপতিকে ক্ষেপানো যাবে না। লোকটা যেভাবে সাহসিকতার সঙ্গে কথা বলছে, তাতে বুঝা যায় যে, তার দুর্গে যেসব সৈন্য আছে, তারা তার অনুগত। ঘটনা যদি তা-ই হয়, তাহলে পরিস্থিতিটা ভাল নয়।

আপসে শলা-পরামর্শ করে জুরদিককে ভেতরে নিয়ে আসা হল। তাকে আশ্বস্ত করা হল, নিরীহ জনসাধারণকে হয়রানী করা হবে না। কিন্তু ঘাতকদের খুঁজে বের করতে হবে।

জুরদিক বললেন– 'ঠিক আছে, আমি তিন-চার দিন এখানে থাকব। দেখব, তোমরা কী কর।'

চারদিন পর জুরদিক হাল্ব থেকে রওনা হন। গন্তব্য তার হামাতের দুর্গ। তার উপস্থিতিতে খুনীদের অনুসন্ধান ও গোয়েন্দা তৎপরতা চলে। তিনি পরিস্থিতির উপর কড়া দৃষ্টি রাখেন। তার দাবি অনুযায়ী কারো বাড়ি-ঘরে হানা দেয়া হয়নি। তিনি নিশ্চিন্ত মনে যাচ্ছেন। কিন্তু খৃস্টানরা তার ব্যাপারে আশ্বস্ত নয়। সঙ্গে দশ-বারজন রক্ষীসেনা। তিনিসহ সবাই অশ্বারোহী।

জুরদিক এগিয়ে চলছেন। একটু পরপর পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করতে হচ্ছে। দু'-তিনটা পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করার পর আরো একটা পাহাড়ী এলাকায় ঢুকে পড়েন। পথের দু'পার্শ্বে উঁচু-নীচু অনেক টিলা। হঠাৎ কোন একদিক থেকে একসঙ্গে দু'টি তীর ছুটে আসে তার দিকে। উভয় তীর জুরদিকের ঘোড়ার মাথায় এসে বিদ্ধ হয়। হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে ঘোড়াটা দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করে। শাঁ করে ধেয়ে আসে আরো দু'টি তীর। এগুলোও বিদ্ধ হয় ঘোড়ার গায়ে।

জুরদিক দক্ষ ঘোড়সওয়ার। তিনি ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে একটি পাথরের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ান। তার রক্ষী সেনারা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। যারা তীর ছুঁড়েছে তাদেরকে খুঁজতে থাকে।

এলাকাটি এমন যে, কাউকে গ্রেফতার করা কঠিন ব্যাপার। জুরদিক বুঝে ফেলেন, এরা ভাড়াটিয়া ঘাতক। সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে খৃস্টানরা তাকে খুন করার জন্য এদের নিয়োগ করেছে। খৃষ্টানদের মনে সন্দেহ, জুরদিক সুলতান আইউবীর সমর্থক।

জুরদিক দক্ষ যোদ্ধা। তিনি পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে উপরে উঠে আসেন। চারদিকে টিলা আর টিলা। তার রক্ষীসেনারা তীরান্দাজদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'এদিকে আস!' এক রক্ষী চিৎকার করে বলল– 'জলদি এদিকে আস, ধরে ফেলেছি।'

সবাই ওদিকে ছুটে যায়। তিন ব্যক্তিকে ঘিরে ফেলেছে তারা। তিনজনই মুখোশ পরিহিত। কিন্তু তাদের নিকট ধনুক নেই, তূনীরও নেই। শুধু ঘোড়া আছে। তাদেরকে এমন অবস্থায় পাকড়াও করা হয়েছে, যখন তারা ঘোড়ায় আরোহন করছিল। সবারই মুখমণ্ডল আবৃত। শুধু চোখ দু'টো দেখা যাচ্ছে। রক্ষীরা তদেরকে ধরে জুরদিকের নিকট নিয়ে যায়।

'তোমাদের ধনুক-তূনীর কোথায়?' জুরদিক ধৃতদের জিজ্ঞেস করে।

'আমাদের কাছে তরবারী ছাড়া আর কিছুই নেই।' একজন জবাব দেয়।

'শোন ভাইয়েরা!'– জুরদিক শান্ত কণ্ঠে বললেন– 'তোমাদের চারটি তীরই লক্ষভ্রষ্ট হয়েছে। তোমরা আমাকে খুন করতে ব্যর্থ হয়েছ। এবার ধরাও পড়েছ। কাজেই মিথ্যা বলে লাভ নেই।'

'কিসের তীর?'– বিস্ময়ভরা কণ্ঠে একজন বলল– 'আমরা তো কোন তীর ছুঁড়িনি। আমরা পথচারী। খানিক বিশ্রাম করার জন্য বসেছিলাম! যখন রওনা হতে উদ্যত হলাম, এরা আমাদেরকে ধরে নিয়ে এল!'

জুরদিক হাসেন এবং মুখোশ পরিহিত উত্তরদানকারী লোকটিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আমার শত্রু মনে করি না। তা-ই যদি হতো, তাহলে এতক্ষণে তোমাদের সকলের মস্তক উড়িয়ে দিতাম। আমি জানি, তোমরা ভাড়াটিয়া খুনী। তোমরা শুধু এটুকু স্বীকার কর– আমাকে খুন করার জন্য তোমাদেরকে কে পাঠিয়েছে? সত্য সত্য বল, তোমাদেরকে ছেড়ে দেব।' কিন্তু ধৃতরা একই কথা বলছে যে, এ ব্যাপারে তারা কিছুই জানেনা।

দু'জন মুখোশধারী শপথ করে বলল– 'এই ঘটনার ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।'

তৃতীয় জন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

'দেখ, অযথা নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিও না'– জুরদিক বললেন– 'পরের জন্য নিজের জীবন নষ্ট কর না। আমি তোমাদেরকে শাস্তি দেব না, এক্ষুণি ছেড়ে দেব।'

'এদের মুখোশগুলো খুলে ফেল'– জুরদিক তার রক্ষীদের নির্দেশ দেন– 'এদের হাত থেকে তরবারীগুলো নিয়ে নাও।'

দুই মুখোশধারী খাপ থেকে তরবারী খুলে হাতে নেয় এবং লাফ মেরে পিছনে সরে যায়। তৃতীয়জন তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। তার সঙ্গে তরবারী নেই।

জুরদিক অট্টহাসি হেসে বললেন– 'তোমরা কি এতগুলো রক্ষীসেনার মোকাবেলা করতে পারবে? অথচ তোমাদের তৃতীয়জনের হাতে অস্ত্র নেই! আমি তোমাদেরকে পুনরায় সুযোগ দিলাম। তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ কিন্তু আমি এখনো দেইনি।'

রক্ষীরা অস্ত্র তাক করে তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যায়।

'আর আমি আপনাকে শেষবারের মতো বলছি, আমরা কেউ তীর ছুঁড়িনি।' এক মুখোশধারী বলল।

রক্ষীসেনাদের কমান্ডার ধৃত তিন ব্যক্তির পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। তার মনে বিশেষ সন্দেহ জাগে। তৃতীয় যে লোকটির হাতে অস্ত্র নেই, টান মেরে তার মুখোশটা খুলে ফেলে। তার মুখোশহীন উন্মুক্ত মুখাবয়ব দেখে সবাই থ খেয়ে যায়। এ যে একজন রূপসী যুবতী!

জুরদিক বললেন, ওকে আমার কাছে নিয়ে আস। অপর দু'জন হঠাৎ লাফ মেরে পেছনে মোড় ঘুরিয়ে মেয়েটিকে পাকড়াওকারী রক্ষীর বুকে তরবারী তাক করে ধরে।

একজন চিৎকার করে বলে ওঠে– 'যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাদেরকে তোমাদের পুরো ঘটনা খুলে না বলবে এবং আমাদের ইতিবৃত্ত না শুনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মেয়েটির গা স্পর্শ করবে না বলে দিচ্ছি। আমরা জানি, আমাদেরকে তোমাদের হাতে প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু তোমাদের অন্তত অর্ধেক রক্ষীসেনাকে না মেরে আমরা মরছি না। মেয়েটাকে তোমরা জীবিত নিতে পারবে না।'

জুরদিক ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। তিনি রক্ষীদেরকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে মুখোশধারীদের বললেন– 'তোমরা আমার কাছে আর কী কথা শুনতে চাও বল। কথা তো এটুকুই যে তোমরা ভাড়াটিয়া খুনী আর এই মেয়েটিকে পুরস্কার হিসেবে লাভ করেছ।'

'তোমরা ভুল করছ'– একজন মুখোশধারী বলল– 'খৃস্টান অফিসার ও একটি মেয়েকে হত্যা করে আমরা অপরাধ করিনি। পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছি, সে আমাদের দুর্ভাগ্য। তারপরও আমরা আনন্দিত যে, আমরা কর্তব্য পালন করেছি। এই মেয়েটি মুসলমান ও নিপীড়িত। আমরা একে খৃস্টানদের পাঞ্জা থেকে উদ্ধার করে এনেছি। আর যাচ্ছি দামেস্কে।'

'আচ্ছা! উইন্ডসর ও খৃস্টান মেয়েটাকে তাহলে তোমরা খুন করেছ!' হঠাৎ চমকে ওঠে জিজ্ঞেস করেন জুরদিক।

'হ্যাঁ'– এক মুখোশধারী জবাব দেয়– 'আমরাই তাদেরকে হত্যা করেছি।'

'আর তোমরা আমার উপর এই জন্য তীর ছুঁড়েছ যে, আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমন।' জুরদিক বললেন।

'দেখুন, আমরা ভালভাবেই জানি, আপনার নাম জুরদিক এবং আপনি হামাত দুর্গের অধিপতি'– এক মুখোশধারী বলল– 'আমরা এ-ও জানি যে, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমন। কিন্তু আপনাকে হত্যা করার প্রয়োজন আমাদের নেই। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতি শীঘ্র আমরা তোমাদেরকে নিরস্ত্র

করব। সকল সৈন্যসহ তোমাদেরকে কয়েদী বানাব। সুলতান আইউবী হাসান ইবনে সাব্বাহ কিংবা শেখ সান্নান নন। তিনি ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ করেন– চোরের মতো কাউকে খুন করান না। উইন্ডসর ও খৃস্টান মেয়েটির হত্যাকাণ্ড আমাদের ব্যক্তিগত কাজ। কাজটা আমরা বাধ্য হয়েই করেছি। পরিস্থিতি আমাদেরকে বাধ্য করেছিল। এতে সুলতান আইউবীর কোন হাত নেই।'

জুরদিকের ঘোড়াটা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তারা সেটির দিকে তাকায়। দু'টি তীর ঘোড়াটার কপালে আর দু'টি পাজরে বিদ্ধ হয়েছে। বলল– 'আপনি সুদক্ষ দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসুন। আমাদের একজনকে তীর-ধনুক দিন। আপনি ঘোড়া হাঁকান। অশ্ব চালনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন। আমরা যে কোন একজন ঘোড়ার পিঠে বসে তীর ছুঁড়ব। যদি প্রথম তীরটি লক্ষভ্রষ্ট হয়, তাহলে আমাদের গর্দান উড়িয়ে দিন। যে চারটি তীর আপনার বদলে ঘোড়ার গায়ে বিদ্ধ হয়েছে, এগুলো আমরা ছুঁড়িনি। আমাদের নিশানা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।'

'তোমাকে তো সাধারণ সৈনিক মনে হয় না!'– জুরদিক বললেন– 'তুমি কি সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজের লোক?'

'আর আপনি কে?' মুখোশধারী জিজ্ঞেস করে– 'আপনি কি সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজের লোক নন? আপনি কি ইসলামের সৈনিক নন? আপনি কি আপনার পরিচয় ভুলে গেছেন? কেল্লাদারির পদমর্যাদা আপনার মস্তিষ্ক নষ্ট করে দিয়েছে। আপনি আরো উচ্চ মর্যাদা লাভ করার জন্য কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন।'

'আপনি ভেঙ্গে যাওয়া সেই বৃক্ষ ডালটির ন্যায়, যার ভাগ্যে শুকিয়ে পরে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।' অপর মুখোশধারী বলল– 'আপনি এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নন যে, সালাহুদ্দীন আইউবীর আপনাকে হত্যা করার গরজ পড়েছে। নিজের কৃতকর্মের সাজা ভোগ করার জন্য আপনার বেঁচে থাকা প্রয়োজন। আপনি খুন হবেন তো খৃস্টানদের হাতে হবেন।'

'আপনি হাল্‌বে মদপান করতে আর আয়েশ করতে গিয়েছিলেন'– প্রথম মুখোশধারী বলল– 'আপনি এই মেয়েটির নাচ উপভোগ করতে গিয়েছিলেন।'

'আমি মুসলমান মেয়ে'– মেয়েটি বলে ওঠল– 'আমাকে খৃস্টানদের আসরে আসরে নাচানো হয়েছে। খৃস্টানরা আমার দেহ নিয়ে খেলা করেছে। আপনি কিছুক্ষণের জন্য কল্পনা করুন, আমি আপনার কন্যা। আমি ওখানে মুসলিম মেয়েদেরকে উলঙ্গ নাচতে দেখেছি। আপনারা এতো আত্মমর্যাদাহীন হয়ে

গেছেন যে, আপন বোন-কন্যাদের শ্লীলতাহানিও আপনাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগাতে পারে না। আমি খৃস্টানদের মাঝে সাত-আট বছর কাটিয়ে এসেছি। আমি সেই খৃস্টান সম্রাট-শাসকদের সঙ্গেও সময় অতিবাহিত করেছি, যাদেরকে আপনারা বন্ধু বানিয়ে আপনাদের মাতৃভূমিতে ডেকে এনেছেন। আমি তাদের কথাবার্তা শুনেছি। তারা বন্ধুত্বের ফাঁদ পেতে মুসলমানদের আপসে যুদ্ধ করাচ্ছে।'

জুরদিক নীরব-নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছেন। অপলক নেত্রে এক নাগাড়ে তাকিয়ে আছেন মেয়েটির প্রতি। তার রক্ষীরা হতভম্ব যে, এত প্রতাপশালী ও দুঃসাহসী দুর্গ অধিপতি কীভাবে এসব বরদাশত করছেন!

গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেছেন জুরদিক। কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কোমল কণ্ঠে মুখোশধারীদের উদ্দেশ করে বললেন- 'আমি তোমাদেরকে কেল্লায় নিয়ে যেতে চাই।'

'কয়েদি বানিয়ে?' প্রশ্ন করে এক মুখোশধারী।

'না'– সবাইকে হতবাক করে জুরদিক বললেন– 'মেহমান বানিয়ে। আমার উপর ভরসা রাখ। তরবারীগুলো সঙ্গেই রাখ।'

সকলে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। জুরদিকের ঘোড়া মারা গেছে। তিনি এক রক্ষীর ঘোড়ায় ওঠে বসেন।

কাফেলা রওনা হয়ে যায়।

✿ ✿ ✿

কাফেলা পার্বত্য অঞ্চল ত্যাগ করে সমতলভূমিতে বেরিয়ে এল বলে, ঠিক এমন সময় তারা একাধিক ধাবমান ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে পায়। তারা ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেয়। দেখতে পায়, দু'জন অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে হাল্‌বের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাদের ধনুক-তূনীর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তারা এখান থেকেই পালিয়েছে বলে কাফেলা নিশ্চিত হয়।

'সম্ভবত এরাই আপনার ঘাতক।' বলেই এক মুখোশধারী ঘোড়ার গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। অপর মুখোশধারীও তার ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেয়। উভয়ে তরবারী হাতে তুলে নেয়।

পলায়নপর ঘোড়া দু'টিকে ধাওয়া করছে কাফেলা। দুই মুখোশধারীর ঘোড়ার গতিই সবচে' বেশী। সামনে বালির টিলা ও পার্বত্য অঞ্চল। পলায়নপর আরোহীদ্বয় ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। মুখোশধারী দু'জন অভিজ্ঞ অশ্বারোহী। তারাও ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দূরত্ব কমিয়ে ফেলে। পলায়নকারীরা কাঁধের ধনুক

হাতে নিয়ে তাতে তীর সংযোজন করে। হঠাৎ ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে মোকাবেলার পজিসনে ধাওয়াকারীদের প্রতি তীর ছোঁড়ে। তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। মুখোশধারী দু'জন আরো নিকটে চলে আসে। এখন উভয়ই তীর ছোঁড়ার চেষ্টা করে। পলায়নকারী একজন একটি ঘোড়ার পিছন দিকে তরবারীর আঘাত হানে। ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। অপর পলায়নকারীর উপরও আঘাত করা হয়। তার একটি বাহু কেটে যায়। ঘোড়াটিও আহত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কাফেলার রক্ষীরা পলায়নকারী অশ্বারোহীদের ধরে ফেলে।

ধৃতদেরকে জুরদিকের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। এবার আসল চেহারা খুলে যায়।

মুখোশধারীরা তাদের মুখোশ খুলে ফেলে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়, তারা সুলতান আইউবীর গুপ্তচর। তাদের একজন হল খলীল। অপরজন তার সঙ্গী।

পলায়নরত অবস্থায় যে দু'অশ্বরোহীকে ধরা হল, তারাও মুসলমান। কিন্তু এখানে এসেছিল তারা জুরদিককে হত্যা করতে। খৃস্টানদের নিকট ঈমান বিক্রিকরা বিভ্রান্ত মুসলমান তারা। তাদের যে লোকটির বাহু কেটে গেছে, তাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে কিছু দূরে ফেলে দেয়া হল। অপরজনকে বলা হল, তুমি যদি জীবিত ফিরে যেতে চাও, তাহলে বল তোমাদেরকে কে পাঠিয়েছে? অন্যথায় তোমাকেও সঙ্গীর পরিণতি বরণ করতে হবে।

অশ্বরোহী এবার মুখ খুলল– 'পাঠিয়েছে রেমন্ডের সামরিক প্রতিনিধি। তিনি হাল্‌বের ভোজসভায় মুসলিম আমীরদের উপস্থিতিতে বলেছিলেন, অমুক দিন অমুক সময় জুরদিক পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করবে। তিনি আমাদেরকে বিপুল অর্থ প্রদান করেছেন। আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, তোমরা পাহাড়ের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকবে আর জুরদিককে সময়মত তীরের নিশানা বানিয়ে ফিরে আসবে।'

আমরা দু'জন নির্দিষ্ট সময়ে এই এলাকায় পৌঁছি এবং পথের দিকে দৃষ্টি রেখে একটি উঁচু পাথরের উপর লুকিয়ে বসে থাকি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর আপনার কাফেলা এসে পড়ে। আমরা আপনাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ি। কিন্তু তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পুনরায় তীর ছুঁড়লে সেটিও লক্ষভ্রষ্ট হয়ে ঘোড়ার গায়ে বিদ্ধ হয়।'

অক্ষত তীরান্দাজকে নিয়ে জুরদিক হামাতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। অপরজন কর্তিত বাহুর রক্তক্ষরণের ফলে প্রাণ হারায়।

পথে খলীল হুমায়রার ইতিবৃত্ত কাহিনী জুরদিককে শোনায়। উইন্ডসরকে সে কিভাবে হত্যা করেছিল, তারও বিবরণ দেয়। জুরদিক বিস্ময় প্রকাশ করেন যে,

এমন ঝুঁকিপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটিয়ে তোমর হাল্‌ব থেকে কিভাবে বেরিয়ে এলে!

খলীল জুরদিককে আরো জানায়– 'হাল্‌বে আমাদের একজন কমান্ডার রয়েছেন। কিন্তু আমি তার নাম ও গঠন-আকৃতি আপনাকে বলব না। তিনি কাপড় ইত্যাদি বস্তু পেঁচিয়ে নবজাতক শিশুর সমান একটি প্রতিকৃতি তৈরি করে তার উপর কাফন পরিয়ে দেন। আমাদের চার-পাঁচজন গোয়েন্দা আশপাশে সংবাদ ছড়িয়ে দেয় যে, এখানে অমুকের একটি সন্তান মারা গেছে। কমান্ডার কাফন পেঁচানো প্রতিকৃতিটি দু'হাতে তুলে কবরস্তানের দিকে হাঁটা দেন। আমি, আমার সঙ্গী, হুমায়রা (পুরুষের পোশাকে) এবং আরো চার-পাঁচ ব্যক্তি শবযাত্রার ন্যায় তার পেছন পেছন এগিয়ে আসি। কবরস্তানটি শহরের বাইরে। ওখানে তিনটি ঘোড়া দাঁড়িয়ে ছিল। হাল্‌বের ফৌজে কর্মরত আমাদের এক গোয়েন্দা ঘোড়াগুলো সংগ্রহ করে ওখানে নিয়ে রেখেছিল। জানাযা হাল্‌বের ডিউটিরত সেনা সদস্যদের সম্মুখ দিয়েই কবরস্তানে গিয়ে পৌঁছে। ওখানে একটি কবর খনন করলাম। লাশ দাফন করে আমি, আমার সঙ্গী ও হুমায়রা ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে আসি।'

জুরদিকের কাফেলা যখন দুর্গে গিয়ে পৌঁছে, তখন রাত হয়ে গেছে। জুরদিক খলীল ও তার সঙ্গীদেরকে সম্মানিত মেহমানের ন্যায় থাকতে দেন। তিনি খলীলকে বললেন– 'এবার আমাকে তোমার বন্ধু মনে করতে পার। বল, সালাহুদ্দীন আইউবী কী করছেন? তোমার অবশ্যই জানা আছে যে, আইউবী আস-সালিহকে ধাওয়া করে ধরলেন না কেন। বল, কারণটা কী?'

'আমি সুলতান আইউবীর পরিকল্পনা যদিও জানি, কিন্তু আপনাকে বলব না'– খলীল বলল– 'আর হাল্‌ব থেকে আমি কী কী তথ্য নিয়ে এসেছি, তাও আপনাকে জানাব না।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল'– জুরদিক বললেন– 'পরে এই শত্রুতা আদর্শিক দ্বন্দ্বের রূপ ধারণ করে। তার কারণ যা-ই থাকুক, আমি ভুলের উপর ছিলাম। দুশমন আমাকে ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি খৃস্টানদের মতলব বুঝে ফেলেছি। তারা একদিকে আমার ফৌজ ও আমার দুর্গকে ব্যবহার করতে চায়, অন্যদিকে আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছে। আমার মরহুম নুরুদ্দীন জঙ্গী ও সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কথা মনে পড়ে। তাদের মতে এই যুদ্ধ চাঁদ-তারা ও ক্রুশের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ কোন মুসলিম রাজার সঙ্গে কোন খৃস্টান রাজার যুদ্ধ নয়। সুলতান আইউবী বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে একজন মুসলমানও জীবিত থাকবে, খৃস্টানরা তাকে খতম করার

চেষ্টায় রত থাকবে। অমুসলিম যে ধর্মেরই হোক মুসলমানের আপন হতে পারে না। অমুসলিম মুসলমানের প্রতি বন্ধুত্বের নামে যে হাত প্রসারিত করে, তাতে শত্রুতার বিষ মেশানো থাকে। নুরুদ্দীন জঙ্গীও এই নীতিরই অনুসারী ছিলেন। তিনি সবসময় বলতেন, যেদিন মুসলমান কোন অমুসলিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়বে, সেদিন থেকে ইসলামের পতন শুরু হয়ে যাবে।'

'তবে কি আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে যোগ দেবেন?'– খলীল জিজ্ঞাসা করল– 'আমি একজন সামান্য মানুষ, সাধারণ একজন সৈনিক। আমার এই দুঃসাহস না দেখানেই উচিত যে, একজন দুর্গপতিকে জিজ্ঞেস করব, আপনি কী ভাবছেন এবং আপনার উদ্দেশ্য কী? কিন্তু একজন মুসলমান হিসেবে আমার অধিকার আছে, যে মুসলমান পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তাকে এটুকু বলব, তুমি গোমরাহ হয়ে গেছ।'

'হ্যাঁ'– জুরদিক বললেন– 'তোমার এই অধিকার রয়েছে। আমি তোমাকে একটি পয়গাম শোনাতে চাই। পয়গামটি তুমি সুলতান আইউবীর কানে পৌঁছিয়ে দিও। আমি লিখিত পয়গাম পাঠাতে চাই না। আপাতত দূত প্রেরণ করাও সমীচিন মনে করছি না। তুমি আইউবীকে বলবে, তিনি যেন হামাতের দুর্গকে তাঁরই দুর্গ মনে করেন। কিন্তু সাবধান! কোন বিশ্বস্ত সালারকেও যেন বুঝতে না দেন যে, আমি এই প্রস্তাব পেশ করেছি। বিষয়টা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাঁকে বলবে, খৃস্টানরা বন্ধুত্বের আড়ালে আমাদের ভূখণ্ডে ঝেঁকে বসেছে। তোমরা সম্ভবত শীতের পর হামলা করবে। কিন্তু সাবধান! এদিক থেকে তোমাদের উপর আগেই হামলা হয়ে যায় কিনা। তোমরা যদি অগ্রসর হও, তাহলে হামাতের পথে আসবে। আমি ইনশাল্লাহ তোমাদের পুরাতন বন্ধুত্বের হক আদায় করব।'

পরদিন জুরদিক খলীল, তার সঙ্গী ও হুমায়রাকে বিদায় করে দেন।

খৃস্টান ইন্টেলিজেন্স কমান্ডার উইন্ডসরের হত্যাকাণ্ড নিঃসন্দেহে একটি আকস্মিক ঘটনা। তিনি সুলতান আইউবীর দুই গোয়েন্দার সামনে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন, যার ফলে তারা বাধ্য হয়েই তাকে খুন করে। কিন্তু কাজটি ছিল অবশ্যই দুঃসাহসিক। উইন্ডসর হত্যাকাণ্ডে সুলতান আইউবীর একটি উপকার এই হয়েছিল যে, তাঁর শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা বিভাগ– যা পূর্ব থেকেই দুর্বল ছিল– সংগঠিত হতে পারল না। অপরদিকে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত ও বিচক্ষণ। তার গোয়েন্দারা কেবল

গোয়েন্দাই নয় যে ধরা পড়ে গেলে কিছুই করতে পারবে না। তিনি তাঁর গোয়েন্দাদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর কমান্ডো প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছেন, যাতে ধরা পড়ে গেলেও প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করে বেরিয়ে আসতে পারবে এবং কাউকে হত্যার প্রয়োজন হলে হত্যা করবে। তাদের দেহ-মন এতই পাষাণ যে, নির্যাতন যতো কঠিনই হোক, তারা সহ্য করে নেবে। তীব্র থেকে তীব্রতর ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও চরম ক্লান্তি তাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়।

খলীল ও তার সহকর্মীদের মধ্যেও এসব গুণাবলী বিদ্যমান। তারা কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ খৃস্টান অফিসারকে হত্যা করেই দুশমনকে বোকা বানায়নি, বরং জুরদিকের ন্যায় কঠিন মনের দুর্গপতিকে কথার মাধ্যমে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, তাকে সুলতান আইউবীর পক্ষে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

খলীল যখন সুলতান আইউবীকে জুরদিকের বার্তা শোনায়, তখন সুলতান এমন এক স্বস্তি অনুভব করেন, যেন উত্তপ্ত মরুভূমিতে হঠাৎ শীতল বায়ুর ঝাঁপটা এসে গায়ে লাগে। সুলতান চারদিকে শুধু দুশমনই দেখতে পেতেন। আপনও দুশমন, পরও দুশমন। জুরদিকের পয়গাম তাকে স্বস্তি দিল বটে; কিন্তু তিনি আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হলেন না। বিষয়টা প্রতারণাও হতে পারে বিধায় তিনি আক্রমণ পরিকল্পনায় কোন রদবদল করলেন না। শুধু এতটুকু চিন্তা মাথায় রাখলেন যে, হামাত থেকে সাহায্য পেতে পারি।

দুশমনের আস্তানা হাল্‌ব থেকে যেসব সংবাদ আসছে, তাতে নতুন কোন তথ্য নেই। ওখানে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ওখানকার উপদেষ্টা ও কমান্ডারদের দৃঢ় বিশ্বাস, শীতের মওসুমে যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই। একটি সংবাদই পাওয়া গেছে যে, খৃস্টানরা বাহ্যত ওখানকার সকলের বন্ধুর রূপ ধারণ করেছে ঠিক; কিন্তু আমীরদের একজনের বিরুদ্ধে অপরজনকে উত্তেজিত করে তুলছে। আস-সালিহ'র আশপাশের লোকেরা একে অপরের দুশমন, সে তো সুলতান আইউবীর জানা বিষয়। তারা সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে শুধু এজন্যে একত্রিত হয়েছে যে, সুলতান তাদের সকলের প্রতিপক্ষ। আর এই শত্রুতার কারণ হল, সুলতান আইউবী তাদেরকে বিলাসিতা ও স্বাধীন জীবন-যাপন করার অনুমতি দেন না। সুলতান আইউবীর এই মিশনটাও তাদের ভাল লাগে না যে, সালতানাতে ইসলামিয়ার সম্প্রসারণ ও সুরক্ষাকে ঈমানী দায়িত্ব ভাবতে হবে। তিনি সেইসব রাষ্ট্রনায়কদের মত নন, যারা শান্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা ও ভোগ-বিলাসিতার জন্য শত্রুকে বন্ধুরূপে বরণ করে নেয়। যুদ্ধের যত প্রকার বিদ্যা ও কলাকৌশল রপ্ত করা আবশ্যক, তার সবই সুলতান আইউবী অর্জন করেছেন।

তার বাহিনী হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যেও লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। এখন রাতের প্রশিক্ষণে কোন সৈনিক অসুস্থ হচ্ছে না।

১১৭৪ সালের ডিসেম্বর মাস। সুলতান আইউবী তাঁর সেনাকমান্ডারদের সর্বশেষ বৈঠক তলব করেন। কেন্দ্রীয় কমান্ডের সকল অফিসার ও সকল ইউনিট কমান্ডারগণের বৈঠকে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে সর্বপ্রথম নির্দেশ এই প্রদান করেন যে, এ মুহূর্ত থেকে বাহিনীর গতিবিধি সংক্রান্ত কোন তথ্য কোনক্রমেই বাইরের কাউকে বলবে না। এমনকি নিজ স্ত্রী-সন্তানদেরকেও নয়। ফৌজ অভিযানে রওনা হওয়ার সময় এসে গেছে। কিন্তু বুঝাতে হবে, নিত্যদিনের ন্যায় ফৌজ মহড়া ও প্রশিক্ষণে যাচ্ছে।

এসব দিক-নির্দেশনার পর সুলতান বললেন– 'আমাদের বিলাস-পূজারী ও ঈমান-বিক্রয়কারী ভাইয়েরা ইসলামের ইতিহাসকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে, আজ তোমাদের উপর তোমাদেরই আপনজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কি কখনো কল্পনা করেছে, আমি আমার পীর ও মুরশিদ নুরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করব? কিন্তু পরিস্থিতি এমনই রূপ ধারণ করেছে যে, জঙ্গীর এই ছেলেটির মা আমাকে অভিসম্পাৎ করছে, আমি কেন তার মুরতাদ পুত্রকে হত্যা করছি না! আমার বন্ধুগণ! তোমরা যে বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছ, তাতে তোমাদের চাচাতো ভাই আছে, মামাতো ভাই আছে, খালাতো ভাই আছে। আমি এমন দুই আপন ভাই সম্পর্কেও জানি, যাদের একজন আমার বাহিনীতে আর অপরজন দুশমনের বাহিনীতে। তোমরা যদি রক্ত ও আত্মীয়তা সম্পর্ককে হৃদয়ে স্থান দাও, তাহলে ইসলামের সঙ্গে তোমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে, তা ছিন্ন হয়ে যাবে। রওনা হওয়ার আগে এখানেই তোমাদেরকে ওয়াদা করতে হবে, প্রতিপক্ষ কে তা তোমরা দেখবে না। তোমাদের দৃষ্টি থাকবে নিজেদের পতাকার উপর। তোমরা হৃদয়ে এই সত্যটাকে বসিয়ে নাও যে, তোমাদের সম্মুখের প্রতিপক্ষ লোকটি তোমাদের মতো কালেমা-গো মুসলমান ঠিক; কিন্তু তার পিছনের লোকগুলো খৃস্টান। আমি সেই ভাইকে ভাই মনে করি না, যে নিজ ধর্মের শত্রুকে বন্ধু মনে করে।

এক ঐতিহাসিকের হস্তলিখিত পান্ডুলিপি থেকে জানা যায়, এই ভাষণের মধ্যখানে এক পর্যায়ে সালাহুদ্দীন আইউবীর কণ্ঠ থেমে যায়। তিনি কিছুক্ষণ মাথা ঝুকিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করে। নীরব-নিস্তব্ধ গোটা সভাকক্ষ। কারো মুখে রা নেই।

খানিক পর সুলতান আইউবী মাথা তুলে দু'হাত উত্তোলন করে আকাশের

দিকে তাকিয়ে করুণ সুরে দু'আ করতে শুরু করেন–

'আমার মহান আল্লাহ! আমি তোমার খাতিরে, তোমার রাসূল ও তোমার দ্বীনের খাতিরে আমার ভাইদের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করছি। এটা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আমার আল্লাহ! আমাকে তোমার দিক-নির্দেশনা প্রয়োজন। আমি পাপী, আমি গুনাহগার। তুমি আমাকে পথ দেখাও।'

সুলতান আবারো মাথানত করে ফেললেন। নিজের মাথায় নতুন কোন বুদ্ধি আসল নাকি আল্লাহ'র পক্ষ থেকে তার মনে জাগল জানিনা, তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন– 'আমাকে প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস মুক্ত করতে হবে। বাইতুল মোকাদ্দাস তোমাদেরকে ডাকছে। আমার তরবারীর নীচে যদি আমার পিতাও আসেন, আমি তাকেও হত্যা করব। আমার সন্তানও যদি আমার মিশনের প্রতিবন্ধক হয়, তাকেও আমি খুন করে ফেলব।'

সুলতান আইউবীর মুখমন্ডল জ্বল জ্বল করে ওঠে। তার আবেগ দমে গেছে। এখন তিনি সেই সালাহুদ্দীন, যিনি শুধু বাস্তবভিত্তিক সংক্ষিপ্ত কথা বলে থাকেন। তিনি কমান্ডারদের বললেন– দু'দিন পর রাতে রওনা হতে হবে। তিনি পরিকল্পনা অনুসারে বাহিনীকে যেভাবে বিভক্ত করেছেন, তা সবাইকে জানিয়ে দেন এবং প্রতিটি গ্রুপের কমান্ডারদেরকে রওনা হওয়ার সময় বলে দেন। অগ্রগামী ইউনিটের কমান্ডারদেরকে জরুরী দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। কমান্ডো বাহিনীকে উপদেশ প্রদান করেন। পার্শ্ব বাহিনীগুলোর কমান্ডারদেরকে রওনা হওয়ার সময়, ধরন ও পথের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি সকলকে জানিয়ে দেন, তোমাদের হেডকোয়ার্টার ঘোরাফেরা করতে থাকবে। তিনি আগেই মিশরের পথে টহল বাহিনী পাঠিয়ে দেন এবং পথচারী ও যাযাবরের বেশে সেইসব এলাকায় অসংখ্য গুপ্তচর পাঠিয়ে দেন, যে পথে রেমন্ডের বাহিনীর আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

রসদের ব্যাপারে সুলতান আইউবীর কোন পেরেশানী নেই। অন্তত এক বছর মিশর থেকে রসদ ও রিজার্ভ ফোর্স তলব করার প্রয়োজন হবে না। বিপুল অস্ত্র এবং পশু তিনি দামেস্কে মজুদ করে রেখেছেন। তিনি মিশরের রাস্তার আশ-পাশে এই নির্দেশনাসহ অশ্বারোহী কমান্ডো প্রেরণ করে রেখেছেন যে, রেমন্ডের বাহিনী যদি এগিয়ে আসে, তাদের উপর গেরিলা হামলা চালাবে এবং আবশ্যক মনে করলে তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাঠাবে। আমরা খৃষ্টানদেরকে ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করব।

❁ ❁ ❁

১১৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখ রাতে অগ্রগামী বাহিনী দামেস্ক থেকে রওনা হয়। সে রাতে শীতের প্রকোপ ছিল খুব বেশী। তীব্র শীত গায়ে কাঁটার মত বিদ্ধ হচ্ছিল। তবে সুলতান আইউবীর সৈন্য ও ঘোড়া এই শীত সহ্য করতে অভ্যস্ত। অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডারকে বলে দেয়া হল, তত্ত্বাবধানকারী বাহিনী আগেই রওনা হয়ে গেছে। সে বাহিনীর সৈন্যরা সামরিক পোশাকে নয়– গেছে মুসাফিরের বেশে। সুলতান আইউবী তাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন, যেন দ্রুতগামী দূত পিছনে এসে অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডারকে সম্মুখের খবরাখবর পৌছাতে থাকে। অগ্রগামী বাহিনী যাবে হামাত পর্যন্ত। কমান্ডারকে সুলতান আইউবী বলে দিয়েছেন, হামাতের দুর্গ যুদ্ধ ছাড়া জয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু প্রতারণা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। তিনি যেন দুর্গ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেমে যান এবং দুর্গওয়ালাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন। জুরদিক যদি সন্ধি করতে চায়, তা হলে তাকে দুর্গের বাইরে ডেকে আনবে এবং সুলতানের এসে পৌছা পর্যন্ত কোন সমঝোতায় উপনীত না হয়।

শক্ত দেয়াল ভাঙ্গতে সক্ষম এমন অভিজ্ঞ একদল লোক সুলতান আইউবী আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। অগ্রগামী বাহিনীর রওনা হওয়ার তিন-চার ঘন্টা পর আরো দু'টি ইউনিটকে এমনভাবে রওনা করিয়েছেন যে, তাদের এক ইউনিট অগ্রগামী বাহিনীর ডানে এবং অপর ইউনিট বাঁয়ে অবস্থান নিয়ে চলবে। তাদের জন্য নির্দেশনা ছিল, অগ্রগামী বাহিনী যদি হামাত দুর্গ থেকে সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়, তাহলে তারা দু'দিক থেকে এগিয়ে গিয়ে দুর্গ অবরোধ করে ফেলবে এবং দুর্গের উপর এমনভাবে তীর বর্ষণ করবে, যেন দেয়াল ভাঙ্গার দলটি দেয়াল পর্যন্ত পৌছে যেতে পারে।

সুলতান আইউবী এই দুই বাহিনীর মাঝে অগ্রসর হচ্ছেন। অগ্রগামী বাহিনী ও দুই পার্শ্ব বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সুলতান আইউবীর মোট বাহিনীর চারভাগের একভাগ। অন্য সকল সৈন্যকে তিনি পিছনে রেখে এসেছেন। তিনি যত কম সংখ্যক সৈন্য দিয়ে সম্ভব দুশমনকে ঘায়েল করতে চান। সেই পরিকল্পনা তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছেন। শত্রুবাহিনীর রসদের প্রতি নজর রাখার জন্য তিনি কমান্ডো ছড়িয়ে রেখেছেন। হামাত থেকে অনেক সম্মুখেও এরূপ বেশ ক'টি ছোট ছোট দল পাঠিয়ে দিয়েছেন, যাতে হামাত থেকে কোন দূত হালব যেতে না পারে এবং কোন দিক থেকে শত্রুর সাহায্যে সৈন্য এসে গেলে কমান্ডো হামলা চালিয়ে তাদেরকে অস্থির করে রাখে এবং তাদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করে।

পরদিন অতিবাহিত হয়েছে। রাত গভীর হয়ে গেছে। অগ্রগামী বাহিনীর হামাত পৌঁছাতে আর দু-তিন মাইল পথ বাকি।

১১৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর। রাতের শেষ প্রহর। হামাত দুর্গের ফটকে দন্ডায়মান শান্ত্রী আবছা আলো-আঁধারীতে ছায়ার মত এমন কিছু দেখতে পায়, যেন বিপুলসংখ্যক মানুষ ও ঘোড়া। হয়ত কোন কাফেলা এগিয়ে আসছে।

ভোর হয়েছে। দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। অন্ধকার পুরোপুরি কেটে গেছে। শান্ত্রীরা এবার দেখতে পেল, ওরা সৈন্য। কিন্তু তাদের দুর্গের ডানে-বাঁয়ে যে ফৌজ রয়েছে, তা এখনো তারা টের পায়নি। ডংকা বাজিয়ে দেয়া হল। এক কমান্ডার দৌড়ে উপরে উঠে যায়। ফৌজ দেখে দৌড়ে গিয়ে সে দুর্গপতি জুরদিককে সংবাদ জানায়।

'ভয় পেওনা'– জুরদিক কমান্ডারকের বললেন– 'এরা আক্রমণকারী ফৌজ নয়। খৃস্টানরা আমাকে খুন করতে পারেনি। তারা অন্য কোন ষড়যন্ত্র করে থাকবে হয়ত। তারা হয়ত আস-সালিহ-এর নিকট থেকে এই অনুমোদন নিয়েছে যে, আমার থেকে দুর্গ ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দেবে। তোমরা বাইরে গিয়ে দেখ বাহিনীটা কার এবং তারা কী চায়।'

কমান্ডার ঘোড়ায় চড়ে বাইরে বেরিয়ে যায় এবং সুলতান আইউবীর অগ্রগামী বাহিনীর দিকে এগিয়ে যায়। পতাকা দেখেই চিনে ফেলে, এ তো আইউবীর বাহিনী! খানিক দূরে থাকতেই কমান্ডার থেমে যায়। আইউবীর অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডার তার নিকট এগিয়ে যায়। দু'জন-ই একে অপরকে চিনে ফেলে। তারা নুরুদ্দীন জঙ্গীর বাহিনীতে একসঙ্গে কাজ করেছে।

'আহ! এমন একটা সময়ও প্রত্যক্ষ করতে হল যে, আমাদের দু'জনকে পরস্পর লড়াই করতে হবে'– আইউবীর অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডার দুর্গের কমান্ডারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল– 'জঙ্গী যখন জীবিত ছিলেন, আমরা তখন বন্ধু ছিলাম। তিনি মারা গেছেন, তো আমরা পরস্পর দুশমন হয়ে গেলাম।'

'তোমরা কেন এসেছ?' দুর্গের কমান্ডার জিজ্ঞেস করে।

'তোমরা দুর্গকে রক্ষা করতে পারবে না'– অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডার বললেন– 'তোমার প্রতি আমার পরামর্শ, দুর্গের অধিপতিকে বল, যেন তিনি দুর্গটা আমাদের হাতে তুলে দেন এবং রক্তক্ষয় হতে না দেন। আমরা তোমাদেরকে বেশী সময় দিতে পারব না। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুর্গ অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। আমরা তোমাদের সাহায্য-সহযোগিতার সব পথ বন্ধ করে এসেছি।

তোমরা অস্ত্রত্যাগ কর।'

দুর্গের কমান্ডার কোন জবাব না দিয়েই ফিরে যায়। জুরদিককে জানায়, সালাহুদ্দীন আইউবী হামলা করেছেন। তিনি আমাদেরকে অস্ত্রত্যাগ করতে বলছেন। এই বাহিনী তাঁরই। জুরদিক চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'দুর্গ থেকে পতাকা সরিয়ে ফেল। সাদা পতাকা উড়িয়ে দাও। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এসেছেন।'

জুরদিক দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। ঘোড়ায় চড়ে দুর্গ থেকে অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডারের নিকট চলে যান। সুলতান আইউবী অনেক পিছনে অবস্থান করছেন। জুরদিক একজন রাহবার ও তার দেহরক্ষীদের নিয়ে সুলতান আইউবীর হেডকোয়ার্টারের দিকে রওনা হয়ে যান।

✿ ✿ ✿

সুলতান আইউবী জুরদিককে বুকে জড়িয়ে ধরেন। জুরদিক সুলতানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেগময় কিছু কথা বলেন এবং সৈন্যসহ দুর্গকে সুলতান আইউবীর হাতে তুলে দেন। সুলতান আইউবী তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করেন এবং সাদা পতাকার স্থলে নিজের ঝান্ডা উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। জুরদিক দুর্গে অবস্থানরত তার বড়-ছোট সব কমান্ডারকে সুলতান আইউবীর সম্মুখে উপস্থিত করে বললেন– 'তোমাদেরকে পরাজিত করা হয়নি। তোমরা যার যার ইউনিটের সৈন্যদেরকেও বলে দাও, তারা যেন নিজেদেরকে পরাজিত মনে না করে। আমরা সবাই মুসলমান। এখন আমরা খৃস্টান ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।'

সম্মুখে হেম্‌স দুর্গ। সুলতান আইউবী রওনা হওয়ার জন্য এমন একটা সময় নির্ধারণ করেন যে, হেম্‌স গিয়ে পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে। তিনি এই অগ্রগামী বাহিনীটিকেই সম্মুখে রওনা করিয়ে দেন। এবার তিনি সেনাবিন্যাসে কিছু রদবদল করেন। কারণ, হেম্‌স দুর্গ যুদ্ধ ব্যতীত জয় হবে, এমন আশা তাঁর নেই। খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য একটি দলকে তিনি আগেই রওনা করিয়ে দিয়েছিলেন। ফিরে এসে তারা সুলতানকে দুর্গের অবস্থান ও আশ-পাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে। যেসব দিক থেকে শত্রুপক্ষের সাহায্য আসার সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব দিকেও তিনি বাহিনী প্রেরণ করে রেখেছেন। নিজের রসদ তিনি হামাত দুর্গে জড়ো করে রাখেন এবং রসদ সরবরাহের পথকে টহল বাহিনী ও কমান্ডারদের দ্বারা নিরাপদ করে রাখেন। তাদের সঙ্গে হামাতের একটি ইউনিটও রয়েছে। সুলতান আইউবীর প্রচেষ্টা

ছিল, এই অভিযানের সংবাদ যাতে হাল্‌ব পর্যন্ত না পৌঁছে। তাহলে তিনি দুশমনকে তাদের অজ্ঞাতেই কাবু করে ফেলতে পারবেন। অভিযানের ব্যবস্থাপনাটা তিনি এভাবেই করে নিয়েছেন। তিনি হাল্‌বের পথে নিজের লোক ছড়িয়ে রেখেছেন, যাদের প্রতি নির্দেশ হল, সৈনিক বা সাধারণ কাউকে পালাতে দেখলে আক্রমণ করে হলেও তাকে প্রতিহত করবে।

রাত গভীর হয়ে গেছে। হেম্‌স দুর্গের অধিপতি ও তার কমান্ডাগণ প্রশস্ত একটি কক্ষে সুরাপানে ব্যস্ত। সঙ্গে আছে দু'জন নর্তকী। কক্ষে বাদ্য-বাজনা ও নাচ-গান চলছে। সাধারণ সৈনিকরা অবচেতন মনে নিদ্রা যাচ্ছে। প্রহরারত সৈনিকরাও শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আড়ালে-আবডালে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। কনকনে শীত। কমান্ডার সবাইকে জানিয়ে রেখেছে, শীতের মওসুমে যুদ্ধের কোন আশংকা নেই।

'আমরা এ কারণেই নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর জন্য দু'আ করতাম যে, দুনিয়াতেই আমরা জান্নাতের সুখ উপভোগ করব'– দুর্গের অধিপতি মদের পেয়ালা মুখে দিতে দিতে বলল– 'এখন সালাহুদ্দীন আইউবী এসেছেন। আল্লাহ তাকেও জলদি তুলে নেবেন।'

'না, তাকে আমরা তুলে আনব'– এক কমান্ডার বলল- 'ঋতুটা একটু পরিবর্তন হোক।'

দুর্গের দেয়ালে দন্ডায়মান এক শান্ত্রী তার সঙ্গীকে বলল– 'এই দেখ, দেখ, আগুন জ্বলছে।'

'জ্বলতে দাও'– সঙ্গী বলল– 'কোন কাফেলা হবে বোধ হয়।'

বলতে না বলতে আগুনের তিন-চারটি গোলা উপরে উঠে দুর্গের দিকে ধেয়ে এসে শান্ত্রীদের মাথার উপর দিয়ে অতিক্রম করে দুর্গের ভিতর গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পরক্ষণে আরো একটি গোলা ধেয়ে আসে। তারপর আরো কয়েকটি। সব ক'টি-ই দুর্গের সামান-পত্রের উপর গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং আগুন ধরে যায়। দুর্গে বিপদ ঘন্টা বেজে ওঠে। দুর্গ অধিপতির আসর ভেঙ্গে যায়। সবাই জান্নাতের সুখ ত্যাগ করে দৌড়ে ফটকের দিকে ছুটে আসে। এবার তীরবর্ষণ চলছে তাদের উপর। ফটকের শান্ত্রীরা চীৎকার ও হৈ-হুল্লোড় শুরু করে দেয়– 'ফটক পুড়ে যাচ্ছে'। সুলতান আইউবীর আক্রমণকারী সৈন্যরা ফটকের উপর দাহ্য পদার্থ ছুড়ে মেরে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। শান্ত্রীরা চীৎকার করে দুর্গের সৈন্যদেরকে জাগ্রত করে। দুর্গের ভিতর থেকেও প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বাহির থেকে এত তীর আসতে থাকে যে, মাথা উত্তোলন করাও সম্ভব হচ্ছে না।

সুলতান আইউবীর মিনজানীকগুলো দুর্গটাকে জাহান্নামে পরিণত করে তোলে। দুর্গের কমান্ডার চীৎকার করে করে তার সৈন্যদের মনোবল বাড়াবার চেষ্টা করছে। সৈন্যরা এলোপাতাড়ি তীর ছুঁড়ছে।

'অস্ত্রসমর্পন কর'– সুলতান আইউবীর দিক থেকে একজন উচ্চকণ্ঠে বলতে শুরু করে– 'তোমরা অস্ত্রত্যাগ কর। তোমরা কোন দিক থেকে সাহায্য পাবে না। জীবন রক্ষা কর। তোমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে আত্মসমর্পন কর। কাউকে যুদ্ধবন্দি বানানো হবে না। তোমরা সুলতানের আনুগত্যবরণ করে নাও। আমাদের ফৌজে শামিল হয়ে যাও।'

রাতভর এই ঘোষণা চলতে থাকে এবং উভয় পক্ষে তীর বিনিময় হতে থাকে। পরদিন ভোরের আলো ফুটলে দুর্গপতি বাইরের দৃশ্য ও দুর্গের ফটকে তার সৈনিকদের লাশ দেখে সাদা পতাকা উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করে। সুলতান আইউবী এই দুর্গও দখল করে নেন। দুর্গপতি ও তার কমান্ডারগণ অস্ত্রত্যাগ করে। সুলতান দুর্গের অভ্যন্তরে ঢুকে দুর্গপতি ও কমান্ডারদের উদ্দেশ করে শুধু বললেন– 'আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।' তিনি নির্দেশ প্রদান করেন, সিপাহীদেরসহ এদেরকে দামেস্ক পাঠিয়ে দাও। সুলতান তদেরকে নিজের ফৌজের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারবেন না। কারণ, তাদের অফাদারী এখনো সন্দেহযুক্ত। এই দুর্গে অস্ত্র ও রসদের বিপুল সংগ্রহ। আছে মদ আর নর্তকী। মদের পাত্রগুলো বাইরে ফেলে দেয়া হল। নর্তকীদেরকে তাদের লোকদের সঙ্গে দামেস্ক পাঠিয়ে দেয়া হল। সুলতান আইউবী হেম্‌সের দুর্গকে তার দ্বিতীয় ঘাঁটিতে পরিণত করেন।

সামনে হাল্‌বের দুর্গ। এটি হাল্‌ব শহর থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত। এখানেও হেম্‌সের ন্যায় একই ঘটনা ঘটে। সুলতান আইউবীর হামলা ছিল আকস্মিক। তিনি এই দুর্গের লোকদেরকেও সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে যান। পর পর দু'টি দুর্গ জয় করার পর তার বাহিনীর মনোবল এখন অনেক চাঙ্গা। তারা হাল্‌বের দুর্গও জয় করে নেয় এবং সেখানকার সৈনিকদেরকে কমান্ডারদেরসহ দামেস্ক পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এ পর্যন্ত এসে সুলতানের গোপনীয়তা শেষ হয়ে যায়। অস্ত্রসমর্পনকারী সিপাহীদের কেউ পালিয়ে গিয়ে কিংবা অন্য কেউ হাল্‌ব গিয়ে সংবাদ জানিয়ে দেয় যে, সুলতান আইউবী হামাত, হেম্‌স ও হাল্‌ব দুর্গ জয় করে এখন হাল্‌ব শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু এই তথ্য সুলতান জানতেন না। তিনি অগ্রসরতার গতিও কমিয়ে দেন। তার কারণ, যে বাহিনী হামাত, হেম্‌স ও হাল্‌ব দুর্গকে অবরোধ করে

রাতের বেলা লড়াই করেছে, তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন এবং আগে প্রেরণের জন্য তাদের স্থলে নতুন বাহিনী আবশ্যক। এখন পরিবর্তিত বিন্যাসে সৈন্যদের সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। কেননা, হাল্‌ব শহরের লড়াই দুর্গ অবরোধ থেকে ভিন্ন। নতুন বিন্যাসে কিছু সময় ব্যয় হয়ে যায়। সুলতান আইউবী অত্যন্ত সতর্ক মানুষ। তিনি জানেন, আসল লড়াই সামনে রয়ে গেছে। আবার খৃস্টান বাহিনীর এসে পড়ার আশংকাও রয়েছে।

❁ ❁ ❁

হাল্‌বে সংবাদ পৌঁছে গেছে। খৃস্টান উপদেষ্টাগণ সেখানে উপস্থিত। তারা প্রথমে বিস্ময় প্রকাশ করে যে, সুলতান আইউবী এই শীতের মধ্যে হামলা করলেন! পরে তারা এই ভেবে সন্তোষ প্রকাশ করে যে, সুলতানের ফৌজ মরুযুদ্ধে অভ্যস্ত। তারা পার্বত্য এলাকায় লড়াই করে জিততে পারবে না। আবার তাদের এই অনুভূতিও আছে যে, হাল্‌বের সৈন্যও এ অঞ্চলে লড়তে পারবে না। তারা দু'টি পন্থা নিয়ে ভাবে। এক. সুলতান আইউবীকে তাদের-ই মনঃপুত স্থানে যুদ্ধে লিপ্ত করাতে হবে। দুই. এখানে খৃস্টানদের সেই বাহিনীটিকে নিয়ে আসতে হবে, যারা ইউরোপ থেকে এসেছে। এদের অধিকাংশ সৈন্য-ই রেমন্ডের বাহিনীতে কর্মরত। সিদ্ধান্ত মোতাবেক দ্রুতগামী দূতের মাধ্যমে রেমন্ডকে সংবাদ পৌঁছানো হল, সুলতান আইউবী হাল্‌বের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তাকে পিছন দিক থেকে ঘিরে ফেলা হোক।

রেমন্ড যাতে সময় থাকতে এসে পৌঁছুতে পারে, সে জন্য তারা কালক্ষেপণের পন্থা অবলম্বন করে যে, সুলতান আইউবীকে হাল্‌ব অবরোধে দীর্ঘ সময় আটকে রাখতে হবে। খৃস্টান উপদেষ্টাগণ গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করে। তাদের জানা আছে যে, শহরে সুলতান আইউবীর গুপ্তচর রয়েছে। তাই তারা শহরটা সম্পূর্ণ সীল করে দেয়। তারা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে দেয়, যদি কেউ শহর থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে সাবধান না করেই তীর ছুঁড়বে। সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে মসজিদেও ঘোষণা করে দেয়া হয় যে, সুলতান আইউবী সামরিক শক্তি ও রাজত্বের নেশায় হাল্‌ব আক্রমণ করেছেন। খৃস্টানরা নাশকতার ওস্তাদ। তারা নতুন নতুন পন্থায় প্রোপাগান্ডা চালাতে শুরু করে। ঘরে ঘরে, গলিতে গলিতে, মসজিদে মসজিদে গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, সুলতান আইউবীর ফৌজ যে শহর জয় করে, সেখানকার সকল যুবতী মেয়েদের একত্রিত করে তারা তাদের সম্ভ্রম ছিনিয়ে নেয়। মানুষের সহায়-সম্পদ লুট করে শহরে আগুন

ধরিয়ে দেয়। এ কথাও প্রচার করা হয় যে, সুলতান আইউবী নবুওতের দাবি করেছেন এবং একটি নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছেন, যা সম্পূর্ণ কুফ্‌রী।

এমন বহু গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয় হাল্‌বের সর্বত্র। এমনিতেই সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির তৎপরতা বিগত ছয় মাস যাবত চলে আসছে। জনমনে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বশেষ এসব তাজা প্রোপাগান্ডা জনগণকে অগ্নিশর্মা করে তোলে। তারা জীবন দিতে ও জীবন নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

শহর সীল হওয়ার কারণে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দারা বেকার হয়ে পড়ে। তারা শহরের অধিবাসীদের মধ্যে আইউবী বিরোধী রোষ ও ক্রোধ প্রত্যক্ষ করে। এক গোয়েন্দা শহর থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করে প্রাণ হারিয়েছে। সে সুলতান আইউবীকে এই সংবাদ পৌঁছাতে চেয়েছিল যে, শহরের পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল নয় এবং তিনি যেন আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হয়ে না আসেন। সে শহর থেকে বের হওয়ার জন্য ঘোড়া হাঁকায়। কিন্তু দু'টি তীর তাকে কাবু করে ফেলে। আইউবীর গোয়েন্দাদের কমান্ডার নাগরিকদের মধ্যে খৃস্টানদের প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছিলেন বটে; কিন্তু তার লোকেরা কোথাও মুখ খুলতে পারেনি।

আস-সালিহ খৃস্টান উপদেষ্টাদের পরামর্শে মসুলের গভর্নর সাইফুদ্দীনের নিকটও সাহায্যের আবেদন জানান। হাসান ইবনে সাব্বাহ'র ফেদায়ীদের গুরু শেখ সান্নান-এর নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হয়, দাবি অনুপাতে পারিশ্রমিক দেয়া হবে, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীকে যেভাবে হোক খুন করে দিন। শেখ সান্নানের আইউবী হত্যার একটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। সুলতান আইউবীর একজন দেহরক্ষীকে নেশা খাইয়ে সে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। এবার সে তার এমন ফেদায়ীদের তলব করে, যারা জীবন ও মৃত্যুকে কিছু-ই মনে করে না। তারা নামেমাত্র মানুষ। নিজের জীবন দেয়া ও অন্যের জীবন নেয়া তাদের পক্ষে ডাল-ভাত। তাদের মধ্যে অনেক পলাতক খুনীও রয়েছে। শেখ সান্নান তাদেরকে বলল, পারিশ্রমিক যা চাও, দেব; সুলতান আইউবীকে হত্যা করে আস। নয়জন ফেদায়ী একাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

আস-সালিহ-এর সমর্থকদের মধ্যে সবচে' হিংসুক ও শয়তান প্রকৃতির মানুষ হল গোমস্তগীন। একজন গবর্নরের সমান মর্যাদা তার। লোকটা বাহ্যত সুলতান আইউবীর বিরোধী বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বন্ধু কেউ-ই নয়। আস-সালিহকে খুশি করার জন্য তাকে সহযোগিতা প্রদান করে এবং খৃস্টানদের সঙ্গে

বন্ধুত্ব এভাবে প্রকাশ করে যে, তার দুর্গে অনেক খৃস্টান সৈন্য বন্দি ছিল, তাদের সকলকে মুক্ত করে দেন। এখনো সে সুলতান আইউবী দ্বারা হাল্‌ব আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পেয়ে বাহিনী প্রেরণ করেন এবং নিজেও যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সুলতান আইউবীর জন্য এ এক মহা-বিপদ। অল্প ক'জন সৈন্য দিয়ে এত বিশাল শত্রুবাহিনীর মোকাবেলা তিনি কীভাবে করবেন! তদুপরি বর্তমানে তাঁর গোয়েন্দারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার ফলে তিনি জানতে-ই পারছেন না, হাল্‌বে দুশমনের ক্যাম্পে কী হচ্ছে। এখনো তিনি এই আত্মপ্রচঞ্চনায় লিপ্ত যে, হাল্‌বকেও তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে দখল করে নেবেন। কিন্তু আশার কথা হল, সুলতান আনাড়ি যোদ্ধা নন। তিনি বাহিনীর পেছন ও দু'পার্শ্ব রক্ষা করার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তদারককারী দল সামনে এগিয়ে গেছে। সম্মুখের এলাকা টিলাময়, পাথুরে ও উঁচু-নীচু। পথে মাঝারী আকারের একটি নদী।

১১৭৫ সালের জানুয়ারী মাস শুরু হয়ে গেছে। শীতের তীব্রতা বেড়ে গেছে আরো। সুলতান আইউবী যুদ্ধের জন্য তাঁর মোট সেনাবাহিনীর চার ভাগের এক ভাগ ময়দানে নিয়ে এসেছেন। অধিকাংশ সৈন্যকে তিনি রিজার্ভ রেখে এসেছেন। তিনি যখন হাল্‌বের উদ্দেশ্যে রওনা হন, তখন গোয়েন্দারা সংবাদ দেয়, নদীর ওপারে বিশাল-বিস্তৃত এক মাঠে শত্রুবাহিনী প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করছে। সুলতান আইউবীকে এ পথেই নদী পার হতে হবে। শীত মওসুমের কারণে নদীতে পানি কম। এ জায়গাটায় আরো কম। মানুষ ও ঘোড়া পানি ভেঙ্গে অনায়াসে নদীটা পার হতে পারবে। দুশমন এ জায়গাটায়ই তাদের সেনাদের ছড়িয়ে রেখেছে। গোয়েন্দারা সুলতান আইউবীকে জানায়, রাতে শত্রু বাহিনীর কয়েকজন শান্ত্রী জেগে পাহারা দেয় আর দিনে টহল বাহিনী চারদিক ঘুরে বেড়ায়।

এ সংবাদে সুলতান আইউবীর মনে সন্দেহ জাগে, তাহলে কি হাল্‌ববাসীরা আমার আগমন সংবাদ জেনে ফেলল! তবে তো তাদের অজ্ঞাতসারে হাল্‌ব জয় করা সম্ভব হবে না! তিনি অন্য কোন স্থান দিয়ে নদী পার হওয়া যায় কিনা তথ্য নেয়ার জন্য আবার গোয়েন্দা প্রেরণ করেন। পাশাপাশি তিনি এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন, ওপারের শত্রুবাহিনীকে ধোঁকা দিতে হবে যে, আমার আক্রমণ ও অগ্রযাত্রা এ পথেই হবে। তিনি সে রাতেই কমান্ডো বাহিনী রওনা করিয়ে দেন। তাঁর নিজের হেডকোয়ার্টার সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে। নদীর তীরে

দুশমনের যে ফৌজ অবস্থান করছে, তারাও এই আত্মপ্রচঞ্চনায় লিপ্ত যে, এত তীব্র শীতের রাতে কেউ হামলা করবে না।

তখন মধ্যরাত। হাল্‌বের সৈন্যরা নিজ নিজ তাঁবুতে জবুথবু হয়ে পড়ে আছে। কমান্ডার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছে। জেগে আছে শুধু কয়েকজন প্রহরী। এক প্রহরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করছে। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন তার ঘাড় ঝাপটে ধরে। অন্য একজন এসে দু'জনে মিলে লোকটাকে তুলে নিয়ে যায়। এরা সুলতান আইউবীর কমান্ডো। তারা প্রহরীকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের ঘোড়ার পাল কোথায়? কমান্ডোরা প্রহরীর বুকে দু'টি তরবারীর আগা ঠেকিয়ে রেখেছে। প্রহরী বুঝে ফেলেছে, এরা সুলতান আইউবীর সৈনিক। সে বিনীত কণ্ঠে বলল, আমি তোমাদের মুসলমান ভাই। যুদ্ধটা হচ্ছে রাজ-বাদশাহদের বিবাদ। আমরা কেন পরস্পর রক্ত ঝরাব?

প্রহরী জানায়, ঘোড়াগুলো এক স্থানে বাঁধা নেই। ফৌজ প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। সে কারণে সৈন্যদের তাঁবুর সঙ্গে দু'-তিনটি করে ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছে।

কমান্ডোরা প্রহরীকে তাদের ক্যাম্পের নিকট নিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, কমান্ডাররা কে কোথায় আছে বল। প্রহরী অনুমানের ভিত্তিতে কমান্ডারদের তাঁবুর অবস্থান দেখিয়ে দেয়।

প্রহরীকে পিছনে সরিয়ে আনা হল এবং বলা হল, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তামাশা দেখ।

সেখানে ছোট আকারের একটি মিনজানীক ছিল। কমান্ডোরা তাতে একটি পাতিল বসিয়ে দেয়। চারজন লোক ওটিকে একটু পিছনে টেনে নিয়ে ছেড়ে দেয়। পাতিলটা গুলির ন্যায় উড়ে যায়। আরেকটি পাতিল ছোঁড়া হয় অন্যদিকে। তারপর আরো দু'টি। সবগুলো গিয়ে দুশমনের ক্যাম্পে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রহরীরা 'কে? কে?' বলে চীৎকার জুড়ে দেয়। কোন্‌দিক থেকে যেন মাথায় সলিতাগাঁথা তীর এসে মাটিতে পড়ে। পাতিলগুলো এখানেই এসে পড়ে ভেঙ্গেছিল। ভাঙ্গা পাতিলের ভিতর থেকে তরল পদার্থ বের হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এগুলো দাহ্য পদার্থ। তীরের সলিতাগুলো তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। দু'টি তাঁবুতেও আগুন ধরে যায়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। ক্যাম্পে শোর-গোল, ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়। ঘোড়াগুলো রশি ছিড়ে পালাতে থাকে। সৈন্যরা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি শুরু করলে কমান্ডোরা তীর ছুঁড়তে শুরু করে। দৈর্ঘ-প্রস্থে এক মাইলেরও বেশী জায়গা জুড়ে তাঁবু। কমান্ডার জবাবী অভিযান

শুরু করতে না করতে সুলতান আইউবীর কমান্ডোরা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে ক্যাম্পের অবস্থা। বিপুল ক্ষতিসাধণ করেছে আগুন। তার উপর কমান্ডোদের তীর আর ভীত-সন্ত্রস্ত অশ্বপালের পায়ের তলায় পিষে হতাহত হয়েছে অসংখ্য সৈনিক। অবস্থা সামলাতে তাদের ভোর হয়ে যায়। হঠাৎ একদিক থেকে এক ব্যক্তি চীৎকার করে ওঠে– 'সাবধান! সাবধান!' পুনরায় প্রলয় শুরু হয়ে যায়। এবার কমান্ডো নয়-হামলা করেছে সুলতান আইউবীর বাহিনীর একটি ইউনিট। দুশমন এখানে প্রতি মুহূর্ত প্রস্তুত থাকে। কিন্তু রাতের কমান্ডোরা তাদের অবস্থা এমনই শোচনীয় করে এসেছে যে, তাদের সব প্রস্তুতি লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। তারা পুনঃসংগঠিত হয়ে লড়াই করার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু আর স্থির হতে পারেনি তারা। সুলতান আইউবী তাদের শক্তি-সাহস আগেই শেষ করে দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও উভয় পক্ষের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। শত্রুবাহিনী পিছু হটতে শুরু করে। কমান্ডাররা তাদের উজ্জীবিত করার বহু চেষ্টা করে। কিন্তু কোন কাজ হল না। সুলতান আইউবীর কমান্ডোরা তাদের উদ্দেশে চীৎকার করে বলতে থাকে– 'তোমরা কাফেরদের বন্ধু। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা নিজেদের পরিণতি দেখ। তোমাদের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হচ্ছে।'

সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিকের মাথায়ও এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আর কাফেরদের বন্ধুরা মুরতাদ। তার বিপরীতে খলীফার বাহিনীর কাছে এরূপ কোন লক্ষ্য বা কোন স্লোগান ছিল না।

শত্রুবাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। অনেকে পিছপা হয়ে নদী পার হয়ে পালিয়ে গেছে। অনেকে এদিক-ওদিক গিয়ে লুকিয়ে গেছে। সুলতান আইউবী তাঁর আক্রমণকারী বাহিনীর কমান্ডারকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, দুশমন যদি পিছু হটে যায়, তাহলে তোমার বাহিনী বা কোন সৈন্য যেন নদী পার না হয়। তিনি এই ক্যাম্পের উপর হামলা করে মূলত শত্রুকে ধোঁকা দিয়েছেন। তিনি শত্রুদেরকে ধাওয়া করতে চাচ্ছেন না। সামনের বিস্তারিত তথ্য না নিয়ে তিনি আর অগ্রসর হবেন না। দূরের অন্য কোন স্থান দিয়ে তিনি নদী পার হতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু দুশমন যখন এখান দিয়েই তাঁকে সুযোগ দিয়ে দিল, তখন তিনি এখান দিয়েই নদী অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি নিজে সম্মুখে এগিয়ে যান। তাঁর সৈনিকরা এদিক-ওদিক লুকিয়ে থাকা শত্রুসেনাদের

খুঁজে খতম করছে। অস্ত্রসমর্পনকারীদের সংখ্যাও অনেক। সুলতান একটি উঁচু টিলার উপর চড়ে রণাঙ্গনের দৃশ্য অবলোকন করছেন। আনন্দের পরিবর্তে তার মুখমন্ডল বিষাদে ছেয়ে গেছে।

'এ দৃশ্য দেখে হয়ত আল্লাহও কাঁদছেন'– পার্শ্বে দন্ডায়মান নায়েবদের উদ্দেশে সুলতান বললেন– 'উভয় পক্ষে এ কাদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে? এ হল ইসলামের পতনের আলামত। মুসলমান যদি হুঁশে না আসে, তাহলে কাফেররা তাদেরকে এভাবেই যুদ্ধ করিয়ে করিয়ে শেষ করে দেবে। আমার বন্ধুগণ! তোমরা আমাকে নিশ্চিত কর যে, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই। আমি আমার তরবারীটা আস্-সালিহ্-এর পায়ের উপর ফেলে দেই।'

'আপনি অবশ্যই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মোহ্তারাম সুলতান'– এক নায়েব বললেন– 'আমরাও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আপনি মন থেকে সব সংশয়-সন্দেহ দূর করে ফেলুন।'

সুলতান আইউবীর বাহিনী নদী পার হয়ে গেছে। সম্মুখে হাল্ব নগরী দেখা যাচ্ছে। সুলতান নগরীর প্রতি তাকান। তার বিস্তৃতি, গঠন প্রণালী ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখে ভাবেন, সরাসরি হামলা করে শহরের অভ্যন্তরে ঢুকে লড়াই করব নাকি অবরোধ করব। শহরের আভ্যন্তরীণ অবস্থাটা আসলে কী, তা এখনো তাঁর অজানা। হাল্বের সাধারণ মানুষগুলো তাঁর বিপক্ষে এক একটা আগুনের ফুল্কি হয়ে আছে, তা তিনি জানেন না। তাঁর আশা ছিল, যেহেতু তারা মুসলমান, তাই জনগণ যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে। সম্ভবত আশাবাদ-ই তাঁকে দিয়ে এমন কিছু কাজ করায়, যা তাকে অস্থির করে ফেলে। তিনি আধা অবরোধের বিন্যাসে তাঁর বাহিনীকে সম্মুখে এগিয়ে দেন। যুদ্ধের সূচনা হয় তীর বিনিময়ের মাধ্যমে। কিন্তু খানিক পর-ই তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর বাহিনী পিছনে সরে আসছে। হাল্বের নিরাপত্তা বিধানে একদিক থেকে অন্তত দু'শত ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে আসে। তারা সুলতান আইউবীর এক পদাতিক ইউনিটের এক পার্শ্বের উপর আক্রমণ চালায়– বড় তীব্র ও দুঃসাহসী আক্রমণ।

সুলতান আইউবীর অশ্বারোহী বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করে তাদের পদাতিক বাহিনীকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে নিজেদের-ই সৈন্য মারা যায়। তারপর পরিস্থিতি এই দাঁড়ায় যে, শহর থেকে পদাতিক কিংবা অশ্বারোহী এক একটি সেনাদল বেরিয়ে আসছে আর তাদের পিছনে পিছনে শহরের উঁচু উঁচু স্থান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসছে। এই তীরবৃষ্টির আড়ালে আক্রমণকারী সেনারা সুলতান আইউবীর বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে

পড়ছে। হাল্‌বের এই যুদ্ধ ছিল বড়ই রক্তক্ষয়ী।

এই অবস্থায় সুলতান আইউবীর দু'-তিনজন গোয়েন্দা শহর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং সুলতানকে খুঁজে বের করে তাঁর নিকট চলে যায়। হাল্‌বের জনসাধারণকে কীভাবে উত্তেজিত করা হয়েছে, তারা সুলতানকে তা অবহিত করে। তারা জানায়, শহর প্রতিরক্ষায় যত না সৈন্য যুদ্ধ করছে, তার চেয়ে বেশি করছে সাধারণ নাগরিক। এ মুহূর্তে আপনার মোকাবেলায় সৈন্যের চে' জনসাধারণের সংখ্যা বেশী। সুলতানের শুধু এটুকু জানা ছিল যে, হাল্‌বের অধিবাসীদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তারা যে তাঁর বিরুদ্ধে এমন উন্মাদনার সাথে লড়াই করবে, সে ধারণা তার ছিল না। সুলতান তাদের বীরত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে আফসোসের সুরে বললেন– 'এ হল মুসলমানের শান! এই হল মুসলমানদের সামরিক চেতনা! কিন্তু কাফেররা তাদের এই চেতনাকে তাদের-ই দ্বীন-ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে; কিন্তু তারা তা বুঝছে না।'

সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীকে পিছনে সরিয়ে আনেন। এক নায়েব তাঁকে পরামর্শ দিলেন, শহরের উপর মিনজানীক দ্বারা অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করা হোক। কিন্তু সুলতান তাঁর পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে বললেন– 'তা করা হলে সাধারণ মানুষদের বাড়ী-ঘর পুড়ে যাবে। নারী ও শিশুরা মারা যাবে। শহরটা যদি খৃস্টানদের হত, তাহলে এতক্ষণে নগরীর সর্বত্র দাউ দাউ করে আগুন জ্বলত এবং তা আমার কমান্ডোদের আয়ত্তে চলে আসত। যেসব মুসলমান ময়দানে এসে যুদ্ধ করে ও জীবন দেয়, আমি তাদেরকে ঠেকাতে পারি না আর যারা ঘরে বসে আছে, তাদেরকে হত্যা করতে পারি না।

সুলতান আইউবী আরো কয়েকটি ইউনিটকে সামনে ডেকে এনে শহরকে পরিপূর্ণরূপে অবরোধ করে ফেলেন এবং নির্দেশ জারি করেন, আপতত আমরা আত্মরক্ষামূলক লড়াই করব। আমাদের উপর যদি হামলা হয়, তাহলে তা প্রতিহত করব এবং অবরোধ শক্তভাবে ধরে রাখব। সুলতান আইউবীর সেনা সংখ্যাও কম, শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করাও তাঁর লক্ষ্য।

১১৭৫ সালের জানুয়ারী পুরো মাসটা অবরোধ বহাল থাকে। হাল্‌বের ফৌজ ও জনসাধারণ অবরোধ ভাঙ্গার জন্য হামলা চালায়। কিন্তু তারা সফল হতে পারছে না।

১লা ফেব্রুয়ারী ভোরবেলা সুলতান আইউবী সংবাদ পান, ত্রিপোলীর খৃস্টান সম্রাট রেমন্ড হামাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি রেমন্ডের সৈন্য সংখ্যা

সম্পর্কেও অবহিত হন। এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, সে ব্যাপারে সুলতান আইউবীর আগে থেকেই ধারণা ছিল। তার মোকাবেলার প্রস্তুতিও তিনি নিয়ে রেখেছেন। তিনি তার জন্য দু'ইউনিট সৈন্য রিজার্ভ রেখে দিয়েছেন এবং এমন্ জায়গায় রেখেছেন, যেখান থেকে রেমন্ডকে স্বাগত জানানোর জন্য তাদের সময়মত পৌঁছানো সম্ভব। সুলতান সংবাদটা পাওয়ামাত্র তাদের নিকট দূত প্রেরণ করেন– 'যত দ্রুত সম্ভব তোমরা আলরিস্তান পৌঁছে গিয়ে উঁচুতে তীরন্দাজদের বসিয়ে দাও। অশ্বারোহী বাহিনীকে পিছনে রাখবে। আমি আসছি। খৃস্টান বাহিনী যদি আমার আগে পৌঁছে যায়, তাহলে তোমরা মুখোমুখি যুদ্ধের ঝুঁকি নেবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত ওঁৎ পেতে গেরিলা হামলা চালিয়ে যাবে।'

আলরিস্তান একটি পর্বতশ্রেণীর নাম। রেমন্ডকে তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। তার পরিকল্পনা অনুপাতে এই পথ তার জন্য খুবই উপযোগী। হামাত এসে সুলতান আইউবীর বাহিনীকে পিছন ভাগ ও রসদ ইত্যাদির পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে, এই হল তার পরিকল্পনা। তাতে সফল হলে সুলতান আইউবী হাল্‌বের ফৌজ ও রেমন্ডের বাহিনীর মধ্যখানে আটকা পড়ে যাবেন। কিন্তু সুলতান আইউবী হাল্‌ব অবরোধ প্রত্যাহার করে বাহিনীকে অন্য একদিকে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে আলরিস্তানের দিকে রওনা হয়ে যান।

আলরিস্তানের পাহাড়ের চূড়াগুলো বরফে ঢাকা। রেমন্ড আনন্দিত যে, এই মওসুমে সুলতান আইউবীর মরু সৈনিকরা তার ইউরোপিয়ান ও অত্র অঞ্চলের খৃষ্টান সেনাদের সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠবে না। কিন্তু এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে যখন সে একটু সামনে অগ্রসর হল, তো বরফঢাকা পর্বতমালার চূড়া থেকে তার বাহিনীর উপর তীর বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। ঘটনাটা তার কাছে নিতান্তই আকস্মিক ও অভাবিতপূর্ব।

রেমন্ড কোন যুদ্ধ ছাড়াই তার বাহিনীকে পিছনে সরিয়ে নিয়ে যায়। সর্বত্র-ই তার আক্রান্ত হওয়ার আশংকা। সুলতান আইউবীর যুদ্ধকৌশল তার ভালভাবেই জানা। অনেক দূর পিছনে সরে গিয়ে সে ছাউনি ফেলে। এবার কোন্ পথে এগুবে, ভাবতে শুরু করে সে।

ঋতু পাল্টে গেছে। বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। সাত-আটদিনে ঘোড়ার শুকনা ঘাস শেষ হয়ে গেছে। রসদ-পাতিরও অভাব দেখা দিয়েছে। রেমন্ড রসদের ব্যবস্থাটা ভালই করে রেখেছিল। ওখান থেকে নিয়মিত রসদ আসছিল। কিন্তু দিন কয়েক হল, এখন আর আসছে না। আসছেনা কোন সংবাদও। ব্যাপারটা কী? রেমন্ড দূত পাঠায়। দূত ফিরে এসে সংবাদ জানায়, সুলতান আইউবীর

সৈন্যরা রসদের পথও অবরোধ করে রেখেছে। শুনে রেমন্ড বিস্মিত হয়ে পড়ে যে, সুলতান আইউবী এত দ্রুত এ পর্যন্ত আসল কীভাবে! পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য রেমন্ড দু'জন অফিসারকে পিছনে প্রেরণ করে।

অফিসাররা তিন-চারদিন পর ফিরে আসে। তারা সংবাদের সত্যতা স্বীকার করে, সত্যিই সুলতান আইউবী রসদের পথ বন্ধ করে রেখেছেন। তারা এ সংবাদও নিয়ে আসে যে, আইউবী হাল্‌বের অবরোধ তুলে নিয়েছেন।

'তার অর্থ আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি'– রেমন্ড বলল– 'চল, ত্রিপোলী ফিরে যাই।'

রেমন্ড যুদ্ধ না করেই ফিরে গেছে, এ সংবাদ শুনে সুলতান আইউবী বিস্মিত হন। পিছুহটার জন্য সে যেপথ অবলম্বন করে, তা ছিল দুর্গম। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যেপথে এসেছিল, সে পথে যেতে রাজি নয়। সুলতান আইউবীর সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা-ই ত্যাগ করেছে সে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রেমন্ড যুদ্ধ করার ইচ্ছা ত্যাগ করেছিল কথাটা সঠিক। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল, সুলতান আইউবী তাকে লড়াই করার পজিশনে থাকতে দেননি। রেমন্ড এই ভেবে ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, মুসলিম সৈন্যরা এই শীতের মধ্যে এত চমৎকার লড়াই করছে, যেন তারা লড়াইটা উপযুক্ত মওসুমে সমতল ময়দানে করছে। দ্বিতীয় কারণ, সুলতান আইউবী তার পিছনে এবং রসদ সরবরাহের পথে গিয়ে বসে পড়েছিলেন। তৃতীয় ও সবচে' বড় কারণ ছিল ভিন্ন একটি, যা পরে ফাঁস হয়। তাহল, রেমন্ড মূলত আস-সালিহ-এর নিকট থেকে বিপুল অর্থ-সম্পদ নিয়েছিল। কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল, মুসলমানদেরকে পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে দেয়া। সে লক্ষ্য তার পূরণ হয়ে গেছে। খৃস্টানরা মুসলিম উম্মাহকে দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যখন ত্রিপোলী থেকে রেমন্ডের দূত একটি বার্তা এনে আস-সালিহ-এর হাতে পৌঁছায়, তখন তার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যায়। বার্তাটা হল– 'আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, সালাহুদ্দীন আইউবী যদি আপনাকে অবরোধ করে ফেলে, তাহলে আমি সেই অবরোধ ভেঙ্গে দেব। আমি যেইমাত্র সংবাদ পেলাম যে, সালাহুদ্দীন আইউবী হাল্‌ব আক্রমণ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজে ফৌজ নিয়ে আপনার সাহায্যে ছুটে এসেছি। আমার আগমনের সংবাদ টের পেয়ে তৎক্ষণাৎ আইউবী হাল্‌বের অবরোধ তুলে নিয়েছেন। আমি আমার ওয়াদা পূর্ণ করেছি। কাজেই আপনার সঙ্গে আমার যে সামরিক চুক্তি ছিল, তা এখন আর নেই। যে কর্তব্য

পালনের জন্য আপনি আমাকে সোনা-দানা পাঠিয়েছিলেন, তা আমি পালন করেছি। কাজেই পত্র পাওয়া মাত্র আপনি আমার সামরিক প্রতিনিধি ও উপদেষ্টাদের ফেরত পাঠিয়ে দিন।'

রেমন্ডের বার্তা পাঠ করে হাল্‌বের শাসকরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। দু'জন ঐতিহাসিক লিখেছেন, রেমন্ডের মনে এই শংকাও জাগতে শুরু করে যে, সুলতান আইউবী তার রাজধানী ত্রিপোলী আক্রমণ করে বসতে পারেন। এই আশংকার ভিত্তিতে আলরিস্তান থেকে ফিরে গিয়ে রেমন্ড তার রাজধানীর প্রতিরক্ষা আরো শক্ত করতে শুরু করে।

আস-সালিহ্ এখনো আনাড়ি-অনভিজ্ঞ। তাঁর এক-দু'জন উপদেষ্টা তাঁকে পরামর্শ দেয়, আপনি সুলতান আইউবীর সঙ্গে আপস করে নিন। কিন্তু সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগীন প্রমুখ তাঁকে সাহায্যের নিশ্চয়তা দিয়ে আপস-সমঝোতার পথ থেকে সরিয়ে রাখে। তাদের-ই একজন আস-সালিহ্‌কে বলেছিল, 'সালাহুদ্দীন আইউবী দিন কয়েকের মেহমান মাত্র। নতুন ঘাতকদল এসে গেছে। তারা ধর্মীয় নেতা ও পীর-বুযুর্গের বেশে সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট এই আবেদন নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে যে, আপনারা আর পরস্পর যুদ্ধ করবেন না। উভয়পক্ষ বসে বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করে নিন। সুলতান আইউবী সম্মানার্থে তাদেরকে নিজের পার্শ্বে বসতে দেবেন। নির্জনে বসে তাদের কথা শুনবেন। এই সুযোগে ঘাতক তাকে হত্যা করে নিরাপদে কেটে পড়বে।

সুলতান আইউবী আলরিস্তানের পর্বতমালায় বসে পরবর্তী হামলার পরিকল্পনা ঠিক করছেন আর হাল্‌বে বসে নয়জন ভাড়াটিয়া খুনী ভাবছে, আইউবীকে কোথায় কীভাবে হত্যা করা যায়।

ভয়াবহ ষড়যন্ত্র

মিশরের সে এলাকায় বর্তমানে আসওয়ান ডেম অবস্থিত, আটশত বছর আগে সেখানে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ আইউবী আমলের সেই যুদ্ধের কথা উল্লেখই করেননি। ইতিহাসে শুধু এতটুকু উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সুলতান আইউবীর একজন সেনাপতি বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তার ডায়েরীতে সেই সেনাপতির নামও লিখে রেখেছেন। নামটা হল, আল-কানাজ বা আল-কিন্দ। লোকটা ছিল মিশরী মুসলমান। তার মা ছিলেন সুদানী। সম্ভবত সুদানী রক্ত-ই তাকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উস্কে দিয়েছিল। সে যুগের ঐতিহাসিকদের প্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে তার বিদ্রোহের পটভূমি অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১১৭৪ সালের শেষ এবং ১১৭৫ সালের শুরুর সময়। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী মিশরে অনুপস্থিত। নুরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের পর উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলায় তিনি এখন দামেস্ক অবস্থান করছেন। ষড়যন্ত্র-শিকার অপ্রাপ্ত বয়স্ক আনাড়ী খলীফার হাত থেকে দামেস্ক দখল করার পর হেম্‌স ও হামাত দুর্গও জয় করেছেন। হাল্‌ব দুর্গ অবরোধ করতে গিয়ে তিনি অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। সেই সঙ্গে ত্রিপোলীর খৃস্টান সম্রাট রেমন্ডের আক্রমণের শিকার হন তিনি। সুলতান আইউবী হাল্‌বের অবরোধ প্রত্যাহার করে পিছনে সরে গিয়ে খৃস্টান বাহিনীকে পথেই প্রতিহত করার কৌশল অবলম্বন করেন। সুলতান আইউবী তাঁর কৌশলে সফল হন এবং রেমন্ড লড়াই ত্যাগ করে পিছনে সরে যায়। কিন্তু সেখানে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেনি; বরং সেখান থেকেই মূল যুদ্ধের সূচনা হয়।

সুলতান আইউবী আলরিস্তান পর্বতমালায় তার বাহিনীকে ছড়িয়ে রেখেছেন। একই সময়ে তাঁকে তিনটি শত্রুর মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এক. আস-সালিহ ও তার সহচরগণ। দুই. খৃস্টান বাহিনী। তিন. ঋতু। পরিস্থিতিটা ১১৭৫ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসের, যখন পাহাড়ের চূড়াগুলো সাদা বরফে ঢাকা এবং জনবসতিগুলো শীতে কাঁপছে থর থর করে। সুলতান

আইউবী সেখানে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছেন, যেন তিনি লোহার শিকলে বাঁধা পড়েছেন।

মিশরের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নন সুলতান। তিনি সেখানকার সেনাকমান্ড আপন ভাই আল-আদেলের হাতে অর্পণ করে এসেছেন। সেখান থেকে কিছু ফৌজ তিনি পরে তলব করে নিয়েও এসেছেন। মিশরের উপর সমুদ্রের দিক থেকে খৃস্টানদের এবং দক্ষিণ দিক থেকে সুদানীদের হামলার আশংকা বিদ্যমান। তার চেয়েও বেশী শংকা খৃস্টান ও সুদানীদের গোপন নাশকতামূলক তৎপরতা। মিশরে দুশমনের গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতা অনেকটাই দমন করা হয়েছে বটে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেছে বলা যায় না। এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে কায়রো রেখে এসেছেন। ভাই আল-আদেলকেও তিনি এ ব্যাপারে সতর্ক করে এসেছেন। কিন্তু আল-আদেল ও আলী বিন সুফিয়ান দু'জনে মিলেও সুলতান আইউবীর শূন্যস্থান পূরণ করতে সক্ষম হননি।

মিশর ত্যাগ করার সময় মিশরের সীমান্তে ও উপকূলীয় রক্ষীবাহিনীর ব্যাপারে সুলতান তাঁর ভাই আল-আদেলকে নির্দেশ প্রদান করে যান, সুদানী সীমান্তে যদি সামান্যতম গন্ডগোলও দেখা দেয়, তাহলে যেন কঠোর হাতে তার মোকাবেলা করা হয় এবং প্রয়োজন হলে যেন সুদানের অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়ে যুদ্ধ করা হয়। কিন্তু অতি জরুরী একটি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করতে ভুলে যান সুলতান। তাহল, সীমান্ত বাহিনীর বদলি। সে সময়ে সীমান্ত বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ও কমান্ডার এমন ছিল যে, তারা দু'বছরের বেশি সময় ধরে সীমান্তে নিয়োজিত রয়েছে। এরা সেই বাহিনী, যারা দুশমনের সঙ্গে জানবাজি লড়াই লড়ে এসেছে। কাজেই তাদের হৃদয় দুশমনের ঘৃণায় পরিপূর্ণ। তারা সুদানীদের কিছু-ই মনে করে না। তাদের আগে সীমান্ত প্রহরায় যে বাহিনী ছিল, তারা ভাল ছিল না। তাদের উপস্থিতিতেই মিসরের বাজার থেকে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী চোরাচালান হয়ে সুদান চলে যেত। সুলতান আইউবী ময়দান থেকে ফিরে এসে সেই বাহিনীকে বদলী করে ময়দান থেকে আনা বাহিনীকে সীমান্তে নিয়োজিত করেন। তারা সীমান্তে পৌঁছেই ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে দেয়। অল্প সময়ের মধ্যে সত্যিকার অর্থেই তারা মিশরের সীমান্তকে সুরক্ষিত করে ফেলে।

এটি দু'-আড়াই বছর আগের ঘটনা। শুরুতে তাদের মনে জোশ ও জযবা ছিল এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসার পর তারা ধীরে ধীরে নিষ্ক্রীয়

হয়ে পড়ে। এই বেকারত্ব তাদের চেতনাকে উই পোকার ন্যায় খেয়ে ফেলতে শুরু করে। সুলতান আইউবী ছিলেন একজন দূরদর্শী মানুষ। তিনি প্রতিটি দিক, প্রতিটি কোণ ও প্রতিটি ক্ষেত্রের উপর সমানভাবে দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু সীমান্ত বাহিনীর বদলির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টির প্রতি ব্যক্তিগতভাবে তিনি দৃষ্টি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। সীমান্ত বাহিনীর বিভাগটাই ছিল আলাদা, যার কমান্ডার ছিল সেনাপতি পদমর্যাদার এক ব্যক্তি, যার নাম আল-কিন্দ। বছরে তিনবার না হোক অন্তত দু'বার সেনাবদলি ছিল তার দায়িত্ব। কিন্তু লোকটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এ কাজটা করল না। ফলে এই অবহেলার পরিণতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে শুরু করে।

একই পরিবেশ, একই আবহাওয়া এবং একই ভূখন্ডে অবস্থান করে ও দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রহরার দায়িত্ব পালন করতে করতে এই সৈন্যরা বিরক্তি অনুভব করতে শুরু করেছে। সুদান নিশ্চুপ। চোরাচালানী বন্ধ। বেকারত্ব ও অলসতা সৈন্যদের মন-মানসিকতার উপর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া ফেলতে শুরু করেছে। তাদের হাতে এখন না আছে কোন কাজ, না আছে বিনোদনের কোন উপায়-উপকরণ। ঋতুতেও কোন পরিবর্তন নেই। বালির সমুদ্র, বালির টিলা ছয়মাস আগে যেমন, এখনো তেমন। আকাশের বর্ণেও কোন পরিবর্তন নেই। এই পরিস্থিতি ও সৈন্যদের বিরক্তির প্রথম ক্রিয়া এই দেখা দেয় যে, টহলরত অবস্থায় কোন পথিককে পেলে তুমি কে, কোথায় যাচ্ছ, তোমার সঙ্গে কী? এসব প্রশ্ন করার পরিবর্তে থামিয়ে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিচ্ছে এবং এটা-ওটা বলে চিত্তরঞ্জন করছে। যেসব চৌকির সন্নিকটে জনবসতি আছে, তারা গ্রামে ঢুকে পড়ে লোকদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে, গল্প-গুজব করছে।

একটি দেশের সীমান্ত প্রহরীদের এই আচরণ দেশের জন্য ছিল বিপজ্জনক। কিন্তু তারা দায়িত্ব পালনে অতিষ্ঠ সৈনিক। কোন না কোন উপায়ে কোন না কোন স্থানে গিয়ে মনোরঞ্জন করা এখন তাদের মানবিকতার দাবি। তাদের কমান্ডারও তাদের-ই ন্যায় মানুষ। তিনিও সময় কাটানোর এবং বিনোদনের উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত।

সুলতান আইউবী যখন দামেস্ক রওনা হন, তখন তিনি এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, সীমান্ত বিষয়ে সকল প্রকার নিদের্শনা প্রদান করা সত্ত্বেও তাঁর মাথায় আসেনি যে, সীমান্তের পুরাতন বাহিনীর বদলির নির্দেশ প্রদান করে যেতে হবে। সম্ভবত তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁর কমান্ডার আল-কিন্দ সব দায়িত্ব-ই

পালন করে থাকবে। সুলতান আইউবীর চলে যাওয়ার পর যখন আল-আদেল সিপাহসালারের দায়িত্ব বুঝে নেন, তখন তিনি আল-কিন্দকে জিজ্ঞেস করেন, সীমান্তে যে বাহিনী রয়েছে, তারা কতদিন যাবত দায়িত্ব পালন করছে? আল-কিন্দ জবাব দেন, বহুদিন যাবত।

'সীমান্তে আরো সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজন আছে কি?'– আল-আদেল জিজ্ঞেস করেন– 'আর পুরাতন বাহিনীকে প্রত্যাহার করে কায়রো নিয়ে এসে সেখানে নতুন বাহিনী প্রেরণ করার আবশ্যক রয়েছে কিনা?'

'না'– আল-কিন্দ জবাব দেন– 'এরা সেই বাহিনী, যারা দেশ থেকে তরি-তরকারী, খাদ্যদ্রব্য, পশু এবং অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি বিদেশে চোরাচালান হওয়াকে প্রতিহত করেছে। তারা এখন সীমান্ত এবং আশ-পাশের এলাকায় থাকতে অভ্যস্ত। তারা দূর থেকে সন্দেহভাজন লোকের ঘ্রাণ শুকে-ই তাকে গ্রেফতার করে ফেলতে সক্ষম। তাদের স্থলে নতুন সৈন্য প্রেরণ করলে নতুনদের অভিজ্ঞতা অর্জন করতেই অন্তত এক বছর সময় লেগে যাবে। এমন ঝুঁকি মাথায় তুলে নেয়া আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না।'

আল-কিন্দ-এর জবাবে আল-আদেল নিশ্চিন্ত হন। তাকে একথাও বলার মত কেউ ছিল না যে, এই আল-কিন্দ রাতে নিজ ঘরে বসে বলছিলেন, 'আমার এই সীমান্ত বাহিনীটা অকর্ম হয়ে পড়েছে। আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে যে, আমি তাদের বদলি হতে দেইনি। তারা সীমান্ত এলাকার লোকদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করে নিয়েছে। তাদের বর্তমান অবস্থা হল, তাদের পেট সবসময় ভরা থাকে–খাওয়ার ব্যাপারে তাদের কোন অভিযোগ নেই। আমি তাদের জন্য প্রয়োজনের চেয়েও বেশী খাদ্য সরবরাহ করি। কিন্তু তারা প্রবৃত্তির যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আছে। কোন কাফেলা পথ অতিক্রম করতে দেখলে তারা কাফেলার মহিলাদের মুখ উদোম করে তাকিয়ে থাকে। এবার আমি আমার কাজ করতে পারি।

আল-কিন্দ যার সঙ্গে কথা বলছিলেন, সে একজন সুদানী। মেহমানের বেশে আল-কিন্দ-এর ঘরে সে এসেছে। সুদান থেকে তার জন্য উপঢৌকন নিয়ে এসেছে। সঙ্গে ছিল একটি বার্তা। লোকটি আল-কিন্দকে জানায়, সুদানীরা প্রস্তুত। কিন্তু সেনাসংখ্যা এখনো ততবেশী সংগৃহীত হয়নি। লোকটি জানতে চায়, সুদানী সৈন্যরা কিভাবে মিসরে প্রবেশ করবে? সীমান্ত অতিক্রম করা তার দৃষ্টিতে একটি কঠিন ব্যাপার। তারই জবাবে আল-কিন্দ উপরোক্ত তথ্য পেশ করে।

আল-কিন্দ সেই সালারদের একজন, যাদের উপর সুলতান আইউবীর পূর্ণ আস্থা আছে। তিনিও কারো মনে এই সন্দেহ জাগতে দেননি যে, তিনি মিশরের অনুগত নন। আলী বিন সুফিয়ানকে পর্যন্ত তিনি ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। দু'-আড়াই বছর আগে তিনি যে সীমান্ত দিয়ে চোরাচালানী রোধ করেছিলেন এবং সীমান্তকে সম্পূর্ণরূপে সীল করে দিয়েছিলেন, সেই ইমেজই তাকে বেশ কাজ দিচ্ছে। তিনি যে দেশের একজন গাদ্দারে পরিণত হয়েছেন, তা কেউ টের-ই পেলনা।

সুলতান আইউবীর চলে যাওয়ার পর আল-কিন্দ আদেলকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন, আপনি সুদানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। সুদানের একটি পাখিও মিশরে প্রবেশ করতে পারবে না। আলী বিন সুফিয়ানকেও তিনি একই নিশ্চয়তা প্রদান করতে থাকেন। অথচ সুদানে হাবশীদের একদল সৈন্য মিশর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। তাদের পরিকল্পনা হল, তারা ছোট ছোট দলে মিশরে ঢুকে চুপিচুপি কায়রোর নিকটে পৌঁছে যাবে এবং রাতের বেলা হামলা করে রাতেই মিশরের ক্ষমতা দখল করে নিবে।

❁ ❁ ❁

সুদানের গা ঘেঁষে মিসরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে নীল দরিয়া। কিছুটা অগ্রসর হয়ে মিশরীয় এলাকায় প্রশস্ত একটি ঝিলের রূপ ধারণ করেছে নদীটি। আরো সামনে গিয়ে ঢুকে পড়েছে পার্বত্য এলাকার ভেতর। তারপর সম্মুখের দিকে এগিয়ে গেছে নালার রূপ ধারণ করে। তারই নিকটে অবস্থিত আসওয়ান ডেম।

সুলতান আইউবীর আমলে আসওয়ান ডেমের চারপাশের ভৌগলিক অবস্থা ছিল ভিন্ন রকম। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত টিলা আর পাহাড়। ফেরাউনদের বিশেষ সুদৃষ্টির প্রমাণ বহন করছে টিলা ও পাহাড়গুলো। তারা পাহাড় কেটে কেটে তৈরী করেছিল বিশাল বিশাল মূর্তি। সবচে' বড় মূর্তিটির নাম আবু সম্বল। কোন কোন পর্বতের চূড়া কেটে কেটে উপাসনালয়ের গম্বুজ কিংবা কোন এক ফেরাউনের মুখের আকৃতি তৈরী করা হয়েছে। পর্বতমালার পাদদেশে তৈরী করা হয়েছে গুহা। অভ্যন্তর অতিশয় প্রশস্ত ও বিস্তৃত। কোন গুহা এমনও তৈরী করা হয়েছে, যার ভিতরে অসংখ্য কক্ষ ও রাস্তা-ঘাট বিদ্যমান।

ফেরাউনরা এই রহস্যময় জগতটা কেন আবাদ করেছিল, তা বলা মুশকিল। পাহাড় কেটে কেটে এই মূর্তি নির্মাণ ও গুহা ইত্যাদি তৈরী করতে অতীত হয়েছে তিনটি বংশধারা। ফেরাউনরা ছিল সে যুগের খোদা।

জনসাধারণের কাজ ছিল ফেরাউনদের সেজদা করা এবং তাদের যে কোন আদেশ-নিষেধ মান্য করে চলা। সেই মজলুম ও ক্ষুধা-পীড়িত প্রজাদের দ্বারাই খোদাই করা হয়েছে এই পাহাড়, পর্বত। আজ সেখানে কোন মূর্তি নেই। নেই কোন গুহা বা পাহাড়। বর্তমানে সে স্থানে বিরাজ করছে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত আসওয়ান ডেম। এই ডেম তৈরীর আগে পাহাড়ের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ মূর্তিগুলোকে মেশিনের সাহায্যে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ডিনামাইটের সাহায্যে পাহাড়গুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। ফেরাউনরা যদি মানুষের হাতে এসব পাহাড়-পর্বতকে এভাবে উড়ে যেতে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে দেখত, তাহলে তারা খোদা হওয়ার দাবি থেকে হাত গুটিয়ে নিত।

সুলতান আইউবীর আমলে এই পার্বত্য এলাকাটার চিত্র ছিল অন্য রকম। সে যুগে এই পর্বতমালার উপত্যকা ও গুহায় পৃথিবীর সব সৈন্য লুকিয়ে থাকতে পারত। সীমান্তের যে স্থান দিয়ে নীলদরিয়া মিশরে প্রবেশ করেছে, সুলতান আইউবীর সে এলাকাটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল। সুদানীরা নৌকায় করে এস্থান দিয়ে মিশর ঢুকে যেতে পারত। এই নদী পথটির উপর দৃষ্টি রাখার জন্য নদী থেকে বেশ দূরে সুলতান আইউবী একটি সেনাচৌকি বসিয়েছিলেন। চৌকি থেকে নদী দেখা যেত, নদী থেকে চৌকি দেখা যেত না। সুলতান আইউবী পরিকল্পিতভাবেই এই দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন, যাতে অনুপ্রবেশকারীরা এই আত্মপ্রবঞ্চণায় লিপ্ত থাকে যে, তাদেরকে দেখার ও ধরার মত কেউ নেই। গোপন প্রহরার মাধ্যমে নদীতে চলাচলকারী নৌযানের প্রতি নজর রাখা হত। দু'জন অশ্বারোহী প্রতিক্ষণ টহল দিয়ে ফিরত।

সুলতান আইউবীর মিশরে অনুপস্থিতির সময়কার ঘটনা। একদিন দিনের বেলা সীমান্ত চৌকির দু'অশ্বারোহী ডিউটিতে বের হয় এবং প্রতিদিনের ন্যায় দূরে চলে যায়। নদীর কূলে একস্থানে কতটুকু সবুজ-শ্যামল এলাকা। বড় বড় ছায়াদার বৃক্ষ আছে সেখানে। জায়গাটা খুবই মনোরম। টহল সেনারা সুযোগ পেলে এখানে এসে বিশ্রাম নেয়, সময় কাটায়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা কোন সুদানীকে নদী পার হয়ে এপার আসতে দেখেনি। প্রথমদিকে তারা অনেক লোককে গ্রেফতার করেছে। তাদের অনেকে ছিল নাশকতাকারী ও গুপ্তচর। তারপর থেকে এই নদীপথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সান্ত্রীরা আসে শুধু ডিউটি পালন করার জন্য এবং চৌকির দৃষ্টির বাইরে চলে এসে কোথাও বসে আরাম করে সময় কাটায়।

এই দু'অশ্বারোহীর নিয়মও একই ছিল। এখন তারা বিরক্ত ও অতিষ্ঠ। নদীকূলের এমন সবুজ-শ্যামল জায়গাও এখন তাদের কাছে ভাল লাগে না। প্রতিদিন নদী দেখে দেখে তারা তার সৌন্দর্যের প্রতি নির্মোহ হয়ে পড়েছে। বহিঃজগতের কোন বস্তু এখানে চোখে পড়ে থাকলে তাহল মরু শিয়াল। ওরা নদীতে পানি পান করতে আসে আর সান্ত্রীদের দেখে পালিয়ে যায়। আর দেখা যেত দু'-চারজন মৎস্যশিকারী। সুলতান আইউবীর সান্ত্রীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করত, তোমরা কোথাকার লোক। পরে তারা এই প্রশ্ন করাও ছেড়ে দিয়েছে আর এক সময় ওরাও আসা বন্ধ করে দিয়েছে। সেদিন সান্ত্রীরা টহল এলাকায় পৌঁছে বলাবলি করতে শুরু করে– 'আমাদের সঙ্গীরা কায়রো, ইস্কান্দারিয়া ও অন্যান্য শহরে বসে আয়েশ করছে আর আমরা এই জঙ্গল -বিয়াবানে পড়ে রয়েছি।' তাদের কণ্ঠে ক্ষোভ ও অস্থির আভাস।

সান্ত্রীরা দূর থেকেই দেখতে পায়, সবুজ এলাকায় চার-পাঁচটি উট বাঁধা রয়েছে। পার্শ্বে এক স্থানে উপবিষ্ট আট-দশজন লোক। চারজন মানুষ নদীতে গোসল করছে। অশ্বারোহী সান্ত্রীদ্বয় কতটুকু সামনে অগ্রসর হয়ে থমকে দাঁড়ায়। গোসলরত প্রাণীগুলো সম্ভবত মানুষ নয়। তারা পরী। গাঁয়ে হালকা কাপড়। কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে গোসল করছে তারা। তাদের গায়ের রং মিশরী নারীদের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়। তারা গোসল করছে আর হাসাহাসি করছে। সান্ত্রীদ্বয় এই ভেবে ঘাবড়ে যায় যে, ওরা কি জলপরী, আকাশপরী, নাকি ফেরাউনদের রাজকন্যাদের প্রেতাত্মা! সান্ত্রীদ্বয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। তারা আর সামনে অগ্রসর না হয়ে সেখান থেকেই ফিরে যাওয়ার মনস্থ করে। কিন্তু এমন সময় উটের পার্শ্বে উপবিষ্ট লোকগুলোর দু' ব্যক্তি উঠে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। মেয়েরাও তাদেরকে দেখে ফেলে। তারা নদী থেকে উঠে কূলবর্তী ডাঙ্গায় একস্থানে লুকিয়ে যায়। সান্ত্রীদের ভয় কিছুটা কেটে যায়। তারা অগ্রসরমান ব্যক্তিদ্বয়ের নিকট এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কারা? এখানে কী করছ? তারা মাথা ঝুঁকিয়ে সান্ত্রীদের সালাম করে। লোকগুলো মরুবাসীর পোশাক পরিহিত। তার বলল, আমরা কায়রোর ব্যবসায়ী। সীমান্তবর্তী এলাকায় মাল বিক্রি করে ফিরে যাচ্ছি।

'কায়রো যাওয়ার পথ তো এটা নয়।' এক সান্ত্রী বলল।

'আমাদের সঙ্গে কয়েকটা মেয়ে আছে। তাদের শখ, তারা নদীর কূলে কূলে যাবে'– একজন জবাব দেয়– 'আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন আর কোন তাড়া নেই। দু'-তিনদিন এখানেই অবস্থান করব। আপনাদের যদি

সন্দেহ হয়, তাহলে আসুন, আমাদের মাল-পত্র পরীক্ষা করে দেখুন। আমাদের নিকট প্রচুর অর্থ আছে। তাও দেখুন। তাতেই আপনারা নিশ্চিত হবেন যে, আমরা সত্যিই মিশরী ব্যবসায়ী।'

অশ্বারোহী সান্ত্রীদ্বয় তাদের সঙ্গে হাঁটা দেয় এবং তাদের তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছে। দেখে অন্য সবাই ওঠে দাঁড়িয়ে তাদের সম্মান প্রদর্শন করে। সবাই মাথানত করে সালাম জানিয়ে তাদের সঙ্গে হাত মিলায়। একজন সরলমনে জিজ্ঞেস করে, আমাদের মাল-পত্র খুলে দেখবেন কি? সান্ত্রীদ্বয় পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে এবং বলে, না, দেখার প্রয়োজন নেই। একজন সুলতান আইউবীর ফৌজের প্রশংসা করতে শুরু করে। তারপর তারা সান্ত্রীদের যৌবন, বীরত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার তারিফ করে। তারা মুখে এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করল না, যার ফলে তাদের ব্যাপারে সান্ত্রীদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে।

ইত্যবসরে মেয়ে চারটি পোশাক পাল্টিয়ে ও মাথার চুল ঝেড়ে তাঁবুতে এসেছে। কিন্তু তারা সরাসরি সামনে না এসে লাজুক মুখে আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সান্ত্রীরা এই বিরানভূমিতে দু'-আড়াই বছরে এই প্রথম কয়েকজন মানুষের মজমা দেখতে পেল এবং এই দীর্ঘ সময়ে এ-ই প্রথমবারের মত তারা নারীর মুখ দেখল। তারা মেয়েগুলোর মধ্যে নারীর সব রূপ-ই দেখতে পেল। মা, বোন, স্ত্রী এবং সেই নারী, যে না বোন, না মা, না স্ত্রী। সান্ত্রীদের চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে গেছে যেন মেয়েগুলো। মেয়েগুলো তাদের প্রতি তাকিয়ে তাকিয়ে লজ্জা প্রকাশ করছে এবং মুখ লুকিয়ে হাসছে। তাদের লাজ-শরম প্রমাণ করছে, তারা সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা।

লোকগুলোর সহজ-সরল কথামালা আর মেয়েগুলোর রূপের জাদুতে ফেঁসে যায় সুলতান আইউবীর দুই সীমান্ত প্রহরী। কর্তব্যের কথা ভুলে যায় তারা। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সীমান্ত এলাকায় পড়ে থাকা এবং কাজ-কর্ম না থাকার প্রতিক্রিয়ায় ভয়াবহ এই যৌন পিপাসা তাদের ঘায়েল করে ফেলছে। এক ব্যক্তি নদীর কূলে দাঁড়িয়ে বড়শি দ্বারা মাছ ধরছিল। লোকটা অনেকগুলো মাছ শিকার করেছে। একজন মেয়েদের বলল, যাও মাছগুলো রান্না কর। নির্দেশ পাওয়ামাত্র চারটি মেয়ে ছুটে যায়। তারা মাছগুলো কেটে রান্না করে ফেলে।

✿ ✿ ✿

অশ্বারোহী সীমান্ত প্রহরীদ্বয় তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও ত্যাক্ত-বিরক্ত। তাদেরকে উন্নত খাবার পরিবেশন করা হয় বটে; কিন্তু প্রতিদিন একই খাবার খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে। নীল নদের কূলে যখন তাদের সামনে

ভুনা মাছ আর রান্না করা শুকনো গোশ্‌ত পরিবেশন করা হল, দেখেই তাদের জিহ্বায় পানি এসে গেল। তার উপর যখন সবাই একসঙ্গে খাওয়া শুরু করে, খাবার আরো সুস্বাদু হয়ে ওঠে। আহারের মাঝে তারা দেখল, একটি মেয়ে তাদের একটি ঘোড়ার ঘাড় ও শিং-এ হাত বুলাচ্ছে এবং ঘোড়াটাকে আদর করছে। মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে খেতে বসেনি। এই ঘোড়াটা যে সান্ত্রীর, সে মেয়েটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখে। মেয়েটিও তার উপর চোখ পড়ামাত্র মুচকি একটা হাসি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সান্ত্রীরা এত রূপসী মেয়ে আগে কখনো দেখেনি।

এক বৃদ্ধ সান্ত্রীদের বলল– 'আমাদের এই মেয়েরা কখনো ঘোড়ায় চড়েনি। যে মেয়েটা ঘোড়ার নিকট দাঁড়িয়ে আছে, ওর ঘোড়ায় চড়ার বড় শখ। কিন্তু কখনো-ই তার ঘোড়ার পিঠে বসার সুযোগ হয়ে ওঠেনি।'

'আমরা চারজনের-ই শখ পূরণ করব।' এক সান্ত্রী বলল।

আহার শেষে সান্ত্রী উঠে তার ঘোড়ার নিকট চলে যায়। মেয়েটি মাথানত করে লাজুক মুখে একদিকে সরে দাঁড়ায়। সান্ত্রী তাকে বলল– 'আস, আমি তোমার ঘোড়ার পিঠে চড়ার শখ পুরণ করব। একজন একজন করে সবাইকে ঘোড়ায় চড়াব।'

পিছন দিক থেকে আওয়াজ ভেসে এল– 'লজ্জা কর না; এরা তোমাদের ইজ্জত ও দেশের মোহাফেজ। এরা না থাকলে খৃস্টান ও সুদানীরা তোমাদের কী দশা ঘটাবে, আল্লাহ-ই ভাল জানেন।'

মেয়েটি মাথার ওড়নাটা নীচের দিকে টেনে নিয়ে ঘোমটার মত করে পা টিপে টিপে ঘোড়ার নিকটে চলে যায়। সান্ত্রী তার পা রেকাবে তুলে দিয়ে পাজাকোলা করে তাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দেয়। এমন সময় কে একজন পিছন থেকে সান্ত্রীকে ডাক দিয়ে কি যেন বলতে শুরু করে। সান্ত্রী সে দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে। হঠাৎ ঘোড়াটা একদিকে ছুটতে শুরু করে। মেয়েটা চীৎকার জুড়ে দেয়। সান্ত্রী ঘাড় ফিরিয়ে দেখে ঘোড়া দ্রুতগতিতে দৌড়াচ্ছে এবং পিঠে বসা মেয়েটি এদিক-ওদিক দুলে পড়ছে আর সামলে বসে থাকার চেষ্টা করছে। সবাই হৈ-হুল্লোড় জুড়ে দেয় যে, ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে পড়েছে– মেয়েটা পড়ে মরে যাবে। সান্ত্রীর নিকটে তার সঙ্গীর ঘোড়াটা দাঁড়ান ছিল। সে এক লাফে তাতে চড়ে বসে চাবুক মেরে ছুটে চলে। মেয়েকে বহনকারী ঘোড়া চোখের আড়ালে চলে গেছে। সান্ত্রী তার ঘোড়ার গতি যতটুকু সম্ভব বাড়িয়ে দেয়। তার জানা মতে এতক্ষণে মেয়েটি ঘোড়ার

পিঠ থেকে পড়ে গেছে, তার পা দু'টো রেকাবের সঙ্গে আটকে গেছে। হাড়-গোড় ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং ঘোড়া তাকে টেনে-হেঁচড়ে হাড়-মাংস আলাদা করে ফেলছে।

সান্ত্রী ছুটে চলছে। এখন তার সম্মুখে খোলা মাঠ। কিন্তু না, মেয়েটার তো কিছু-ই হয়নি! ঐ তো ঘোড়া তাকে নিয়ে ছুটে চলছে! কতটুকু অগ্রসর হয়ে তার ঘোড়া একদিকে মোড় নিয়েই আবারো চোখের আড়ালে চলে যায়। সান্ত্রী মেয়েটির চীৎকার ও ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু ঘোড়া দেখা যাচ্ছে না। কতদূর অগ্রসর হয়ে সেও একদিকে মোড় ঘুরায়। কিন্তু এখন না ঘোড়া দেখা যাচ্ছে, না মেয়েটির চীৎকার শোনা যাচ্ছে। সান্ত্রী ভাবে, সম্ভবত ঘোড়া কোন গর্তে পড়ে গেছে। সে ঘোড়ার গতি কমিয়ে দেয়। এগিয়ে যায় আরো কতটুকু সামনে। এবার মেয়েটির ডাক তার কানে আসে– 'এদিকে আস, জলদি আমার কাছে আস।'

সান্ত্রী সেদিক তাকায়। অবস্থা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় সে। একি! ঘোড়াটা বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে আছে, আর মেয়েটি দিব্যি তার পিঠে বসা! তার চেহারায় ভয়-ভীতির কোন ছাপ নেই; বরং দু'ঠোঁটে মুচকি হাসি! সান্ত্রী একবার ভাবে, ঘোড়া হাঁকিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাই। সে নিশ্চিত, মেয়েটি মানুষ নয়– জিন-পরী কিংবা ভূত-প্রেত। ফাঁকি দিয়ে তাকে এই নির্জন জায়গায় নিয়ে এসেছে আর এখন তার রক্ত পান করবে। কিন্তু মেয়েটির মুখের মুচকি হাসি আর দেহের রূপ-লাবণ্যে এতই শক্তি যে, সিপাহীকে ঘোড়াসহ কাছে টেনে নিয়ে যায়।

'তুমি সৈনিক– তুমি পুরুষ'– মেয়েটি বলল– 'তুমি আমাকে ভয় করছ?'

মেয়েটি সান্ত্রীর হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে বলল– 'ঘোড়া বে-লাগাম হয়নি। আমি ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছি আর চীৎকার করে বুঝাবার চেষ্টা করেছি, ঘোড়া বে-লাগাম হয়ে গেছে এবং আমি পড়ে যাচ্ছি। আমার জানা ছিল, তুমি আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসবে। আমি আনাড়ি নই– দক্ষ ঘোড়সওয়ার।'

'এই ধোঁকাটা তুমি কেন দিয়েছ?' সান্ত্রী জিজ্ঞেস করে।

'আমাকে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন'– মেয়েটি বলল– 'কথাটা সকলের সামনে বলা সম্ভব ছিল না। ঐ লোকগুলোর মধ্যে তুমি একজন বৃদ্ধলোক দেখেছ। তিনি আমার স্বামী। তুমি তার বয়স দেখ আর আমার যৌবনও দেখ। লোকটা আমাকে খুশী রাখার জন্য আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

'অপর মেয়েরা কারা?' সান্ত্রী জিজ্ঞেস করে।

'ওরা দু'জনই বিবাহিতা'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'তাদের স্বামীরা যুবক। বিনোদনের জন্য তারা ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

'লোকটা যদি তোমাকে অপহরণ করে নিয়ে আসত, তাহলে আমি তাকে ধরে চৌকিতে নিয়ে যেতাম'– সান্ত্রী জবাব দেয়– 'কিন্তু তুমি তো তার স্ত্রী।'

'আমি তাকে স্বামী বলে স্বীকার করি না। তাছাড়া তোমাকে দেখার পর তার প্রতি আমার ঘৃণা আরো বেড়ে গেছে'– আবেগাপ্লুত কণ্ঠে মেয়েটি বলল– 'তোমাকে প্রথমবার দেখামাত্র আমার অন্তর থেকে আওয়াজ আসল, এই যুবক-ই তোমার স্বামী। আল্লাহ তোমাকে এই সুদর্শন যুবকটির জন্যই সৃষ্টি করেছেন।'

'আমি অত সুশ্রী নই, যতটা তুমি বলছ'– সান্ত্রী বলল– 'তুমি কেন আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ? তোমার মনে কী আছে, খুলে বল।'

'আল্লাহ জানেন আমার অন্তরে কী আছে'– দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশ কণ্ঠে মেয়েটি বলল– 'তিনিই হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করবেন। তুমি যদি আমার হৃদয়ের আওয়াজকে প্রতারণা মনে করেও থাক, তারপরও আমি আর বুড়োটার কাছে ফিরে যাব না। ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘোড়াসহ সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ব। আল্লাহর নিকট গিয়ে বলব, তুমি আমাকে হত্যা করেছ।'

সান্ত্রী সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী, আলী বিন সুফিয়ান কিংবা আল-আদেলের ন্যায় ব্যক্তিত্ব নয়– একজন ত্যাক্ত-বিরক্ত সাধারণ সৈনিক। তদুপরি টগবগে যুবক। মেয়েটির রূপ-যৌবন ও চলন-বলন তাকে মোমে পরিণত করে ফেলেছে। তবে তার এতটুকু অনুভূতি আছে যে– 'আমি একজন সাধারণ সৈনিক আর তুমি রাজকন্যার সমান। কোমল গালিচা থেকে নেমে এসে আমার সঙ্গে এই বালুকাময় প্রান্তর আর পাহাড়-উপত্যকায় টিকতে পারবে না।'

'নরম গালিচা ও ধন-দৌলত আমার লক্ষ যদি হত, তাহলে ঐ বৃদ্ধ অপেক্ষা ভাল স্বামী আর হতে পারে না'– মেয়েটি বলল– 'লোকটা তো তার সমুদয় ঐশ্বর্য্য আমার পায়ের উপর ফেলে রেখেছে। আমার একান্ত আকাংখা, আমি একজন সৈনিকের স্ত্রী হব। আমার পিতাও সৈনিক। বড় দু'ভাইও সৈনিক। তারা সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে দামেস্ক ও সিরিয়ার ময়দানে যুদ্ধ করছে। আমার মা আমাকে এই বৃদ্ধের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমরা গরীব মানুষ। আমার রূপ-সৌন্দর্যই আমাকে এই দুভার্গ্যের পথে ঠেলে দিয়েছে। আমি

একজন দক্ষ অশ্বারোহী। কিন্তু আমার স্বামী বিষয়টা জানেন না। আমি বহুবার আকাংখা করেছি, আমি সুলতান আইউবীর বাহিনীতে যোগ দেব। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে একজন সৈনিকের স্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করব। তুমি আমাকে বালুকাময় প্রান্তর আর পাহাড়-উপত্যকার ভয় দেখিও না। মরুভূমিতে আমার জন্ম। মরুভূমির উত্তপ্ত বালি যখন আমার রক্ত চুষে নিবে, তখন-ই কেবল আমার আত্মা নিশ্চিন্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে।'

'আমি কিভাবে তোমার সাহায্য করতে পারি বল।' সান্ত্রীর পরাজিত কণ্ঠ।

'ওঠ, আমরা ধীরে ধীরে ফিরে যাই। ওরা আমাদের পিছনে পিছনে এসে থাকবে হয়ত। পথে তোমাকে বলব, আমি কী ভাবনা ভেবে রেখেছি।' মেয়েটি বলল।

সান্ত্রী ও মেয়েটি যার যার ঘোড়ায় চড়ে ধীরে ধীরে পাশাপাশি চলছে। মেয়েটি বলছে,– 'আমি তোমাকে বলব না যে, তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। এটা আইনত অপরাধ হবে। আমার স্বামী আদালতে মামলা করবে, আমরা উভয়ে শাস্তি ভোগ করব। আমাকে আগে স্বামীটা থেকে মুক্ত হতে হবে। তার পন্থা হল, তাকে এমনভাবে হত্যা করতে হবে, যা মূলত হত্যা বলে মনে হবে না। তুমি না পারলে কাজটা আমি করব। একটা পদ্ধতি এই হতে পারে যে, মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাকে পান করাব আর রাতের বেলা নদীর কিনারে নিয়ে ধাক্কা মেরে নদীতে ফেলে দেবে। মানুষ মনে করবে, লোকটা নিজেই নেশা করে পানিতে পড়ে গেছে। এর জন্য দু'-চারদিন অপেক্ষা করতে হবে। তার জন্য আমি তাকে এখানেই রেখে দেব।'

'তোমার সঙ্গে কি বিষ আছে?' সান্ত্রী জিজ্ঞেস করে।

'থাকতে হবে না'– খিলখিল করে হেসে উঠে মেয়েটি বলল– 'তুমি আসলে আস্ত একটা বদ্দু সৈনিক। আমি কায়রো থেকে অনেক দূরে এক উঁচু এলাকার বাসিন্দা– এই নদীটা যেখান থেকে এসেছে ঠিক সেখানে আমার বাস। আমাদের প্রধান খাদ্য হল মাছ। মাছের পিত্ত বিষে পরিপূর্ণ থাকে। তুমি দেখেছ, আমরা এখানেও মাছ শিকার করে থাকি। রান্না করার সময় আমি মাছের একটা পিত্ত লুকিয়ে রাখব আর তার কয়েক ফোঁটা বিষ নিয়ে মদের সঙ্গে মিশিয়ে বুড়োকে খাইয়ে দেব। তারপর ভ্রমণের নাম করে নদীর কূলে নিয়ে গিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বেটাকে নদীত ফেলে দেব।'

'তারপর আমি তোমাকে কিভাবে নিয়ে যাব?' সান্ত্রী জানতে চায়।

'বৃদ্ধ মরে গেলে আমি স্বাধীন হয়ে যাব'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'আমি

সকলকে বলব, তোমরা কেউ আমার অভিভাবক নও যে, তোমরা আমার পছন্দের বিয়ে প্রতিহত করবে। তারপর আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব। তুমি আমাকে আমার বাড়ী পৌঁছিয়ে দেবে। আর শোন, মাঝে-মধ্যে আমার খোঁজ-খবর নেবে কিন্তু। আচ্ছা, এখন চলে গেলে তুমি আবার কবে আসবে?'

'আমি শুধু টহলের সময়টায় আসতে পারব'— সান্ত্রী জবাব দেয়— 'চৌকি এখান থেকে অনেক দূরে। টহলের ডিউটি ছাড়া ঘোড়া ব্যবহার করা যায় না। আগামী কাল দুপুরে এই সঙ্গীর সাথেই এখানে আমার ডিউটি পড়বে। তখন আসব।'

'এখান থেকে একটু দূরে থেক'— মেয়েটি বলল— 'আমি পথে তোমার সঙ্গে দেখা করব। তারপর কোথাও লুকিয়ে বসে কথা বলব।'

মেয়েটি সান্ত্রীর একটি হাত তার মুঠোয় নিয়ে নেয়। সান্ত্রী তার প্রতি তাকিয়ে থাকে। মেয়েটিও তার চোখে চোখ রাখে। সান্ত্রীর সব সংশয় দূর হয়ে যায়। সে মেয়েটির ডান হাতটা টেনে নিয়ে নিজের বুকে লাগিয়ে চেপে ধরে রাখে।

❁ ❁ ❁

মেয়েটি যেখান থেকে পাথরের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছিল, সান্ত্রী ও মেয়েটি সেখানে গিয়ে পৌঁছে। কাফেলার মানুষগুলো তাদের চোখে পড়ে। তারা এদিকে তাকিয়ে রয়েছে। সান্ত্রী ও মেয়েটি সেদিকে ছুটে যায়। দু'জন ঘোড়া থেকে অবতরণ করে। মেয়েটির বৃদ্ধ স্বামী উঠে এগিয়ে এসে সান্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে। মুখ দিয়ে কথা সরছে না তার। ঠোঁট কাঁপছে। অন্য লোকেরাও আপ্লুত কণ্ঠে সান্ত্রীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। মেয়েটি তাদেরকে মিথ্যা কাহিনী শোনায়— 'এই সান্ত্রী নিজের জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলে আমাকে উদ্ধার করে এনেছে। অন্যথায় ঘোড়া আমাকে গর্তে নিক্ষেপ করে মেরেই ফেলেছিল।'

নাটকের প্রথম পর্ব এখানেই শেষ হয়। সান্ত্রীদ্বয় চৌকির অভিমুখে ফেরত রওনা হয়। পথে এই সান্ত্রী তার সঙ্গীকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। সঙ্গীও জানায়, তুমি চলে যাওয়ার পর অন্য একটি মেয়ে আমাকে প্রেম নিবেদন করে। মেয়েটি প্রথমে আমার প্রতি এক বিস্ময়কর ভঙ্গীমায় তাকাতে থাকে। কাফেলার পুরুষ লোকগুলো অন্যমনস্ক হয়ে কথা বলছে। আমি তোমার সন্ধানে উঠে কিছুদূর অগ্রসর হই। কিন্তু পায়ে হেঁটে গিয়ে তোমাকে ধরা সম্ভব ছিল না বলে বেশীদূর এগুয়নি। দু'টি মেয়ে আমার পিছনে পিছনে এগিয়ে আসে। একজন আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। কথায় কথায় মেয়েটি আমার

প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে এবং আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি এদিকে আবার কবে আসবে? তোমার সঙ্গে আমার আবার কোন্‌দিন দেখা হবে? আমি বললাম, আগামীকাল দুপুরের সময় এখানে আমাদের ডিউটি থাকবে। মেয়েটি বলল, আমার স্বামী একজন বৃদ্ধ লোক। আমি তাকে ছেড়ে পালাতে চাই।'

দুই সৈনিকের একই কাহিনী। তারা ভাবতে শুরু করে, মেয়ে দু'টোকে কিভাবে সঙ্গে করে নেয়া যায়। তারা ভাবছে, মেয়েরা যদি তাদের স্বামীকে খুন করতে না পারে, তাহলে আমরা-ই তাদেরকে খুন করব। সুদর্শন এক কল্পনার জাল বুনতে বুনতে চৌকিতে গিয়ে পৌঁছে সুলতান আইউবীর দুই সিপাহী।

তারা চৌকির কমান্ডারকে রিপোর্ট করে– 'অমুক জায়গায় কায়রোর একটি বণিক কাফেলা অবস্থান নিয়ে আছে। আমরা তাদের তল্লাশী নিয়েছি। তাদের নিকট সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।'

সিপাহীরা কমান্ডারকে মেয়েদের সম্পর্কেও অবহিত করে। কমান্ডার রিপোর্টের প্রথম অংশটি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ না করলেও তিনটি রূপসী যুবতী মেয়ের উল্লেখে চমকিত হয়ে ওঠে। মেয়েগুলোর সংখ্যা, বয়স, গঠন-আকৃতি, উচ্চতা, রং-রূপ ইত্যাদি সবকিছু খুটিয়ে খুটিয়ে জেনে নেন তিনি।

চৌকিতে অন্য এক চৌকির এক সৈনিক অবস্থান করছিল। সে চৌকিটা এখান থেকে আট-দশ মাইল দূরে অবস্থিত। তার কমান্ডার এই সৈনিককে একটি বার্তা দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন– 'আজ সন্ধ্যার পর আমার চৌকিতে আসবেন; জরুরী কাজ আছে।' একসঙ্গে যাওয়ার জন্য কমান্ডার বার্তাবাহক সৈনিককে বসিয়ে রেখেছেন।

সূর্যাস্তের পর কমান্ডার সিপাহীর সঙ্গে রওনা হয়ে যান। আট-দশ মাইল পথ অতিক্রম করে তারা যখন অপর চৌকিতে পৌঁছেন, তখন অনেক রাত।

চৌকিটা সবুজ-শ্যামল মনোরম একটা এলাকায় অবস্থিত। আজ অতিরিক্ত আরো কিছু জাঁকজমক চলছে। চৌকির সকল সৈনিক– যাদের এখন ডিউটি নেই– চৌকির বাইরে বৃত্তাকারে বসে আছে। স্থানে স্থানে বাতি জ্বলছে। কমান্ডার এখানে নেই। মেহমান কমান্ডার তার তাঁবুতে যান। তাঁবুতে কমান্ডারের সঙ্গে উপবিষ্ট দু'টি মেয়ে ও তিনজন মরুবাসী পুরুষ। তাদের সন্নিকটে পড়ে আছে বাদ্যযন্ত্র।

মেহমান কমান্ডারের তাঁবুতে প্রবেশ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে খাওয়ার আয়োজন করা হল। সবাই খানা খেলেন। আহার শেষে কমান্ডারের নির্দেশে-বাদক পুরুষ ও মেয়েরা বেরিয়ে যায়। মেহমান কমান্ডার জিজ্ঞেস করেন, এরা

কারা? বাইরে কী হচ্ছে?

'মেয়েগুলো নর্তকী'– কমান্ডার জবাব দেন– 'সঙ্গের পুরুষরা বদক, তারা এ পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। পানি পান করার জন্য অবতরণ করলে আমি ডেকে এনে বসাই এবং কথা বলি। মেয়েগুলোকে আমার ভাল লেগেছে। আমি তাদেরকে খানা খাওয়ালাম। এই রাত তাদেরকে এখানেই রাখব। ওরা বড় ভাল মানুষ।'

'এই ধারা আমার পছন্দ হয় না'– মেহমান কমান্ডার বললেন– 'এই বিলাসিতা সৈনিকদেরকে নষ্ট করে ফেলবে।'

'এসব ছাড়া সৈনিকরা নষ্ট হচ্ছে আরো বেশি'– মেজবান কমান্ডার বললেন– 'আমাদের সহকর্মীরা শহরে-নগরে আয়েশ করছে আর আমরা এখানে দেউলিয়ার ন্যায় ঘুরে মরছি। এই বিড়ম্বনা থেকে কবে নাগাদ নিস্তার পাব, জানি না। এভাবে জীবন কাটানো যায় না। তোমার সৈনিকরা কি তোমাকে কখনো বলেনি, আমাদেরকে বদলি করা হোক? আমার সৈনিকরা তো আমাকে অস্থির করে ফেলছে।'

'তা বটে, আমার চৌকিতে তো এ নিয়ে দু'সৈনিকের মধ্যে মারপিটও হয়ে গেছে'– মেহমান কমান্ডার বললেন– 'এখন তো সৈনিকরা সামান্য ব্যাপারেও রেগে ওঠে।'

'আমি আমার সালার আল-কিন্দ-এর নিকট আবেদন প্রেরণ করেছি যে, এবার আমাদের প্রতি রহম করুন এবং আমাদেরকে প্রত্যাহার করে নিন'– মেজবান কমান্ডার বললেন– 'কিন্তু তিনি কোন জবাব দেননি। আমি বলেছি, আমাদেরকে সেই ময়দানে পাঠিয়ে দিন, যেখানে ঘোরতর লড়াই চলছে। যেখানে কোন কাজ নেই, সেখান থেকে আমাদের সরিয়ে নিন। এখানে যে কাজ ছিল, তা আমরা সম্পন্ন করেছি। এখানে অন্য বাহিনী প্রেরণ করা হোক।'

অপর চৌকি থেকে আসা কমান্ডারের ভাবনাও একই। উভয় কমান্ডার ও তাদের অধীন সৈনিকরা একই পরিস্থিতির শিকার। উপরের সামান্য অবহেলা ভয়ঙ্কর এক পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে দেশটাকে। দুশমনের উপর বিদ্যুতের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ত অকুতোভয় যে ফৌজ, তারা আজ চরম মানসিক বিপর্যয়, নৈতিক অধঃপতন ও বিশৃংখলার শিকার। তারা আজ বিনোদনের উপায় খুঁজে ফিরছে এবং কর্তব্য পালনের পরিবর্তে নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনা দ্বারা মন ভুলানোর চেষ্টা করছে।

রাত কেটে যাচ্ছে। মেয়েরা পালাক্রমে নাচছে-গাইছে। তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে গানের সুর ধরে বাদকরা। সৈনিকরা চীৎকার ও করতালি দিয়ে তাদের প্রশংসা করছে, উৎসাহ প্রদান করছে। তিন-চারজন সৈনিক মেয়েদের দিকে পয়সা ছুঁড়ে মারে। কিন্তু মেয়েরা এই বলে সেগুলো ফিরিয়ে দেয় যে, আমরা দেশের অতন্দ্র প্রহরী মোহাফেজদের নিকট থেকে পয়সা নেই না। বাদকরা দর্শক--শ্রোতাদের উদ্দেশে বলে, আমরা বিনিময় নেব না। আমাদের নাচ-গানে যদি আপনারা আনন্দ পেয়ে থাকেন, তাহলে আবার তলব করবেন। যখনই বলবেন, আমরা এসে যাব। কোন বিনিময় ছাড়াই আমরা আপনাদের আনন্দ দিয়ে যাব।

দর্শনাথীদের দু'জন কমান্ডার। পদমর্যাদায় উচ্চ না হলেও দায়িত্বশীল লোক তো বটে। কিন্তু তারা তাদের দায়িত্বের কথা ভুলে গেছে। এই গায়ক-নর্তকীরা কোথা থেকে আসল এবং কোথায় যাবে এবং নিজেদের যে পরিচয় প্রদান করল, তা সঠিক কিনা, তাও তারা জানবার চেষ্টা করল না। কমান্ডারগণ এ-ও দেখল না যে, আসরে শ্রোতা-দর্শনার্থীদের মাঝে মিশরের মরুবাসীর পোশাকে যে ক'জন অপরিচিত লোক এসে বসল, তারা কারা এবং কোথা থেকে এসেছে। তারা এটাও লক্ষ্য করল না, চৌকির চারজন সৈনিক টহল প্রহরা থেকে আগে-ভাগে ফিরে আসল এবং তাদের পরিবর্তে অন্য সৈনিক পাঠানো হল না।

চৌকি থেকে দূরবর্তী একটি স্থান। অমাবশ্যার রাতের ন্যায় কালো চেহারার অন্তত পঞ্চাশজন লোক একজন অপরজনের পিছনে দল বেঁধে সুদানের দিক থেকে এদিকে আসছে। কাফেলার অনেক সম্মুখে অবস্থান করছে আরো দু'ব্যক্তি। কাফেলা সামান্য পথ অগ্রসর হয়ে থেমে যাচ্ছে। সম্মুখের লোক দু'জন এদিক-ওদিক দেখে কাফেলাকে পথনির্দেশ করছে। কখন কোন্ দিকে যাবে, কোন্ পথে চলবে, স্থির করে তারা শকুনের ন্যায় শব্দ করছে আর তাদের সংকেত অনুসারে পিছনের কাফেলা অগ্রসর হচ্ছে। কাফেলাকে থামাতে হলে তারা শিয়ালের ন্যায় রা করছে।

চৌকির বাদ্য-রাজনার উচ্চ শব্দমালা মিশর সীমান্তের নীরব পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

সম্মুখে পার্বত্য এলাকা। কাফেলার কালো মানুষগুলো ঘোড় অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বতমালার ফাঁকে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে বর্শা, তীর-ধনুক, তরবারী ও খঞ্জর। তাদেরকে স্বাগত

জানানোর লক্ষ্যে সেখানে অবস্থান করছে জনাচারেক মানুষ। তাদের একজন আগত কাফেলার সরদারকে অভিবাদন জানিয়ে হাসিমুখে বলল– 'মেয়েরা কাজ করে ফেলেছে স্যার।'

'হ্যাঁ, খবর পেয়েছি'– সরদার বলল– 'আমরা বাদ্যের সুর শুনতে এসেছি। দশ-বারজন লোককে আমরা আগেই সেখানে পাঠিয়ে রেখেছিলাম। তাদের একজন এসে সংবাদ দিয়ে গেল, আসর তুঙ্গে উঠে গেছে এবং রাস্তা পরিষ্কার। টহলদার সিপাহীরাও আসরে চলে এসেছে।'

'নীল নদ থেকেও ভাল সংবাদ এসেছে'– অভ্যর্থনাকারীদের একজন বলল– 'তারা মেয়েদের দ্বারা ঠিক ঠিক কাজ নিয়েছে। আগামীকাল রাতে ওখানে যে দু'সিপাহীর ডিউটি থাকবে, তাদেরকে ফাঁদে আটকে ফেলা হয়েছে। আমি সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছি। আগামীকাল রাত পর্যন্ত কমপক্ষে তিনটি বড় নৌকা এসে যাবে।'

তারা সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে। সম্মুখে সারি সারি পাহাড়। দলনেতা দাঁড়িয়ে যায় এবং কাফেলার সবাইকে দাঁড়াতে নির্দেশ দেয়। সে অভ্যর্থনাকারীদের সঙ্গে কানে কানে বলে– 'একথা ভুলে যেওনা, এরা সবাই হাবশী। তাদের ধর্ম অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি তোমাদেরকে অবাক্ করে ফেলবে। তোমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে। তারা যদি চরম হাস্যকর কোন আচরণও করে ফেলে, তবু তাদের প্রতি পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে চলতে হবে। আমরা তাদেরকে ধর্মের নামে নিয়ে এসেছি। তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়েছি, তোমাদেরকে যেখানে নিয়ে যাব, সেখানে খোদা অবস্থান করে থাকেন– সেই খোদা, যিনি বালুকারাশিকে পিপাসু রাখেন, সূর্যকে আগুন দান করেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তোমরা একটি সমস্যার সম্মুখীন হবে। তাহল, এরা মানুষ বলি দিতে চাইবে। এরা মানুষ বলিদানে অভ্যস্ত।'

বলি পুরুষের হবে নাকি নারীর, নাকি একজন পুরুষ ও একজন নারীর হবে, তা তাদের সরদার বলে দেবে। আমরা যদি তাদের এই রীতি পালন করার সুযোগ করে দেই, তাহলে যুদ্ধের ময়দানে দেখবে, তারা কিভাবে মিশরের ইট-পাথরগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী তাদের মোকাবেলায় একদিনের বেশি টিকতে পারবে না।'

সরদার সকলকে বলল– 'তোমরা সেজদায় লুটিয়ে পড়; তোমরা খোদার ঘরে এসে পড়েছ।'

সবাই সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারপর সরদারের নির্দেশে উঠে দাঁড়ায় এবং

সরদারের পিছনে পিছনে হাঁটা দেয়।

এরা সুদানী হাবশী, যাদেরকে সুদান থেকে এনে মিশরে অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে। তাদেরকে লুকিয়ে রাখার জন্য বেছে নেয়া হয়েছে এই পার্বত্য ভূখন্ডকে। ফেরাউন আমলের গুহাসমূহ– যা মূলত পাতালপ্রাসাদ– উট-ঘোড়াসহ বিশাল সেনাবাহিনীকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব।

সুদানে রক্তখোর হাবশীদেরকে ধর্ম ও কুসংস্কারের নামে ঐক্যবদ্ধ করে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। তারা যুদ্ধে অতিশয় পারদর্শী। গোত্রে গোত্রে লড়াই চলে তাদের। তীরান্দাজী ও অব্যর্থ বর্শাবাজীতে তারা পারঙ্গম। সুদানের শাসকরা খৃস্টানদের সঙ্গে চুক্তি করে অনেক খৃস্টান সেনাঅফিসারকে ডেকে এনেছিল। তারাই এই হাবশীদেরকে সুসংগঠিত ও নিয়মতান্ত্রিক কমান্ডের অধীনে যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। ইতিপূর্বে সুদানী বাহিনী দু'বার পরাজিত হয়েছিল। তৃতীয় যুদ্ধ সেসময় সংগঠিত হয়, যখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই তকিউদ্দীন সুদান হামলা করেছিলেন। এই হামলাকে ব্যর্থ করে সুদানীরা তকিউদ্দীনের বাহিনীকে তছনছ করে দিয়েছিল। তকিউদ্দীন সুলতান আইউবীর সহায়তায় তার অবশিষ্ট সৈন্যকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। সে যুদ্ধে সুদানীদের ব্যর্থতা এই ছিল যে, তারা তকিউদ্দীনকে ধাওয়া করেনি এবং মিশর আক্রমণ করেনি। যদি তখন সুদানীরা সাহস করে তকিউদ্দীনের বাহিনীকে ধাওয়া করত এবং মিশর আক্রমণ করে বসত, তাহলে তকিউদ্দীনের বাহিনী এতই পরিশ্রান্ত ছিল যে, তারা সুদানীদের হাত থেকে মিশরকে রক্ষা করতে পারত না।

এসব ব্যর্থতাকে সামনে রেখে খৃস্টানরা সুলতান আইউবীর যুদ্ধকৌশল পরীক্ষা করে দেখার পরিকল্পনা হাতে নেয়। তারা প্রত্যক্ষ করছিল যে, সুলতান আইউবী স্বল্প থেকে স্বল্পতম সৈন্য দ্বারা অধিক থেকে অধিকতর সৈন্যের উপর গেরিলা হামলা চালান এবং এক স্থানে স্থির হয়ে লড়াই করার পরিবর্তে বিক্ষিপ্ত হয়ে লড়াই করেন এবং বিশাল বিশাল বাহিনীকে ছিন্ন করে পর্যুদস্ত করে ফেলেন। তাদের জানা আছে যে, এ জাতীয় আক্রমণ পরিচালনার জন্য কঠোর প্রশিক্ষণ ও বিশেষ প্রকৃতির সৈন্যের প্রয়োজন। সাধারণ সৈন্যরা জানে হুজুগের মধ্যে যুদ্ধ লড়তে। এ পেক্ষাপটেই তারা হাবশী কাবায়েলীদের মধ্যে যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টি করে ক্ষুদ্র একটি বাহিনী গঠন করে নিয়েছে এবং তাদেরকে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছে। তারা কায়রোবাসীকে রাতের আঁধারে ঝাপটে ধরতে চাচ্ছে।

সুলতান আইউবী এখন মিশরে অনুপস্থিত। তাদের বিশ্বাস, এই সুযোগে তারা ময়দান বাজিমাত করে ফেলতে সক্ষম হবে।

এই আক্রমণের কমান্ডের জন্য তাদের এমন একজন সেনা অধিনায়কের প্রয়োজন, যিনি হবেন মিশরী ফৌজের লোক, যাতে সময় ও শক্তি ব্যয় হবে কম এবং আঘাতও হানবে ঠিকানামত। তাদের এই প্রয়োজন পূরণ করে দিলেন সুলতান আইউবীর সালার আল-কিন্দ। সুদানের হাবশী সৈন্যদের লুকানোর ব্যবস্থা আল-কিন্দ-ই করে দিয়েছিলেন। তিনি মিশরী ফৌজের চার-পাঁচজন কমান্ডারকেও সঙ্গে ভিড়িয়ে নিয়েছেন। তিনি গোয়েন্দা মারফত সুদানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। সেই বাহিনী-ই এখন মিশরে অনুপ্রবেশ করছে।

❀ ❀ ❀

গভীর রাত পর্যন্ত চৌকিতে নাচ-গান চলতে থাকে। অপর চৌকির কমান্ডার বিদায় নেয়ার সময় মেজবান কমান্ডারকে বললেন, ওদেরকে বলুন, আগামী রাতে যেন আমার চৌকিতে আসে। বাদকদল আনন্দচিত্তে কমান্ডারের আবদার মেনে নেয়। তারা আর যাবেই বা কোথায়। তারা তো সুদানী তথা আল-কিন্দের প্রেরিত লোক। তারা যে বলেছিল, কারো আমন্ত্রণে এক গ্রামে গান গাইতে যাচ্ছিল, সে ছিল মিথ্যা কথা। তাদের কর্তব্য-ই ছিল, পানি পান করার নামে এই চৌকি দু'টিতে অবতরণ করবে এবং কথা দ্বারা কমান্ডারদেরকে ফাঁদে আটকে ফেলবে। নর্তকী মেয়েরা ছিল অতিশয় চিত্তাকর্ষক। কমান্ডার তাদের জালে আটকে যান। বেজায় আবেগতাড়িত হয়ে তিনি অপর চৌকির কমান্ডারকেও ডেকে আনলেন। এই সুযোগে পঞ্চাশজন হাবশী সীমান্ত পার হয়ে পাহাড়ের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পরবর্তী রাত বাদক ও নর্তকীদল অপর চৌকিতে গিয়ে পৌঁছে। সেখানেও জাঁকজমকপূর্ণ আসর জমে যায়। দুপুর রাতে নদীর কূলে টহলদানকারী দু'সৈনিক ফিরে আসে। তাদের স্থানে অপর দু'সৈনিক রওনা হতে উদ্যত হয়। কিন্তু তাদের সঙ্গীরা বাঁধা দিয়ে বলল, পাগল হয়েছ? এই আমোদ ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ? কমান্ডার তখন মেয়েদের নাচ-গানের আসরে মত্ত হয়ে আছেন। কিন্তু সৈনিকদ্বয় সঙ্গীদের আবদার উপেক্ষা করে বলল, না যেতে হবে; ওটা আমাদের কর্তব্য। এরা সেই দু'সৈনিক, যাদেরকে মেয়েরা প্রেম নিবেদন করে বলেছিল, আমরা আমাদের স্বামীদেরকে খুন করে তোমাদের সঙ্গে চলে যাব। দায়িত্বের প্রতি তাদের অতটুকু গুরুত্ব নেই, যতটুকু আগ্রহ মেয়েদের মিলন

লাভের প্রতি। মেয়েরা প্রেম নিবেদন করে বলেছিল, পরে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

ইতিপূর্বে তারা ডিউটিতে যেত ধীর পদক্ষেপে, থেমে থেমে অসর্তকতার সাথে। কিন্তু আজ রাত চৌকি থেকে বেরিয়ে সামান্য দূরে গিয়েই ঘোড়া থামিয়ে অবতরণ করে এবং কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে একসঙ্গে হেঁটে দু'জন দু'দিকে আলাদা হয়ে যায়। মেয়ে দু'টো পৃথক দু'জায়গায় তাদের অপেক্ষা করছে।

মেয়েদের সঙ্গে সুলতান আইউবীর সৈনিকদের সাক্ষাৎ হয়ে যায়। মেয়েরা তাদেরকে নদী থেকে দূরবর্তী এক পার্বত্য এলাকায় নিয়ে যায়। উভয় মেয়ে সৈনিকদের উপর তাদের রূপ-যৌবন ও ভালবাসার তেলেসমাতি প্রয়োগ করে এবং স্বামীদের হত্যার পরিকল্পনা আঁটতে থাকে। তারা সৈনিকদের জানায়, আমরা স্বামীদেরকে 'মদের সঙ্গে নিদ্রাজনক পাউডার মিশিয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। সৈনিকদের একজন তার ভালবাসার পাত্রীকে নিয়ে টিলার একদিকে এবং অপরজন তার বিপরীত দিকে অবস্থান করছে। শুধু কর্তব্য-ই নয়– আশ-পাশ এবং জগতের সব কিছু-ই ভুলে গেছে তারা।

সুলতান আইউবীর এই সৈনিকদ্বয় যেস্থানে মিশরী বণিক পরিচয়দানকারী লোকদেরকে অবস্থান করতে দেখেছিল, সেখান থেকে সামান্য দূরে নদীর কূলে চারটি ছায়া এদিক-ওদিক নড়াচড়া করছে। নদীতে হালকা তরঙ্গ বইছে। লোকগুলো অন্ধকারের মধ্যে নদীর দিকে দূরপানে তাকিয়ে তাকিয়ে কিছু একটা অবলোকন করার চেষ্টা করছে। ধীরে ধীরে অস্থির হয়ে উঠছে তারা। একজন বলল– 'তাদের তো এতক্ষণে এসে পড়ার কথা!' আরেকজন বলল– 'তাদেরকে সংবাদ তো পৌঁছানো হয়েছে, বুঝলাম না এখনো এসে পৌঁছল না কেন।' একজন কিছুক্ষণ এক নাগাড়ে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, পাল দেখা যাচ্ছে মনে হয়!' বলেই বাতি জ্বালিয়ে লোকটি ডানে-বাঁয়ে নাড়াতে শুরু করে। পরক্ষণে দূর নদীতে দু'টি প্রদীপ জ্বলে উঠে আবার নিভে যায়।

কিছুক্ষণ পর একটি পালতোলা নৌকা নদীর কূলে এসে ভিড়ে। কিনারায় দন্ডায়মান এক ব্যক্তি বলল, 'কোন শব্দ যেন না হয়। পূর্ণ নীরবতার সাথে কৃষ্ণকায় হাবশী লোকগুলো নৌকা থেকে তীরে নেমে আসতে শুরু করে। মুহূর্ত পর তার পাশে এসে ভিড়ে আরেকটি নৌকা। তার মধ্য থেকেও হাবশী লোক নেমে আসে। উভয় নৌকা-ই বিশাল। দু'নৌকা থেকে কমপক্ষে দু'শ লোক মিশরের ভূখন্ডে অবতরণ করে। তারপর ভিতর থেকে মালামাল নামাতে শুরু করে। সবই সামরিক সরঞ্জাম। মাল খালাস হওয়ামাত্র মাঝিদের নির্দেশ

দেয়া হল, বিলম্ব না করে তোমরা এক্ষুণি ফিরে যাও। মাঝিরা পাল নামিয়ে গতি বদল করে নোঙ্গর তুলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। হাবশীদের এই চালানটিও পার্বত্য এলাকায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই সৈনিকদ্বয় যখন ফিরে আসে, তখন চৌকির নাচ-গানের আসার ভেঙ্গে গেছে। আসর থেকে উঠে সৈনিকরা যার যার তাঁবুতে ফিরছে। কমান্ডার নর্তকীদের জন্য আলাদা একটি তাঁবু স্থাপন করে দিয়েছেন। একটি মেয়েকে তার খুবই ভাল লাগে। নিষ্পাপ মিষ্টি মুখ মেয়েটির। কমান্ডারের দৃষ্টিতে তারা পেশাদার মেয়ে। তিনি বাদকদের বললেন, তোমরা অমুক মেয়েটাকে আমার তাঁবুতে পাঠিয়ে দাও।

লোকগুলো মূলত শত্রুর গোয়েন্দা ও নাশকতাকারী। তাদের মিশন-ই হল, সুলতান আইউবীর এই দু'টি সেনাচৌকিকে ফাঁদে আটকিয়ে রাখা এবং কমান্ডারদেরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা করা, যাতে এই সুযোগে সুদানের হাবশী সৈন্যরা মিশরে ঢুকে যেতে পারে। এমতাবস্থায় এই চৌকির কমান্ডার যখন তাদের একটি মেয়ের সঙ্গ লাভের ইচ্ছা পোষণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার আকাংখা পূরণ করে দেয়া হল। নর্তকী কমান্ডারের সঙ্গে তার তাঁবুতে ঢুকে পড়ে।

কমান্ডার মধ্য বয়সী পুরুষ আর মেয়েটা তাগড়া যুবতী। তাঁবুতে ঢুকেই মেয়েটি গম্ভীর হয়ে যায়। বাইরের আলো-প্রদীপ নিভে গেছে। তাঁবুর মধ্যে টিম টিম করে একটি বাতি জ্বলছে। কমান্ডার মেয়েটির প্রতি মুখ করে বসে গভীর দৃষ্টিতে তাকে দেখতে শুরু করে।

'আমি কোনদিন মদপান করিনি।' কমান্ডার বললেন।

'আমার পিতাও কখনো মদপান করেননি'– মেয়েটি বলল– 'কিন্তু আপনি মদের উল্লেখ কেন করলেন? আমি তো বলিনি মদপান করব? আপনি সম্ভবত ভেবেছেন, আমাদের সঙ্গে মদ আছে আর আমি এনে আপনাকে পান করাব?'

'কথায় বলে মদ ছাড়া নারী আর নারী ছাড়া মদ জমে না'– কমান্ডার মুচকি হেসে বললেন– 'আমি মদের স্বাদ সম্পর্কে অবহিত নই এবং পরনারীর সুখ সম্পর্কেও অনবহিত।'

'তবে তো তুমি নতুন পাপী'– মেয়েটি অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলল– 'আমি তোমার থেকে কোন নগদ বিনিময় নেব না। তুমি আমার একটি দাবি মেনে নাও, তাহলে আমি সারারাত তোমার সঙ্গে অতিবাহিত করাকেই তার বিনিময় মনে করব। কথা হল, পাপ করার মধ্যে সেই স্বাদ নেই, যে স্বাদ আছে পাপ

না করার মধ্যে। তুমি পুরুষ। নির্জন পরিবেশে আমার মত একটি যুবতীর সম্মুখে উপস্থিত থাকা অবস্থায় আমার কথাগুলো তোমার নিকট বিস্ময়কর ঠেকবে। তুমি আমার কথা মানবে না। একটু ভাব, তোমার চেহারা বলছে, তুমি এই আজ প্রথমবার পাপ করার মনস্থ করেছ। এমন শীতের রাতে আমি তোমার কপালে ঘামের ফোঁটা লক্ষ করছি।'

'তুমি ঠিকই বলছ'– কমান্ডার বললেন– 'আমাদেরকে যখন সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল, তখন পাপ থেকে বেঁচে থাকার সবক শেখানো হয়েছিল। আমাদেরকে সামরিক ও দৈহিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি আত্মিক এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়ে থাকে। একারণেই সুলতান আইউবীর একশত সৈনিকের কাছে খৃস্টান বাহিনীর এক হাজার সৈনিকও হার মানতে বাধ্য হয়।'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা অবলা মেয়ে তোমাকে নিরস্ত্র করে ফেলেছে!'– নর্তকী বলল– 'তোমার রূহানী ও আখলাকী শক্তি কেড়ে নিয়ে গেছে!'

মেয়েটির কথায় কমান্ডার হতভম্ব হয়ে যান। তিনি অগত্যা বলে উঠেন– 'আমার বিলকুল ধারণা ছিল না যে, এখানে এসে তুমি এ ধরনের কথা বলবে! আমি ধারণা করেছিলাম, নির্জনে এসে তুমি আমাকে প্রেম-ভালবাসা দিয়ে মাতিয়ে তুলবে। তোমার ঠোঁটের সেই হাসি কোথায়, যা আমাকে বাধ্য করেছিল, তোমার লোকদের থেকে তোমাকে ভিক্ষা চাইতে? আমি বিনিময় হিসাবে তোমাকে দু'টি আরবী ঘোড়া দিতে প্রস্তুত আছি।'

'আর তোমার তরবারীটাও দেবে?'– মেয়েটি বলল– 'বর্শা, ঢাল এবং খঞ্জরটাও।'

'হ্যাঁ'– কিন্তু কমান্ডার নিশ্চুপ হয়ে যান। পরক্ষণে অস্থির কণ্ঠে বললেন– 'না, সৈনিক কখনো অস্ত্রমুক্ত হয় না।'

কমান্ডার বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যান। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে কিছুক্ষণ পায়চারী করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে রাগত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– 'একটি নর্তকীর মুখে এসব কথা আমার ভাল লাগছে না। তুমি কি আমার থেকে রক্ষা পেতে চাও? তুমি কি ভাবছ, আমি তোমার দেহে হাত লাগাব না?'

'হ্যাঁ'– নর্তকী বলল– 'আমি তোমার থেকে আমার দেহকে রক্ষা করতে চাই।'

'তুমি কি তোমার দেহটাকে পবিত্র মনে করছ?'

'না'– নর্তকী বলল– 'আমি আমার দেহটাকে নাপাক-ই মনে করি। তবে তোমার দেহটাকে আমি নাপাক করতে চাচ্ছি না।'

মেয়েটির বক্তব্য কমান্ডারের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। তিনি বোকার ন্যায় হা করে নর্তকীর প্রতি তাকিয়ে থাকেন। নর্তকী বলল– 'কোন কন্যা তার পিতার দেহকে অপবিত্র করতে চায় না।'

'উহ!'– কমান্ডার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আমি বৃদ্ধ আর তুমি যুবতী।' তিনি বসে পড়েন এবং মাথাটা নত করে ফেলেন।

নর্তকী একটু সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কমান্ডারের চিবুক ধরে মাথাটা উপরের দিকে তুলে বলল, এত হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি পালাব না, তোমাকে ধোঁকাও দেব না। তুমি যদি একজন 'পুরুষ' পরিচয় ধারণ করেই থাকতে চাও, তাহলে আমিও নর্তকী ও বেশ্যা হয়েই থাকব। তারপর বলল, আমি তোমাকে পিতার রূপে দেখছি। তুমি আমার দু'-একটি কথা শুনে নাও। তারপর যা ইচ্ছে হয় কর, আমি পাথর হয়ে যাব আর তুমি তাকে নিয়ে খেলা করতে থাক। আচ্ছা, তোমার কি কোন মেয়ে আছে?'

'একটি আছে।' কমান্ডার জবাব দেন।

'তার বয়স কত?'

'বার বছর।'

'আচ্ছা, তুমি যদি মৃত্যুবরণ কর আর তোমার স্ত্রী অভাবের জ্বালায় বাধ্য হয়ে তোমার মেয়েটাকে গায়ক-নর্তকীদের কাছে বিক্রি করে দেয়, তাহলে তোমার আত্মার কী দশা হবে? তোমার আত্মা কি তখন এসব মরু বিয়াবান ও পাহাড়ে-জঙ্গলে চীৎকার করে ফিরবে না?

কমান্ডার মেয়েটার প্রতি আড় চোখে তাকাতে শুরু করেন। তার কপালের উপর আরো কয়েক ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠেছে।

'তুমি একটু কল্পনা কর'– মেয়েটা বলল– 'মনে কর, তুমি মৃত্যুবরণ করেছ এবং তোমার কন্যা এক পাপিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে তাঁবুতে বসে আছে এবং লোকটা তাকে বলছে, মদ আন; 'মদ ছাড়া নারী আর নারী ছাড়া মদ জমে না।'

কমান্ডারের ওষ্ঠাধর কেঁপে ওঠে। হঠাৎ করে গর্জে উঠে বললেন, বেরিয়ে যাও তুমি এখানে থেকে। কুলটা, বেশ্যা!

মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল– 'আমার পিতা যদি আমাকে ও তোমাকে দু'জনকেই খুন করে ফেলতেন!'

মেয়েটির দু'চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে আসে। কমান্ডার বসা থেকে উঠে তাঁবুর মধ্যে পায়চারী করতে শুরু করেন। মেয়েটি তার মানসিক অবস্থা ও ক্ষোভ

উপেক্ষা করে বলল– 'বৃদ্ধ বলে আমি তোমাকে ঘৃণা করছি না। আমি এমন এমন বৃদ্ধ লোকদের তাঁবুতে রাত যাপন করেছি, বার্ধক্য যাদেরকে ভিতর থেকে ফোকলা করে ফেলেছে। তারা ঐশ্বর্যের বলে তাদের মৃতদেহে আত্মার সঞ্চারণ করতে চাইত। সে তুলনায় তুমি অতটা বৃদ্ধ নও। আসল কথা হল, তোমার গঠন-আকৃতি ঠিক আমার পিতার মত। আমি তোমাকে যে কথাগুলো বললাম, তা আগে আমার মাথায় ছিল না। আমি শুধু নাচতে আর অঙ্গুলি হেলনে নাচাতে জানতাম। তুমি নিজেই ভেবে দেখ, আমার মত একটা বেশ্যা নর্তকীর মাথায় এমন সব কথা আসল কেন, যা তোমাকে বিস্মিত করে তুলেছে?'

কমান্ডার মেয়েটির প্রতি তাকান। তার রাগ পানি হয়ে গেছে। মেয়েটি বলল– 'আমার পিতা-মাতার চেহারা ও দৈহিক গঠন আমার ভালভাবে স্মরণ আছে। তাদের গায়ের গন্ধও আমার মনে আছে। তোমার কন্যার বয়স বার বছর। আমার বয়স যখন নয়-দশ বছর ছিল, তখন বাবা মারা যান। তিনি আমাকে অনেক স্নেহ করতেন। মিশরের সেনাবাহিনীর সৈনিক ছিলেন। তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বেই মারা যান। তখন আমার মা যুবতী এবং নিতান্ত অসহায়। তিনি পেটের দায়ে আমাকে অর্থের বিনিময়ে এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেন। বিনিময়টা তিনি আমার চোখের সামনে গ্রহণ করেছিলেন। লোকটা যখন আমার মাকে বলেছিল, উঁচু পর্যায়ের একজন ভাল মানুষের সঙ্গে আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে দেব। আমি কাঁদতে শুরু করলে মা বললেন, কাঁদিস্‌নে মা, ইনি তোর চাচা। ইনি তোকে তোর পিতার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। তারপর আমি বার বছর পর্যন্ত পিতাকে সন্ধান করে ফিরছি। আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাচ শেখানো হয়েছে যে, তোমাকে তোমার পিতার নিকট নিয়ে যাব। বয়স বাড়ার পর আমি বুঝে ফেলি যে, আমাকে যা কিছু বলা হয়েছে ও হচ্ছে, সবই প্রতারণা। ওরা কিভাবে আমাকে আমার পিতার নিকট নিয়ে যাবে? তিনি তো মারা গেছেন! ততক্ষণে নাচ-গান আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আমাকে জীবনে কেউ প্রহার করেনি। পিতার নামে আমি নাচের প্রশিক্ষণ নিয়েছি। আমার ওস্তাদ ও মনিব আমার সঙ্গে ভাল আচরণ করতেন এবং ভাল ভাল খাবার খাওয়াতেন। তারপর একদিন আমার যৌবন আসে। তখন আমি আমার মূল্য আন্দাজ করতে সক্ষম হই। সেই মূল্য আমার সব চেতনাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। আমি একটি সুদর্শন পাথরে পরিণত হয়ে যাই। কিন্তু

তোমাকে দেখার পর আমার মৃত চেতনা আবার জেগে উঠেছে।'

মেয়েটির দু'চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। সে অশ্রু ঝর ঝর নেত্রে বলতে শুরু করল, এ মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, আমার পিতার আত্মা এই তাঁবুটার চার পার্শ্বে ঘুরে ফিরছে। এই তাঁবুতে প্রবেশ করার আগে কখনো আমার এমনটা মনে হয়নি। মাঝে-মধ্যে মনে হত, যেন আমার অস্তিত্বটা-ই আমার পিতার আত্মা, যিনি দিগ্বিদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

তুমি যদি একটি মূল্যবান নর্তকী-ই ছিলে, তাহলে এই পাহাড়-জঙ্গলে কী অর্জন করতে এসেছ?' কমান্ডার জিজ্ঞাসা করেন।

'আমি ভাড়ায় এসেছি'– নর্তকী জবাব দেয়– 'আমি ওদেরকে চিনিনা। অন্যান্য নর্তকীদেরও পূর্বে চিনতাম না। আমাকে বলা হয়েছিল, সীমান্ত এলাকায় যেতে হবে এবং ওখানকার সেনাচৌকিতে যদি প্রয়োজন পড়ে, বিনা পরিশ্রমে নাচতে হবে। মিশরের ইজ্জত ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী সৈনিকদেরকে খুশী করে আমি যে আনন্দ পাচ্ছি, অন্য কিছুতে আমি ততটা আনন্দ পেতাম না। আমার অনেক সময় মনে হয়, আমার নাচে আমার মুজাহিদ পিতার আত্মাও খুশী হন। আমি একটি প্রতারণা – নিজের জন্যও, অন্যের জন্যও। কিন্তু আমি স্বদেশের মুজাহিদদের দেহকে অপবিত্র করতে পারি না। আগের চৌকির কমান্ডার আমাকে তার তাঁবুতে ডেকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু আমি তার আবেগ প্রত্যাখ্যান করেছি। তোমার কাছে শুধু এজন্য এসেছি যে, চেহারা-সুরতে তোমাকে আমার পিতার মত মনে হয়েছিল।'

নর্তকী কমান্ডারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। কমান্ডারের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তুলে চোখের সঙ্গে লাগায়। তারপর সেই হাতে চুম্বন করে। কমান্ডার নিজের অপর হাতটা তার মাথায় রেখে জিজ্ঞাসা করেন– 'তোমার নাম কী?'

'আমার মনিব আমাকে বারক নামে ডাকেন। আব্বা ডাকতেন যোহরা নামে।' নর্তকী জবাব দেয়।

'যাও, যোহরা!'– কমান্ডার স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন– 'নিজ তাঁবুতে চলে যাও।'

'তুমি ঘুমিয়ে পড়'– যোহরা বলল– 'আগে তুমি ঘুমাও, আমি তারপর যাব।'

✿ ✿ ✿

রাত কেটে যাচ্ছে। বাদক দলের দু'সদস্য তাঁবুতে জাগ্রত বসে আছে। অন্যান্য নর্তকী ও অবশিষ্ট বাদকরা গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। জাগ্রতদের একজন অপরজনকে বলল, আমাদের কর্মপদ্ধতি সঠিক বলে মনে হচ্ছে না।

আমরা মেয়েগুলোকে এই বলে এনেছিলাম যে, তারা নেচে-গেয়ে সৈন্যদের মনোরঞ্জন করবে। তাদেরকে বলে দেয়া আবশ্যক ছিল, আমাদের আসল উদ্দেশ্য কী।'

'একজন নর্তকীকে বিশ্বাস করা যায় না'– অপরজন বলল– 'যে মেয়েটি এখন কমান্ডারের তাঁবুতে অবস্থান করছে, সে আবেগের বশবর্তী হয়ে আলাদা পুরস্কার গ্রহণ করে কমান্ডারকে বলে দিতে পারে, আমরা সীমান্ত চৌকিগুলোর জন্য ধোঁকা ও প্রতারণা হয়ে এসেছি। এজন্যে কোন নর্তকীকে আসল রহস্য বলা ঠিক হবে না। আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করে বিনিময় পাওয়া-ই ওদের জন্য যথেষ্ট। আমরা তাদেরকে দাবি অনুপাতে পারিশ্রমিক দিয়েছি। কাজ আমাদের হয়ে গেছে।'

আমাদের উদ্দেশ্য কী, যদি মেয়েটাকে বলে দিতাম, তাহলে সে কমান্ডারকে ভালভাবে অন্ধ করে ফেলত। তাকে সে এমনভাবে ফেঁসে ফেলত যে, তারই সহযোগিতায় আমরা হাবশীদেরকে ভিতরে নিয়ে আসতাম।'

ওস্তাদ আমাদের চেয়ে ভাল বুঝেন। এই মেয়েগুলো আমাদের হাতিয়ার। কেউ হাতিয়ারকে রহস্য জানায় না। এটা নিরাপদ নয়। কমান্ডার এই চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন যে, মেয়েটি তাকে পাপ থেকে রক্ষা করেছে এবং তার হৃদয়ে পিতৃবোধ জাগিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তার মাথার কাছে বসে থাকে। তারপর এক সময়ে ধীর পায়ে বের হয়ে নিজের তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

এখন ভোর। নায়ক-নর্তকীরা যখন জাগ্রত হয়, তখন সূর্য উপরে ওঠে গেছে। মেয়েরা জানেনা, এখন তাদের গন্তব্য কোথায়। বাদক পুরুষরা যখন তাদেরকে একদিকে নিয়ে রওনা হয়, কমান্ডার তখন তাঁর তাঁবুর বাইরে দন্ডায়মান। যোহরা দৌড়ে তার নিকট এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলল– 'আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।' কমান্ডার তার মাথায় হাত রাখেন। যোহরা কমান্ডারের অপর হাতটি ধরে টেনে নিয়ে নিজের চোখের সঙ্গে লাগায় এবং আদ্র চোখে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসে।

তারা নদীর দিকে রওনা হয়ে যায়। পথে একদিক থেকে দু'টি উট এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে যায়। দু'উটের দু'আরোহী নীচে অবতরণ করে উটগুলোকে বসিয়ে নর্তকী মেয়ে দু'টোকে উটের পিঠে বসিয়ে রওনা হয়ে যায়। এই উষ্ট্রারোহীদ্বয় তাদের-ই দলের মানুষ। তারা নিকটেই কোথাও তাদের অপেক্ষায় লুকিয়ে ছিল।

চারটি মেয়েসহ বণিক কাফেলা যে স্থানে অবস্থান করেছিল, এরা সেখানে গিয়ে পৌঁছে। উভয় দল পরস্পর এমনভাবে মিলিত হয়, যেন কারো সঙ্গে কারো পরিচয় নেই। বণিক কাফেলার মেয়েরা গায়কদলের মেয়েদেরকে পুরুষদের থেকে সরিয়ে নদীর কূলে নিয়ে যায়। বণিক কাফেলার মেয়েরা যোহরা ও তার সঙ্গী মেয়েকে জানায়, আমরা তাদের স্ত্রী-কন্যা; ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে এখানে এসেছি।

ওদিকে পুরুষদের আসরে আসল মিশন নিয়ে আলোচনা চলছে। বাদকরা তাদের দু'রাতের কারগুজারী শোনায়। বণিক কাফেলার লোকেরা জানায়, তোমাদের নাচ-গানের আসরের সুযোগে অন্তত একশত হাবশী মিশর ঢুকে পড়েছে। আর আমাদের মেয়েরা দু'জন সৈনিককে ফাঁদে ফেলে ঢুকিয়েছে দু'শ-রও বেশি হাবশীকে।

নিজ নিজ দলের কারগুজারী শোনানোর পর তারা সিদ্ধান্ত নেয়, এই নাচ-গান দ্বারা তেমন বেশি হাবশীকে ভিতরে ঢুকানো যাবে না। নদীর পথটা-ই বেশি উপযোগী। নৌকায় করেই অধিক থেকে অধিকতর লোক ভিতরে ঢুকতে পারবে। তাই সিদ্ধান্ত হল, মেয়েরা এই দু'সৈনিক ছাড়াও আরো দু'-চারজন সান্ত্রীর সঙ্গে অনুরূপ খেলা খেলবে, যাতে প্রতি রাতে নৌকা আসতে পারে। এ-ও সিদ্ধান্ত হল যে, যোহরা ও তার সঙ্গী নর্তকীকে এখানেই এক স্থানে রাখা হবে। কিন্তু তাদের কোন রহস্য জানতে দেয়া হবে না।

বৈঠক শেষ হয়ে গেছে। বাদক পুরুষরা তাদের মেয়েদের ডেকে এনে বলল, তোমাদের আপাতত কোন কাজ নেই। এ জায়গাটা খুবই মনোরম। তোমরা কয়েকটা দিন এখানে-ই অবসর কাটাও। তারা মেয়েদেরকে এমনভাবে উৎসাহিত করে যে, তারা সম্মত হয়ে যায়। অপর দলের মেয়েরা তাদেরকে আপন ও ঘনিষ্ট বানিয়ে নেয়। কিন্তু খানিকটা দূরে আলাদাভাবে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

এখন রাত। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু যোহরার চোখে ঘুম আসছে না। তার বারবার কেবল কমান্ডারের কথা মনে পড়ছে। কমান্ডারের ব্যক্তিত্ব যোহরাকে প্রভাবিত করে ফেলেছে। প্রথমত একারণে যে, কমান্ডারের মধ্যে সে তার পিতার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই কমান্ডার-ই প্রথম পুরুষ, যে তাকে খেলনা মনে করার পরিবর্তে তার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়েছে। তৃতীয়ত, কমান্ডার তাকে বারক নয়– যোহরা নামে ডেকেছে।

যোহরা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায়। পা টিপে টিপে তাঁবু থেকে বাইরে

বেরিয়ে আসে। রাস্তা তার আগে থেকেই চেনা। এবার দ্রুতপায়ে চৌকি অভিমুখে হাটা দেয় সে। যোহরা এত দ্রুত আর এত দীর্ঘ পথ হাঁটায় অভ্যস্ত নয়। কিন্তু তার আবেগ তাকে শক্তি জুগিয়ে চলেছে।

যোহরা চৌকিতে পৌঁছে যায়। কমান্ডারের তাঁবু তার আগে থেকেই চেনা। তাঁবুতে ঢুকে পড়ে সে। কমান্ডার গভীর ঘুমে অচেতন। কারো আগমন টের পেয়ে তার চোখ খুলে যায়। যোহরা অন্ধকারের মধ্যে কমান্ডারের মুখে হাত রাখে। কমান্ডার চোখ খুলেই বিড়বিড় করে উঠে হাত ধরে ফেলে। তুলতুলে নরম ছোট্ট হাত। কমান্ডার বুঝে ফেলে, এ হাত নারীর। তিনি কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– 'কে?'

'যোহরা।'

কমান্ডার ধড়মড় করে উঠে বসেন। যোহরা বলল– 'তোমাকে দেখতে এসেছি। শুড়ে পড়, আমি চলে যাচ্ছি।'

কমান্ডার বাতিটা জ্বালিয়ে দেন। যোহরাকে জিজ্ঞেস করেন, কোথা থেকে এসেছ? তার কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময়। যোহরা তার মনের কথা খুলে বলল। কমান্ডার বাইরে বেরিয়ে আসেন। দু'টি ঘোড়া প্রস্তুত করেন এবং যোহরাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটিতে তাকে চড়ান এবং অপরটিতে নিজে চড়ে বসেন। ঘোড়া চলতে শুরু করে।

দু'টি ঘোড়া পাশাপাশি চলছে। যোহরা আবেগের ভাষায় কথা বলছে। কমান্ডার মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকেন। গন্তব্য থেকে কিন্তু দূরে থাকতেই যোহরা কমান্ডারকে থামতে বলে এবং তাকে ফিরে যেতে বলে। কমান্ডার তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ফিরে যান।

যোহরা তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছে। তার দলের এক ব্যক্তি সজাগ বসে আছে। যোহরাকে দেখেই জিজ্ঞেস করে, কোথায় গিয়েছিলে? যোহরা বলল, একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম। লোকটি যোহরাকে ধমকাতে শুরু করে। তার মনে সন্দেহ জাগে। যোহরা বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

'আমাদের অনুমতি ছাড়া তোমরা কোথাও যেতে পারবে না।' লোকটা নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

'আমি তোমাদের ক্রীতদাসী নই'– যোহরা বলল– 'আমি যে পারিশ্রমিক নিয়েছি, তার বিনিময়ে কাজ যা করার ছিল, করে ফেলেছি। এখন আর আমি কারো আদেশ-নিষেধ পালন করতে বাধ্য নই।'

'তোমরা সম্ভবত মালিকের নিকট জীবিত ফেরত যেতে চাও না'– লোকটা

বলল– 'এখান থেকে আমাদের অনুমতি ছাড়া কোথাও গিয়ে দেখ।'

✿ ✿ ✿

সুলতান আইউবীর সীমন্ত রক্ষী সৈনিকদ্বয় প্রতিদিন ডিউটিতে বেরিয়ে নদীর কূলে এসে পড়ছে আর তাদের প্রেয়সী মেয়ে দু'টো তাদেরকে ভালবাসার মূলা দেখিয়ে দেখিয়ে একদিকে সরিয়ে নিচ্ছে। এই সুযোগে সুদানী হাবশী বোঝাই পালতোলা নৌকা এসে কূলে ভিড়ছে এবং সৈন্যরা তীরে নেমে পর্বতমালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বণিক কাফেলার চারটি মেয়ে আরো দু'জন মিশরী সৈন্যকে নিজেদের 'বৃদ্ধ স্বামীদের স্ত্রী' বানিয়ে এবং তাদের সঙ্গে চলে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে আটকে ফেলে।

মিশরের এই সীমান্তবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে এত অধিক সুদানী হাবশী সৈন্য এসে জড়ো হয়েছে যে, তারা ইচ্ছে করলে রাতের বেলা সীমান্ত চৌকিগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে মিশরী সৈন্যদেরকে অতি অনায়াসে খতম করে ফেলতে পারে। কিন্তু তাদের কমান্ডারগণ ভেবে রেখেছেন অন্য কিছু। সীমান্ত চৌকি হামলার সংবাদ কায়রো পৌঁছে যাবে। তার ফল এই দাঁড়াবে যে, কায়রো থেকে সৈন্য এসে যাবে এবং খৃষ্টানদের আকষ্কিকভাবে কায়রো আক্রমণের পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দেবে।

নীল নদের উপকূলীয় পার্বত্য এলাকায় সুদানী হাবশী সৈন্যসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলছে। কায়রো আক্রমণ পরিচালনা করা যে খৃস্টান কমান্ডারদের দায়িত্ব, সুদানে খৃষ্টান উপদেষ্টাগণ তাদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছে। তারা কিছুদিনের মধ্যে মিশরের সীমান্ত অতিক্রম করে পাহাড়ী এলাকায় অনুপ্রবেশ এবং হামলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। সালার আল-কিন্দ এখনো কায়রোতে বহাল তবিয়তে তার দায়িত্ব পালন করছেন। তার কোন আচরণে কারো মনে সন্দেহ জাগেনি যে, তিনি বড় রকমের একটি বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত। রাতে ঘরে বসেই তিনি রিপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন, গত রাতে কতজন হাবশী মিশরের সীমান্ত অতিক্রম করেছে এবং এযাবত তাদের সংখ্যা কতোয় দাঁড়িয়েছে। আক্রমণের মূল নেতৃত্ব তাঁকেই দিতে হবে। তিনি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে রেখেছেন।

মিশরের দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় হাজার হাজার সুদানী হাবশী সৈন্যের সমাগম। এবার তাদের ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী বলি দেয়ার পালা– মানুষ বলি। প্রথমে তাদের পরস্পরে কানাঘুষা চলে। তাদের দাবি, মানুষ বলি দিতে হবে। আল-কিন্দ-এর লোকেরা তাদেরকে এ দাবি প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য জোর

প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু হাবশীদের পুরোহিত দাবিতে অটল। হাবশীরা তাকে বিরক্ত করে তোলে যে, বলুন, মানুষ বলী কবে হবে? তাদের স্পষ্ট কথা, অন্যথায় আমরা ফিরে যাব। পুরোহিতদের বলা হল, আপনারা আপনাদেরই মধ্য থেকে একজনকে ধরে বলি দিয়ে দিন। তারা জবাব দেয়, না, এই বলি কবুল হয় না। বলির জন্য সেই অঞ্চলের মানুষ হতে হয়, যেখানে হামলা হবে। যারা আক্রমণ করে, তারা নিজেদের লোক বলি দেয়ার নিয়ম নেই।

অবশেষে তাদেরকে বলা হল, হামলার একদিন আগে মিশরের কোন এক ব্যক্তিকে ধরে এনে তোমাদের হাতে তুলে দেয়া হবে। হাবশীদের পুরোহিতগণ বলল– 'না. আমরা মানুষ এখনই চাই। অনেকদিন পর্যন্ত তাকে বিশেষ ধরনের খাবার খাইয়ে পুষতে হবে, মোটাতাজা করতে হবে এবং তার উপর বিশেষ আমল প্রয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি এই বলি উপলক্ষে আমাদেরও পূজা-অর্চনা করতে হবে। আরো কথা আছে। আমাদের হিসাব-নিকাশ করতে হবে, বলি পুরুষের দিতে হবে, না নারীর। নাকি উভয়ের।

সে রাতে-ই আল-কিন্দকে সংবাদ পাঠানো হয়, হাবশীরা বলি দেয়ার জন্য মানুষ দাবি করছে। জবাবে আল-কিন্দ বললেন– 'এতে ভাবনার কী আছে। একটা মানুষ ধরে নিয়ে তাদের হাতে তুলে দাও।'

'কিন্তু তারা এখনো বলেনি যে, বলি একজন পুরুষের হবে নাকি নারীর কিংবা উভয়ের।'

'তারা যা-ই দাবি করে পূরণ কর'– আল-কিন্দ বললেন– 'ক'দিন পর যখন আমরা কায়রোতে হামলা চালাব, তখন কতগুলো মানুষ প্রাণ হারাবে, তার ঠিক নেই। তার আগেই যদি দু'-একজন মেরে ফেলা হয়, তাতে ক্ষতির কী আছে!'

আল-কিন্দ গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান। এমন সময়ে এক খৃস্টান কমান্ডার ভিতরে প্রবেশ করে। লোকটির পরনে মিশরী পোশাক। ভিতরে প্রবেশ করেই সে মুখের কৃত্রিম দাড়ি খুলে ফেলে। সে আল-কিন্দকে জিজ্ঞেস করে, আপনাকে অস্থির এবং চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

'হাবশীরা তাদের রীতি পালন করতে চাচ্ছে'– আল-কিন্দ জবাব দেয়– 'তারা বলি দেয়ার জন্য মানুষ চাচ্ছে।'

'তা আপনি ভাবছেন কী?'

'আমি ভাবছি, হামলার একদিন আগে একজন মানুষ তাদের হাতে তুলে দেব।'

'না'– খৃস্টান কমান্ডার বলল– 'তারা যদি এখনই বলি দিতে চেয়ে থাকে,

আপনি তাদের দাবি পূরণ করুন। এখন-ই তাদের প্রথা পালনের ব্যবস্থা করুন। আপনি সুদান যাননি। আমরা তাদেরকে ধর্মের নামে এ পর্যন্ত এনেছি। আপনি সম্ভবত মানুষকে কাজে লাগাতে জানেন না। সালাহুদ্দীন আইউবী আপনাকে শুধু লড়াই করতে শিখিয়েছেন। কিন্তু মানুষকে বিনা তলোয়ারে কিভাবে খুন করা যায়, তা আপনাকে আমাদের নিকট শিখতে হবে। একজন লোককে কাজে লাগাতে হলে তার ধর্মকে ব্যবহার করুন। তাদের মধ্যে তাদের ধর্মীয় উন্মাদনা উস্কে দিয়ে তাদের বিবেককে মুঠোয় নিয়ে আসুন। তাদের কাজে এবং অর্থহীন প্রথা-পার্বনের বিরোধিতা না করে বরং তার অনুসরণ করুন। সাধারণ মানুষের মন-মস্তিষ্ক ধর্ম আর কুসংস্কার বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে। আমরা বহু মুসলমানকে হাতে এনেছি এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছি। সবাইকে ধর্ম ও কুসংস্কারের অস্ত্র দ্বারা হাত করেছি। মুসলমান ধর্মের নামে অতি তাড়াতাড়ি আমাদের জালে এসে ধরা দেয়। এই হাবশীরা তো জংলী। আমরা তাদেরকে এক বছরেরও অধিক আগে দুই সুদানীকে ধরে তাদের হাতে তুলে দিয়ে বলেছি, এরা মিশরী। তারা তাদেরকে যবাই করে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল।

'তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তারা বলির জন্য পুরুষ চায়, না নারী।' আল-কিন্দ বললেন।

'এই মুহূর্তে আপনার কিন্তু ওখানে যাওয়া খুবই জরুরী'— খৃস্টান কমান্ডার বলল— 'কিন্তু আমি আপনাকে তাদের সম্মুখে অন্য এক পন্থায় নিয়ে যাব। ওরা অত্যন্ত জংলী ও রক্তপিপাসু যোদ্ধা। এ মুহূর্তে মিশরে তাদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। আমরা যদি তাদের উপর ধর্মের ভূত চাপিয়ে রাখি এবং তাদেরকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করি যে, এটা আমাদের নয়— তোমাদের-ই যুদ্ধ, তাহলে তাদের মাত্র এক হাজার যোদ্ধা-ই কায়রোর সব সৈন্যকে লাশে পরিণত করে ফেলতে সক্ষম হবে। আমরা তাদেরকে এই বলে এনেছি যে, আমরা তাদেরকে তোমাদের খোদার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি এবং তোমাদের দুশমনরা তোমাদের খোদার ভূখন্ড কব্জা করে আছে।'

'আমি যাব।' আল-কিন্দ বললেন।

আল-কিন্দ মিশরের উপর সুদানীদের শাসন কামনা করতেন। কিছুদিন আগে তিনি একজন গাদ্দারের নিকট তার এই মনোবাঞ্ছার কথা প্রকাশ করে বসেন। গাদ্দার তার আকাঙ্খাকে দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত করে দেয় এবং খৃস্টানদের সঙ্গে তার যোগাযোগ করিয়ে দেয়।

খৃস্টানরা তার সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, মিশরকে দু'ভাগে বিভক্ত করে এক অংশ তোমাকে দিয়ে দেব আর অবশিষ্টাংশ সুদানকে দেব। ঐতিহাসিকগণ আল-কিন্দ-এর বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের কাহিনী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেননি। সে যুগের মহান ব্যক্তিত্ব কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় এ বিষয়টা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আল-কিন্দ খৃস্টান ও সুদানী নেতৃবৃন্দের সহায়তায় সভ্যতা-বিবর্জিত হিংস্র হাবশীদের উপর তাদের ধর্মের ভূত সাওয়ার করে তাদের উপর যুদ্ধ-উন্মাদনা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং তিনি স্বয়ং তাদের ধর্মগুরুতে পরিণত হন। হাবশীদেরকে বলা হয়েছিল, ইনি তোমাদের খোদার সেই দূত, যিনি শত শত বছর ধরে খোদার নিকট আসা-যাওয়া করছেন।

✿ ✿ ✿

সে রাতটা ছিল অন্ধকার। মিশরের আকাশ ছিল তারায় তারায় উজ্জ্বল। কায়রো শহর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। দিন কয়েক পরই তাদের উপর কী মহাপ্রলয় সংঘটিত হতে যাচ্ছে, তা কারো জানা ছিল না। মিশরের সীমান্তরক্ষী বাহিনীও ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে শুধু কয়েকজন টহলসেনা। তারাও জেগেই আছে শুধু– কর্তব্যের প্রতি তাদের কোনই মনোযোগ নেই।

নদীপথে আগ্রাসন রোধকল্পে নীল নদের কোল ঘেঁষে যে চৌকিটি স্থাপন করা হয়েছিল এবং তার থেকে মাইল চারেক দূরে অপর যে চৌকিটি পার্বত্য এলাকাকে নিরাপদ করার জন্য বসানো হয়েছিল, সেই দু'টি চৌকির দু'জন করে চারজন টহলসেনা চারটি মেয়ের রূপের জালে আটকে আছে। মেয়েগুলো তাদেরকে আলাদা আলাদা নিয়ে যাচ্ছে। আজ তারা আরো বেশি তৎপর।

যোহরা ও তার সঙ্গী নর্তকীর দল থেকে কিছু দূরে একটি তাঁবুতে শুয়ে আছে। দলের বাদক পুরুষরা বাহ্যত ঘুমিয়ে থাকলেও মূলত তারা সজাগ। তাদেরকে বলা আছে, আজকের রাতটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তোমরা জেগে থাকবে। উভয় দলের প্রতি নির্দেশ, বাইরের কোন মানুষ যেন নদীর কূলে এবং এই পার্বত্য এলাকার কাছে আসতে না পারে। কেউ এসে পড়লে তাকে যেন ধরে ভিতরে নিয়ে আসা হয়।

কিছুক্ষণ পর এক বাদক শোয়া থেকে উঠে পড়ে। সে প্রথমে তাঁবু থেকে বের হয়ে বাইরে ঘোরাফেরা করে। তারপর মেয়ে দু'টো যে তাঁবুতে আছে, তার ভিতরে উঁকি দিয়ে তাকায়। কিন্তু ভিতরে কিছুই দেখা গেল না। বাদক ভিতরে ঢুকে পড়ে। গভীরভাবে দেখার চেষ্টা করে। তার মনে সন্দেহ জাগে।

এবার দেয়াশলাই জ্বালিয়ে দেখে। যোহরা নেই! অপর মেয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। বাদক তাকে জাগাল না। তার জানা আছে, যোহরা কোথায় গিয়ে থাকতে পারে। চৌকির কমান্ডার ছাড়া আর কোথায় যাবে সে! এখন সমস্যা এই হতে পারে যে, কমান্ডার যোহরার সঙ্গে এদিকে আসবে আর তার প্রহরীদের না পেয়ে অনুসন্ধান করবে। এমনও হতে পারে, তিনি নদীর কূলে সেই জায়গাটায় পৌঁছে যাবেন, যাকে আজ রাত বাইরের জগত থেকে লুকিয়ে রাখা আবশ্যক।

বাদক তার দু'জন সঙ্গীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে জানায়, আমাদের একটি মেয়ে উধাও হয়ে গেছে। সম্ভবত সে চৌকিতে গিয়ে থাকবে। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, নদী থেকে দূরে কোথাও ওঁত পাততে হবে এবং কমান্ডার যদি মেয়েটির সঙ্গে এদিকে আসে, তাহলে উভয়কে ধরে আমাদের কমান্ডারের হাতে তুলে দিতে হবে। প্রয়োজনে দু'জনকে হত্যা করে লাশ দু'টো নদীতে ফেলে দেয়া হবে।

এই পার্বত্য এলাকার ভিতরের জগত জেগে আছে। বিশাল-বিস্তৃত এই এলাকা সম্পর্কে বাইরের মানুষ সম্পূর্ণ অনবহিত। প্রথমত, ভূখন্ডটা লোকালয় থেকে বহুদূরে এবং আশ-পাশ দিয়ে মানুষ চলাচলের কোন রাস্তা নেই। আরো একটি কারণ হল, জনমনে প্রসিদ্ধ আছে, পাহাড়গুলোর মধ্যে প্রেতাত্মারা লড়াই করে বেড়ায় এবং কোন মানুষ যদি তার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে, তাহলে তার শরীরের গোস্ত উধাও হয়ে কংকালটা শুধু অবশিষ্ট থাকে। আরো কথিত আছে, এই পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরে পাহাড় কেটে কেটে ফেরাউনদের বিরাট বিরাট প্রতিকৃতি নির্মাণ করা হয়েছে এবং পাহাড়গুলোকে ভিতর থেকে ফোকলা করে প্রাসাদোপম ভবন তৈরী করা হয়েছে।

আজ রাতে পাতাল প্রাসাদগুলো আলোয় ঝলমল করছে। চারদিক পাহাড়-বেষ্টিত একটি ময়দান। হাজার হাজার সুদানী হাবশী সমবেত আজ। তাদেরকে উঁচু শব্দে কথা বলতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। আজ তাদেরকে তাদের খোদাকে দেখানো হবে।

হাবশীরা ভয়ে প্রকম্পিত ও আবেগে আপ্লুত। ভয়ে তারা পরস্পর কানাঘুষাও করছে না। এই পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে তারা সম্যক অবহিত। তারা জানে, এই মুহূর্তে তারা যে পাহাড়টির প্রতি মুখ করে বসে আছে, তার মধ্যভাগে উঁচুতে বিশাল এক মূর্তি বিদ্যমান। এটি আবু সম্বল মূর্তি। এই মূর্তি সম্পর্কে-ই হাবশীদের জানানো হয়েছিল, এটি তাদের খোদার প্রতিকৃতি এবং কোন এক

রাতে তাদের এই খোদা মানুষের রূপে তাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হবেন।

সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে সারা মাঠে। হঠাৎ বিকট একটা শব্দ শোনা গেল, যেন বজ্রপাত হয়েছে। হাবশীরা পূর্ব থেকেই নীরব। এই গর্জন তাদের নিঃশ্বাসও বন্ধ করে দেয়। তার পরক্ষণেই একটি শব্দ ভেসে আসে– 'খোদা জাগ্রত হচ্ছেন। তোমরা সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাও– উপর দিকে দৃষ্টিপাত কর।' বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত পর্বতমালার অভ্যন্তরে শব্দটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে কানে বাজতে থাকে। আকাশে দু'টি আগুনের গোলা উড়তে দেখা যায়। শূন্যে কয়েকটা চক্কর কেটে গোলা দু'টো সম্মুখের পাহাড়ের দিকে ছুটে যায় এবং পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। গোলা দু'টো পাহাড়ের যে অংশের সঙ্গে ধাক্কা খায়, সেখান থেকে একটি অগ্নিশিখা তৈরী হয়ে যায়। আবু সম্বল মূর্তিটির অবস্থান শিলাটির পিছনে এবং কিছু উপরে। শিখার কম্পমান আলো মূর্তিটির ভয়ানক চেহারায় নিপতিত হলে দেখা যাচ্ছে, যেন মূর্তিটি দু'চোখের পাতা ও মুখ খুলছে আর বন্ধ করছে। এমনও মনে হচ্ছে, যেন তার চেহারাটা ডানে-বাঁয়ে দুলছে।

সমবেত হাবশী জনতা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। তাদের পুরোহিতগণ সেজদা থেকে মাথা তোলেন। তারা হাত উপরে তুলে বাহু প্রসারিত করে প্রার্থনা করতে শুরু করেন। প্রধান পুরোহিত উচ্চশব্দে বলে উঠেন'– আগুন ও পানির খোদা! আগুন দ্বারা কাঠ ভস্মকারী ও নদী-সমুদ্রকে পানি দানকারী খোদা! আমরা তোমাকে দেখে ফেলেছি। বল, আমরা তোমার পায়ে ক'টি মানুষ অর্পণ করব? বল, পুরুষ চাই না নারী?

'একটি পুরুষ একটি নারী'– পর্বতমালার অভ্যন্তর থেকে আওয়াজ আসে– 'তোমরা এখনো আমাকে দেখনি। আমি মানুষের রূপে তোমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করব। তোমরা যদি আমার দুশমনের রক্ত না ঝরাও, তাহলে তোমাদের প্রত্যেককে আমি এই পর্বতমালার পাথরের ন্যায় পাথরে পরিণত করে দেব। তারপর চিরদিন তোমরা রোদে পুড়তে থাকবে। তোমাদের কেউ যদি যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর, উত্তপ্ত মরুভূমির বালি তাকে চুষে খেয়ে ফেলবে। তোমরা অপেক্ষা কর– আমার অপেক্ষা করতে থাক।'

নীরবতা আরো গভীর হয়ে যায়। শিখাটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করে। পাহাড়ের ভিতর থেকে হাবশীদের ধর্মীয় সঙ্গীতের সুর ভেসে আসতে শুরু করে। এটা তাদের সেই সঙ্গীত, যাকে তারা ধর্মীয় উৎসবগুলোতে উপাসনার সময় গেয়ে থাকে। এখন সঙ্গীতটি গাওয়া হচ্ছে সম্মিলিত কণ্ঠে।

সঙ্গে বাজছে সারেন্দা। মাঠে উপবিষ্ট হাজার হাজার হাবশী জনতা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। সবাই নিশ্চিত, সঙ্গীতটা তাদের মধ্য থেকে কেউ গাইছে না। সুরটা অদৃশ্য থেকে আসছে।

❁ ❁ ❁

যোহ্‌রা চৌকির কমান্ডারের নিকট বসে আছে। আগের চেয়ে বেশী আবেগ ঝরছে তার কথা থেকে। সে কমান্ডারকে বলল– 'তোমার সঙ্গে যদি আমার সাক্ষাৎ না ঘটত, তাহলে আমি অবশিষ্ট জীবনও নাচ-গানে অতিবাহিত করতাম। তোমাকে দেখার পর আমার মনে পড়ে যায়, আমি কারো কন্যা– নর্তকী বা বেশ্যা নই। এখন হয়ত তুমি আমাকে মেরে ফেল; না হয় আশ্রয় দাও– না হয় আমাকে আমার ঘরে পৌঁছিয়ে দাও। আজ তুমি আমাকে ফেরত যেতে দিও না।'

'আজ তুমি চলে যাও'– কমান্ডার জবাব দেন– 'আমি তোমাকে আমার চৌকিতে রাখতে পারি না। ওয়াদা করছি, আমি তোমাকে তোমার ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করব। আর এখান থেকে যদি তুমি চলেও যাও, তো কায়রোতে কোথায় উঠবে, ঠিকানা দিয়ে যাও, আমি সেখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাব।'

কিছুক্ষণ পর কমান্ডার দু'টি ঘোড়া প্রস্তুত করেন এবং যোহ্‌রাকে বললেন, চল রওনা হই। দু'জন ঘোড়ায় চড়ে রওনা হন। পথে যোহ্‌রা কমান্ডারকে বলল– 'আচ্ছা, রাতের বেলা এখানে নৌকা আসে কেন– অনেক নৌকা?'

'নৌকা?'– কমান্ডার বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– 'কোন্ দিক থেকে আসে?'

'ওদিক থেকে'– সুদানের প্রতি ইংগিত করে যোহ্‌রা বলল– 'ক'দিন যাবত রাতে আমার তেমন ঘুম হয় না। মধ্যরাতে উঠে তাঁবুর বাইরে বসে থাকি। আমি ঘটনাটা দু'রাত দেখছি। এক রাতে তিনটি ও এক রাতে দু'টি নৌকা এসে কূলে ভিড়েছে। নৌকাগুলোর সাদা পাল অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায়। এখান থেকে একটু সামনের জায়গাটায় তীরে ভিড়েছে। আমি কান খাড়া করে বিষয়টা বুঝবার চেষ্টা করি। মনে হল, নৌকাগুলো থেকে অনেক মানুষ নামছে। তারপর গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের অভ্যন্তরে ঢুকে যাচ্ছে।'

'আচ্ছা, তুমি কি আমাদের দু'জন সৈনিককে কখনো দেখেছ?'– কমান্ডার জিজ্ঞেস করেন– 'তারা ঘোড়ায় চড়ে ডিউটিতে আসে। তদের তো নদীর তীরে থাকার কথা।'

না'– যোহরা জবাব দেয়– 'কখনো তো আমি কোন সৈনিক দেখিনি! তবে দিনের বেলা দেখেছি দু'জন সৈনিক আসে। সম্মুখে একটি কাফেলা অবস্থান করছে। তারা তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজব করে সময় কাটায়। একদিন তাদের একজনকে কাফেলার একটি মেয়ের সঙ্গে টিলার আড়ালে বসে প্রেম-নিবেদন করতে দেখেছি।'

যোহরা জানে না। মিসরের এই সীমান্ত এলাকায় কী হচ্ছে এবং কী হতে পারে। সীমান্তে নিয়োজিত সৈনিকেদের দায়িত্ব-ই বা কী, তা-ও তার অজানা। রাতে কিংবা দিনে সুদানের দিক থেকে কোন নৌকা এদিকে আসার তাৎপর্য কী, তাও জানেনা যোহরা। যা বলেছে, সবই তার সহজ-সরল কথা। কিন্তু কমান্ডারের জন্য এটি বিরাট এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। যোহরা যা বলেছে, তা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে কমান্ডারকে সে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছে। কমান্ডার এই দীর্ঘ ডিউটি এবং সীমান্ত এলাকার পরিবেশে বিরক্ত বটে; কিন্তু যোহরার বক্তব্য তাকে সজাগ করে তুলেছে। তিনি যোহরাকে বললেন– 'আস, আজ নদীর কূলে কূলে হাঁটব।' তিনি ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দেন।

কমান্ডার যোহরাকে নিয়ে নদীর কূলে পৌঁছে যান। তারা কূল ধরে হাঁটতে শুরু করেন। নদীর পানিতে সাঁতার কাটছে কমান্ডারের দৃষ্টি। কিছুক্ষণ পর মাঝ নদীতে দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে আলো চোখে পড়ে কমান্ডারের। তারপর আরো একটি আলো। কিন্তু পরক্ষণই আলোটা নিভে যায়। এ সময়ে এ এলাকায় যে সান্ত্রীদের ডিউটি করার কথা, কমান্ডার তাদেরকে হাঁক দেন। কিন্তু কোন জবাব এল না। তিনি কণ্ঠ উঁচু করে আবারো ডাক দেন। এবারো কোন জবাব নেই। তিনি আরো উচ্চকণ্ঠে ডাক দেন। তিনি নদীতে দু'টি নৌকার পাল দেখতে পান। তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। কমান্ডার যোহরার উপস্থিতি ভুলে যান এবং ঘোড়ায় চড়ে নদীর কূলে কূলে সামনের দিকে এগিয়ে যান। যোহরাও তার পিছনে পিছনে অগ্রসর হয়। সান্ত্রীদের ডেকে চলছেন কমান্ডার।

সান্ত্রীরা কমান্ডারের ডাক-চীৎকার শুনতে পাচ্ছে। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'জন দু'টি টিলার আড়ালে 'বৃদ্ধ স্বামীদের যুবতী স্ত্রীদের' জালে আটকে আছে। তারা তাদের কমান্ডারদের কণ্ঠস্বর চিনে ফেলে এবং সেখান থেকে উঠে দাঁড়ায়। তারা যেখানে ঘোড়া বেঁধে রেখে গিয়েছিল, সেখানে ফিরে আসে। কিন্তু ঘোড়া উধাও। তারা ওখানেই অবাক্ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দূরে একস্থানে দু'টি ঘোড়া দৌড়াচ্ছে দেখতে পায় তারা।

কমান্ডার সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। যোহরার ঘোড়া তার পাশাপাশি

দৌড়াচ্ছে। হঠাৎ তারা শুনতে পায়– 'তোমরা যাদেরকে ডাকছ, তারা অনেক দূরে– সম্মুখে।'

'তোমরা কারা?'– কমান্ডার জিজ্ঞেস করেন– 'এদিকে এস।'

'আমরা পথিক'– তারা জবাব দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দু'টি ঘোড়া কমান্ডারের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। পরক্ষণেই আরো একটি আওয়াজ আসে– 'আপনারা সামনের দিকে অগ্রসর হোন; আমরা আপনাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।'

কমান্ডার তরবারী হাতে নেন। রাতের বেলা মুসাফিরদের ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া এবং এই এলাকায় অবস্থান করা সন্দেহজনক। তারা কমান্ডারের নিকটে চলে আসে। একজন কমান্ডারকে বলল– 'ওদিকে দেখুন, ওরা আসছে।' কমান্ডার যেই মাত্র ওদিকে তাকালেন, সঙ্গে সঙ্গে লোকটি এক হাতে কমান্ডারের ঘাড়টা ঝাঁপটে ধরে এবং অপর হাতে তার তরবারীধারী হাতের কনুই ধরে ফেলে। অপর ব্যক্তি মেয়েটিকে ঝাপটে ধরে। কমান্ডারকে পাকড়াওকারী লোকটি তার ঘোড়া হাঁকায়। ফলে কমান্ডার ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমন সময়ে অন্ধকার ভেদ করে আরো দু'জন লোক দৌড়ে আসে। তারা কমান্ডারকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত্বে নিয়ে নেয়।

লোকগুলো বাদকদল, যারা মূলত প্রশিক্ষিত গেরিলা সৈনিক। যোহ্রা তাঁবু থেকে বের হলে তাদের-ই দু'-তিনজন লোক তার পিছু নিয়েছিল। তারা পরিকল্পনা মাফিকই কমান্ডার ও যোহ্রাকে ধরে ফেলেছে। তাদের একজন বলল– 'এদেরকে জীবিত নিয়ে চল।' এরূপ সন্দেহভাজন লোক ধরা পড়লে জীবিত নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

তারা কমান্ডার ও যোহ্রাকে পাহাড়ের দিকে নিয়ে রওনা হয়। কমান্ডার দেখতে পান, সমুদ্রতীরে বেশ ক'টি নৌকা থেকে হাবশীরা নামছে এবং কি যেন মাল-পত্র খালাস করছে। লোকগুলো সুদানী হাবশী যোদ্ধা এবং মাল-পত্রগুলো তাদের যুদ্ধাস্ত্র ও রসদ।

পাহাড়ের অভ্যন্তরে হাজার হাজার হাবশী এখনো নিশ্চুপ বসে আছে। পাহাড়ের গায়ে প্রজ্বলিত শিখাটি নিভে গেছে অনেক আগে। হাবশীদের ধর্মীয় সঙ্গীতের সুর মুর্ছনা শোনা যাচ্ছে। তারা ধীরে ধীরে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ছে। তারা নিজেদেরকে সেই হাবশীদের তুলনায় মর্যাদাসম্পন্ন ভাবতে শুরু করেছে, যারা সুদানে পড়ে রয়েছে।

সঙ্গীতের সুর থেমে গেছে। হঠাৎ সম্মুখের পাহাড়টির গায়ে আলোর ঝিলিক চমকে ওঠে, যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবার আলো চমকায়। আলোটা আবু সম্বল মূর্তিটির গায়ে গিয়ে পড়ছে। আলোটা কোথা থেকে আসছে, বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, যেন মূর্তিটির চেহারা নিজ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

আলো নিভে গেছে। কিছুক্ষণ পর আবার আলো জ্বলে উঠে। সবাই দেখছে, পাহাড়সম মূর্তিটির কোল থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে এসে সামনের দিকে হাঁটছে। মূর্তিটির পিছন থেকে আত্মপ্রকাশ করে চারজন মানুষ। প্রত্যেকের গায়ে মাত্র একটি করে সাদা চাদর। সেই চাদরে তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত। মূর্তির কোল থেকে বেরিয়ে আসা লোকটিকে রাজার মত দেখাচ্ছে। তার মাথায় রাজমুকুট। মুকুটের উপর একটি কৃত্রিম সাপের ফনার ছায়া। গায়ের চোগাটা লাল। অজ্ঞাত স্থান থেকে আসা আলোকরশ্মিটি তার উপর পতিত হয়ে চলছে। চোগার গায়ে অসংখ্য তারকা। আলোর চমকে সেগুলো চমকাচ্ছে ও মিটমিট করে জ্বলছে। লোকটার এক হাতে বর্শা, অপর হাতে নাঙ্গা তরবারী। সাদা চাদর পরিহিত লোকগুলো তার পিছনে পিছনে হাঁটছে।

তারা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নীচের দিকে নেমে আসছে এবং আলোটাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে আসছে। এবার সম্মুখের লোকটি দাঁড়িয়ে যায়। পিছনের লোকগুলো সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠে– 'আমাদের খোদা ধরায় নেমে এসেছেন। তোমরা সেজদায় লুটিয়ে পড়। তারপর মাথা তুলে তোমাদের খোদাকে মন ভরে দেখ।'

সব মানুষ সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারপর মাথা তুলে খোদাকে দেখে। খোদা একটি তরবারী উচ্চে তুলে ধরে রেখেছেন। তিনি ঢালু বেয়ে নীচে নামছেন। ময়দানে এমন নীরবতা বিরাজ করছে, যেন একজন মানুষও নেই। লোকটি নামতে নামতে জনতার ভীড়ের সন্নিকটে একটি উঁচুস্থানে এসে দাঁড়ায়। জায়গাটা প্রশস্ত। আলোটা শুধু তার এবং তার লোকদের উপর-ই পড়ছে। হঠাৎ চারটি মেয়ে সেই আলোর ভিতরে ঢুকে পড়ে। মেয়েগুলো আধা উলঙ্গ। গায়ের রং গৌর। পিঠের উপর কাঁধ থেকে সামান্য নীচে পাখির পালকের ন্যায় পালক। মাথার চুল খোলা। তারা এমনভাবে নড়াচড়া করছে, যেন তারা উড়ছে। তারা নাচের ভঙ্গিমায় হাবশীদের 'খোদা'র চার পার্শ্বে কিছুক্ষণ চক্কর কেটে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।

চার ব্যক্তি কমান্ডার ও যোহরাকে একটি গুহায় নিয়ে যায়। তাদেরকে গুহার

একটি কক্ষে রেখে একজন বাইরে বেরিয়ে যায়। লোকটি আরো এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করে ফিরে আসে। তাকে জানানো হল, এই লোকটিকে নদীর কূল থেকে এমন এক সময় ধরে আনা হয়েছে, যখন সুদান থেকে আগত নৌকা থেকে মালামাল খালাস করা হচ্ছিল এবং নতুন আগত হাবশীরা অবতরণ করছিল। লোকটি কমান্ডার ও যোহরার প্রতি তাকায়। তার ঠোঁটে মুচকি হাসি। পরক্ষণেই এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করে সে বাইরে বেরিয়ে আসে।

'তোমরা এদেরকে বড় উপযুক্ত সময় ধরে এনেছ'– লোকটি বলল– 'হতভাগ্য হাবশীরা মানুষ বলির দাবি করছে। আল-কিন্দ-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী খোদার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, একজন পুরুষ ও একজন নারী বলি দিতে হবে। আমাদের কোথাও না কোথাও থেকে এক পুরুষ ও এক নারীকে অপহরণ করে এনে তাদের হাতে তুলে দিতে হত। তোমরা আমাদের বিরাট এক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছ। আমাদেরকে চিন্তামুক্ত করেছ। মনে হচ্ছে, আমরা সফল হব। আমাদের প্রতিটি কাজই পূর্ণ সফলতার সঙ্গে আঞ্জাম হয়ে যাচ্ছে। বলির জন্যও দু'জন মানুষ আপনা-আপনি-ই এসে গেল।'

'হাবশীরা তাদের খোদাকে দেখেছে কি?'– একজন জিজ্ঞেস করল।

'তুমি যদি উপস্থিত থাকতে, তাহলে দেখতে আমরা কিরূপ বিচক্ষণতার সাথে তাদেরকে 'খোদা' দেখিয়েছি'– লোকটি জবাব দেয়– 'মূর্তির সম্মুখের পাহাড় থেকে প্রজ্বলমান সলিতাওয়ালা দু'টি তীর নিক্ষেপ করা হয়। তীরান্দাজরা অন্ধকারের মধ্যে এমন নিশানা করে যে, তীর গিয়ে ঠিক জায়গায় বিদ্ধ হয়। আমরা বেশ কিছু জায়গা জুড়ে জ্বালানী ছড়িয়ে রেখেছিলাম। শুরুতেই দু'টি তীর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এদ্রোসন একজন অভিজ্ঞ মানুষ। তিনি বলেছিলেন, আগুনের শিখায় মূর্তিটি হাসছে ও দুলছে দেখা যাবে। আমাদেরই নিকট তো মনে হচ্ছিল, যেন মূর্তিটি মুখ ও ঠোঁট নাড়াচাড়া করছে। বরং মুখটাও ডানে-বাঁয়ে নাড়াচ্ছে।'

'তখন হাবশীরা কী প্রতিক্রিয়া দেখাল?'

'তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়েছিল'– লোকটি জবাব দেয়– 'অভ্যন্তরে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তার গুঞ্জন চলতে থাকে। আমি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাইনি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হাবশীরা ভয়ে কেঁপে থাকবে। আল-কিন্দ-এর নাটক সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছে। আলো নিভে গেলে আমরা আল-কিন্দকে পোশাক পরিয়ে মূর্তিটির কোলে বসিয়ে দেই। চারজন লোক পূর্ব থেকেই সেখানে একস্থানে লুকিয়ে বসেছিল। সম্মুখের পাহাড় থেকে মূর্তির

গায়ে আলো বিচ্ছুরণের ধারাও বেশ সফল হয়। পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের গায়ে যে আগুন জ্বালানো হয়, তা নীচ থেকে কেউ দেখেনি। তার সন্নিকটে বড় একটি আয়না রেখে মূর্তির উপর আলোর প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ করা হলে মনে হল, যেন এটি মূর্তির চেহারার নূর। তারই মধ্য থেকে যখন আল-কিন্‌দ 'খোদা' সেজে নেমে আসেন, তখন আমাদের মেয়েরা সবাইকে নিশ্চিত করে যে, ইনিই খোদা এবং তারা পরী। আমরা এ যাবত কোন পদক্ষেপে ব্যর্থ হয়নি। এখন আল-কিন্‌দকে এক স্থানে বসিয়ে রেখে সকল হাবশীকে তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা হবে এবং বলা হবে ইনি-ই তোমাদের খোদা, যিনি যুদ্ধে তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

'আচ্ছা, এ দু'জনকে (কমান্ডার ও যোহরার প্রতি ইংগিত করে) কি আজই বলি দেয়া হবে?

সে সিদ্ধান্ত নেবে হাবশীরা। সম্ভবত তারা তাদেরকে তিন-চারদিন লালন-পালন করবে এবং কিছু রীতি-নীতি পালন করবে।'

তারা কারো কণ্ঠস্বর শুনতে পায়– 'সেনাপতিকে এমন একটা নাটক সাজাতে হবে, আমার জানা ছিল না।' অপর একজন বলল– 'এছাড়া হাবশীদের দ্বারা যুদ্ধ করানো সম্ভবও ছিল না। এই নাটক বেশ কাজ দিচ্ছে।'

কণ্ঠস্বরটা আল-কিন্‌দ ও তার সহযোগী লোকদের। তারা নিকটে এগিয়ে এলে ব্যক্তিদ্বয় বলল, এজজন পুরুষ ও একজন মেয়ে ঘটনাক্রমে আমাদের হাতে এসে গেছে। তাদেরকেই হাবশীদের হাতে তুলে দেয়া যায়। আল-কিন্‌দ তারা কারা জিজ্ঞেস না করেই মাথা থেকে মুকুটটা সরিয়ে ফেলে কমান্ডার ও যোহরাকে যে কক্ষে রাখা হয়েছে, সে কক্ষে ঢুকে পড়েন। সে কমান্ডারকে চিনতে না পারলেও কমান্ডার তাকে চিনে ফেলেন। বাইরে কী কথা-বার্তা হয়েছিল, কমান্ডার সেসব শুনে ফেলেছেন। তিনি একাধিকবার আল-কিন্‌দ-এর নামও শুনেছেন। তিনি এও জেনে ফেলেছেন যে, তাকে ও যোহরাকে বলি দেয়া হবে। কাজেই আল-কিন্‌দ কক্ষে প্রবেশ করার পর তিনি মোটেই বিস্মিত হননি যে, তার সালার এখানে কেন এবং কিভাবে এলেন।

আল-কিন্‌দ এই বলে বাইরে বেরিয়ে যায় যে, এদেরকে হাবশীদের পুরোহিতদের হাতে তুলে দাও।

❁ ❁ ❁

তিন-চারদিন পর। কায়রোতে আল-আদেল আলী বিন সুফিয়ানকে ডেকে বললেন– 'তিন-চার দিন হল, আল-কিন্‌দকে পাওয়া যাচ্ছে না। যখন-ই তলব

করি, জবাব আসে, তিনি নেই। তার ঘর থেকেও একই জবাব আসছে। লোকটা 'কোথায় গিয়ে থাকতে পারে?'

'সীমান্ত বাহিনীর পরিদর্শনে যদি সীমান্ত সফরে গিয়ে থাকে, তাহলে তো আপনাকে জানিয়ে যেত। আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'এ মুহূর্তে আমার যা ধারণা, তাহল, তাকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ কিংবা খুন করে থাকতে পারে।'

'এও তো হতে পারে যে, সে নাশকতাকারী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।' আল-আদেল বললেন।

'তার ব্যাপারে এমন সন্দেহ তো অতীতে কখনো জাগেনি'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আচ্ছা, আমি তার ঘরে গিয়ে খবর নিচ্ছি।

আলী বিন সুফিয়ান আল-কিন্দ-এর ঘরে চলে যান। বারজন দেহরক্ষী উপস্থিত। রক্ষী কমান্ডারকে জিজ্ঞাসা করেন, আল-কিন্দ কোথায়? কমান্ডার অজ্ঞতা প্রকাশ করে। একজন দেহরক্ষীও বলতে পারে না, আল-কিন্দ কোথায় গেছে। পরিচারিকাকে বাইরে ডেকে এনে বললেন, আল-কিন্দ-এর স্ত্রীদেরকে জিজ্ঞেস কর, সে কোথায় গেছে। পরিচারিকা আলী বিন সুফিয়ানকে ভিতরে নিয়ে একটি কক্ষে বসতে দেয়। বৃদ্ধা মহিলা বলল, আপনি ঘর থেকে আল-কিন্দ-এর সন্ধান পাবেন না। আমি আজ বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এখানে যা কিছু দেখছি, তা আপনাকে বলে দিচ্ছি। আমার জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার। তবে আমি মরে গেলেও তেমন কিছু আসবে যাবে না। আমি বিধবা। স্বামী মারা গেছেন বহু আগে। আমার একটি মাত্র পুত্র ছিল। সুদানের লড়াইয়ে সে শাহাদাতবরণ করেছে। নিরূপায় হয়ে আমি এখানে চাকুরী নিয়েছিলাম। এরা আমাকে গরীব এবং সহজ-সরল মহিলা মনে করে। তাদের জানা ছিল না, একজন শহীদের মা দেশ ও ধর্মবিরোধী কোন তৎপরতা সহ্য করতে পারে না, যার জন্য তার পুত্র জীবন দিয়েছে। এ ঘরে দীর্ঘদিন যাবত সন্দেহভাজন লোকদের আনাগোনা চলছিল। এক রাতে এক ব্যক্তি আসল। লোকটা আরবী পোশাক পরিহিত। মুখে দাড়ি। আমাকে ডেকে বলা হল, মদের ব্যবস্থা কর। লোকটা ভিতরে প্রবেশ করে মুখের কৃত্রিম দাড়ি ও গোঁফ খুলে ফেলে। তার আগে থেকেই-ই এখানে এমন সব লোকদের আসা-যাওয়া চলছিল, যাদের প্রতি আমার সন্দেহ ছিল যে, এদের উদ্দেশ্য ভাল নয়। আমার কানে আমি অর্ধেক মিশর সুদানের–মিশরের রাষ্ট্রক্ষমতা– এক রাতেই কাজ হয়ে যাবে– ইত্যাদি বাক্যও শুনেছি। সালার আল-কিন্দ রাতে বের হতেন। তার সঙ্গে দু'জন অপরিচিত লোক থাকত। আমি সালারকে রক্ষী কমান্ডারের

সঙ্গেও কানে কানে কথা বলতে দেখেছি।

বৃদ্ধা পরিচারিকা আরো কিছু কথা বলে আলী বিন সুফিয়ানকে স্বপ্রমাণিত করে দেয়, সালার আল-কিন্দ না অপহরণ হয়েছে, না খুন, না সে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে কোথায় গিয়েছে। মিশরে নাশকতা ও গাদ্দারী এতই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেড়ে চলছে যে, একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও সন্দেহ না করে পারা যাচ্ছিল না। কিন্তু তথাপি আল-কিন্দ-এর উপর কখনো কারো সন্দেহের চোখ পড়েনি। লোকটা তার সন্দেহজনক সকল অপতৎপরতা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে আলী বিন সুফিয়ানও অতিশয় দূরদর্শী গোয়েন্দা। এক্ষেত্রে তার জন্য সমস্যা হচ্ছে, সালার পদমর্যাদার ব্যক্তির ঘরে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া তল্লাশী নেয়া যায় না। এ কাজের জন্য মিশরের অস্থায়ী সুপ্রীম কমান্ডার আল-আদেল-এর অনুমতি আবশ্যক। তাই তিনি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে নিজের একজন রক্ষীসেনাকে প্রেরণ করে তিন-চারজন গোয়েন্দা ডেকে আনেন এবং তাদেরকে আল-কিন্দ-এর ঘরে এদিক-ওদিক লুকিয়ে রাখেন। তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন, কোন পুরুষ কিংবা নারী ঘর থেকে বের হলে তার পিছু নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে।

আল-কিন্দ-এর ঘর থেকে বের হয়ে আলী বিন সুফিয়ান রক্ষী কমান্ডারকে নির্দেশ দেন, তোমার নিজের এবং অধীন সকল রক্ষীসেনার অস্ত্র ভিতরে রেখে দাও এবং সবাই আমার সঙ্গে চল। বার সদস্যের রক্ষী বাহিনীটিকে নিরস্ত্র করে আলী বিন সুফিয়ান সঙ্গে করে নিয়ে যান এবং আল-আদেলকে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করেন। আল-আদেল তাঁকে আল-কিন্দ-এর ঘরে হানা দিয়ে তল্লাশী নেয়ার অনুমতি দিয়ে দেন। আলী বিন সুফিয়ান সময় নষ্ট না করে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

ওদিকে ইতিমধ্যে আল-কিন্দ-এর ঘরে ঘটে গেছে আরেক ঘটনা। আলী বিন সুফিয়ান যখন সেখান থেকে বের হয়ে আসেন, তখন আল-কিন্দ-এর এক স্ত্রী- যে বয়সে যুবতী- পরিচারিকাকে নিজ কক্ষে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, আলী বিন সুফিয়ান তোমাকে কী বললেন এবং তুমি কী জবাব দিলে? উত্তরে বৃদ্ধা বলল, তিনি আমাকে সালার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন এবং আমি বলেছি, আমি গরীব মানুষ, এই ঘরের একজন চাকরানী। তিনি কোথায় গেছেন, আমি তা জানিনা।

'তোমার অনেক কিছু জানা আছে'- স্ত্রী বলল- 'তাকে তুমি অনেক তথ্য বলে দিয়েছ।'

বৃদ্ধা তার বক্তব্যে অটল থাকে। স্ত্রী এক চাকরকে ডেকে তাকে সব ঘটনা শুনিয়ে বলল– 'এই বৃদ্ধার মুখ থেকে কথা বের কর। বলছে, ও নাকি কিছুই বলেনি।'

চাকর বৃদ্ধার মাথার চুল মুঠি করে ধরে এমন ঝটকা টান মারে যে, বৃদ্ধা চক্কর খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। চাকর তার ধমনিতে পা রেখে চাপ দেয়। বৃদ্ধার চোখ দু'টো বাইরে বেরিয়ে আসে। চাকর দাঁতে দাঁত পিষে বলল, বল্, ওকে কী কী বলেছিস? সে পা সরিয়ে নেয়।

বৃদ্ধা নিথর-নিস্তব্ধ পড়ে আছে। উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। চাকর তার পাজরে লাথি মারে। বৃদ্ধা ছটফট করতে শুরু করে। চাকরের নির্যাতনে বৃদ্ধা আধ-মরা হয়ে পড়ে থাকে। এবার সে বলল– 'আমাকে জীবনে মেরে ফেল। আমি আমার শহীদ পুত্রের আত্মার সঙ্গে গাদ্দারী করতে পারব না। তুমি একজন ঈমান-বিক্রেতার অসৎ স্ত্রী। আমি তোমাকে পরোয়া করি না।'

'একে পাতাল কক্ষে নিয়ে শেষ করে দাও'– স্ত্রী বলল– 'রাত হলে লাশ গুম করে ফেলবে। আমরা এখনো বিপদমুক্ত নই। লোকটা আমাদের রক্ষী সেনাদেরকে নিরস্ত্র করে সঙ্গে নিয়ে গেছে। এই হতভাগা বৃদ্ধার অনেক তথ্য জানা আছে। একে তথ্যসহ মাটিতে পুতে ফেল।

বৃদ্ধা মেঝেতে পড়ে আছে। অবস্থা তার মৃতপ্রায়। চাকর তাকে গাট্টির মত করে কাঁধে তুলে নেয়। কক্ষ থেকে বের হয়ে বারান্দা অভিমুখে পা বাড়ায়। এমন সময় আওয়াজ আসে– 'থাম'। লোকটি ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। অনেক সৈন্য ধেয়ে আসছে। ঘর তাদের অবরুদ্ধ। আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশে তারা মহলের সমস্ত কক্ষ ও বারান্দায় ছড়িয়ে পড়ে। চাকর পালাতে ব্যর্থ হয়। তার কাঁধ থেকে বৃদ্ধাকে নামানো হল। বৃদ্ধার মুখ থেকে রক্ত বের হচ্ছে। সে চোখ খুলে তাকায়। সম্মুখে আলী বিন সুবিয়ানকে দেখামাত্র তার চেহারায় হাসি ফুটে ওঠে। সে বলল– 'ইতিপূর্বে আমার ঠিক জানা ছিল না, এই ঘরে কী হচ্ছে। তুমি আসার পর আমার সন্দেহ পোক্ত হয়ে যায় যে, সমস্যা একটা আছে।'

বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসছে। সে বড় কষ্টে বলল যে, আল-কিন্দ-এর নতুন বেগম এবং তার এই চাকর আমার মুখ থেকে বের করবার চেষ্টা করেছে যে, আমি তোমাকে কী বলেছি। ওরা আমাকে পিটিয়ে শেষ করে ফেলেছে।

আলী বিন সুফিয়ান এক সিপাহীকে বললেন– 'একে এক্ষুণি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।' বৃদ্ধা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল– 'আমাকে কোথাও পাঠিও না।

আমি আমার শহীদ পুত্রের নিকট চলে যাচ্ছি। তোমরা আমাকে বাঁধা দিও না।'

বৃদ্ধা চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে যায়।

আল-কিন্দ-এর বাসগৃহের প্রতিটি কোণ তল্লাশী নেয়া হল। পাতাল কক্ষে গিয়ে থ খেয়ে যান গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান। যেন এক অস্ত্রগুদাম। ঘর থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ সোনা ও নগদ অর্থ। পাওয়া গেল আল-কিন্দ-এর নামাংকিত একটি সীল, যাতে আল-কিন্দকে ভূষিত করা হয়েছে 'সুলতানে মেসের' অভিধায়। বিজয়ের ব্যাপারে আল-কিন্দ এতই নিশ্চিত যে, মিশরের সুলতান হিসেবে নিজ নামে সীল-মোহরও তৈরী করে রেখেছেন! এই সীল-মোহর আলী বিন সুফিয়ানের সব সন্দেহকে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করে দেয়।

আল-কিন্দ-এর ঘরে দু'জন স্ত্রী ছিল। ছিল মদ-মাদকতার বিপুল আয়োজন। আল-কিন্দ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিল, তিনি মদপান করেন না। এখন প্রমাণ পাওয়া গেল, রাতে ঘরে বসে তিনি মদপান করতেন। আলী বিন সুফিয়ান স্ত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মূল তথ্য হাসিল করেন। নতুন যে যুবতী স্ত্রী বৃদ্ধা পরিচারিকাকে চাকর দ্বারা খুন করিয়েছে, তার জবানবন্দী ছিল সবচে' গুরুত্বপূর্ণ। অন্য সব স্ত্রীর একই কথা, আপনার যত তথ্যের প্রয়োজন, সব নতুন বেগমের বুকে লুক্কায়িত। তথ্য পাওয়া গেল, এই নতুন স্ত্রী মিশরী নয়– সুদানী এবং বাহির থেকে অপরিচিত লোকজন আসলে শুধু এ মেয়েটি-ই তাদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলত, খোলামেলা চলত এবং মদপান করত। অন্যান্য স্ত্রীদের সরল-সহজ কথায় বুঝা গেল, তারা আর কিছু জানে না।

আল-কিন্দ-এর স্ত্রীকে আলাদা করে ফেলা হল। আলী বিন সুফিয়ান বৃদ্ধা চাকরানীর খুনী চাকরকে বললেন– 'এখন আর কিছু লুকাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। যা জানা আছে, বলে ফেল। আমাকেও কষ্ট দিও না, নিজেও কষ্ট পেও না।'

চাকর জানে, লুকোচুরি করতে গেলে পরিণতিটা কী হবে। বলল, হুজুর! আমি একজন চাকর মাত্র। আমি হুকুমের গোলাম। দু'পয়সা পাওয়ার আশায় মনিবের সব নির্দেশ মেনে চলতাম। এখন আমি আপনার অনুগত। কিছু লুকাব না; যা জানি সবই বলে দেব। শুনুন–

দেশের একজন সেনা অধিনায়কের গোপন পরিকল্পনা এক গৃহভৃত্যের জানা থাকার কথা নয়। তবু চাকর বলল, আল-কিন্দ যাওয়ার সময় বলে গেছেন, আমার আসতে অনেকদিন বিলম্ব হবে এবং কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, তিনি

কোথায় গেছেন, আমরা জানিনা। ভৃত্য আসলেই জানত না, আল-কিন্দ কোথায় গেছেন।

আলী বিন সুফিয়ান আল-কিন্দ-এর নতুন স্ত্রীকে দু'জন লোকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পাতাল কক্ষে পাঠিয়ে দেন। নিজে আরো কিছু তত্ত্ব-তালাশ নিয়ে এবং আল-কিন্দ-এর ঘরে প্রহরা বসিয়ে নিজ দফতরে চলে যান, যেখানে আল-কিন্দ-এর নিরস্ত্র দেহরক্ষীরা কঠোর প্রহরায় বসে আছে। আলী বিন সুফিয়ান এসে-ই তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন– 'তোমরা মিশর ও সিরিয়ার সম্মিলিত বাহিনীর সৈনিক। কিছু গোপন রাখবার চেষ্টা করলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদন্ড। আর যদি আমার নির্দেশ পালনপূর্বক সালার আল-কিন্দ-এর তৎপরতার কথা প্রকাশ করে দাও, তাহলে মুক্তি পেতে পার।'

রক্ষী কমান্ডার বলতে শুরু করে। তার বক্তব্যে প্রমাণিত হয়ে যায়, আল-কিন্দ-এর নিকট খৃস্টান ও সুদানী লোকজন আসা-যাওয়া করত এবং তিনি গাদ্দারীতে লিপ্ত। তবে আল-কিন্দ কোথায় গেছেন, তা তারও জানা নেই।'

দুপুর রাতে আলী বিন সুফিয়ান পাতাল কক্ষে যান। আল-কিন্দ-এর নতুন স্ত্রী সংকীর্ণ একটি প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ। তাকে সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে তার কক্ষে অন্য এমন এক পুরুষ কয়েদীকে রাখা হয়েছে, যে লাগাতার নির্যাতন-অত্যাচারে জর্জরিত। লোকটা খৃস্টানদের গুপ্তচর। নিজে ধরা পড়লেও সতীর্থদের সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে না। আল-কিন্দ-এর স্ত্রী সেই দুপুর থেকে তার সঙ্গে এক প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ। তার তড়পানি ও ছটফটানি প্রত্যক্ষ্য করেছে সে।

এখন মধ্যরাত। মেয়েটা রাজকন্যা। এই সংকীর্ণ পাতাল কক্ষের গন্ধই তাকে পাগল বানাবার জন্য যথেষ্ট। তদুপরি বন্দি লোকটার শোচনীয় অবস্থা দেখে দেখে তার রক্ত শুকিয়ে গেছে। আলী বিন সুফিয়ান যখন সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হন, তখন সে হাউমাউ করে চীৎকার জুড়ে দেয়। আলী তাকে সেখান থেকে বের করে অন্য একটি কক্ষের সামনে নিয়ে যান। সেটিও একটি অপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠ। কৃষ্ণকায় এক হাবশী তাতে আটক রয়েছে। লোকটার ভয়ানক দেহ। মহিষের মত শরীর। সে সীমান্ত বাহিনীর এক কমান্ডারকে খুন করেছিল। আলী বিন সুফিয়ান মেয়েটিকে বললেন, বাকী রাতটুকু তোমাকে এর সঙ্গে কাটাতে হবে। মেয়েটি চীৎকার করে উঠে আলীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে।

'আপনার যা যা জানার প্রয়োজন, আমাকে জিজ্ঞেস করুন।' আলীর দু'পা জড়িয়ে ধরে মেয়েটি বলল।

'আল-কিন্দ কোথায় গেছে? কেন গেছে? তার লক্ষ্য কী?' আলী জিজ্ঞেস

করলেন– 'তার সম্পর্কে আরো যা যা তোমার জানা আছে, সব বলে দাও।'

আল-কিন্দ-এর স্ত্রী মাথা তুলে দাঁড়ায়। স্বামী সম্পর্কে যা কিছু জানা ছিল, সবই বলে দেয়। তবে আল-কিন্দ কোথায় গেছে, সেও জানেনা। মেয়েটি জানায়, সুদান থেকে হাবশী সৈন্য আনা হচ্ছে। তারা কোন এক রাতে কায়রো আক্রমণ করে সমগ্র মিশর দখল করে নেবে।

মেয়েটি মদপান করানোর দায়িত্ব পালন করত। সেই সুবাদে আল-কিন্দ-এর ঘরে গমনাগমনকারী খৃস্টান ও সুদানী মেহমানরা তার সম্মুখেও কথা-বার্তা বলত। সুদানের ধনাঢ্য কোন এক ব্যক্তির কন্যা আল-কিন্দ-এর এই স্ত্রী। আল-কিন্দ-এর জন্য তাকে উপহার স্বরূপ পাঠানো হয়েছিল। আল-কিন্দ তাকে বিয়ে করে নিয়েছিল। মেয়েটা বেশ সতর্ক ও দুরন্ত। সুদানীদের লক্ষ্য তার ভালভাবেই জানা আছে। আল-কিন্দ-এর বাসভবনে যে বিপুল পরিমাণ সোনা ও নগদ অর্থ পাওয়া গিয়েছিল, তার বর্ণনামতে সেগুলো সুদান থেকে এসেছে। এগুলো যুদ্ধের ব্যয় এবং মিশরের সেনাবাহিনী থেকে গাদ্দার ক্রয়ের মূল্য। বিপুল সংখ্যক হাবশী সৈন্য এসে কোথায় জমায়েত হয়েছে, মেয়েটি সে ব্যাপারে অবহিত নয়। সে এতটুকু জানে যে, সমুদ্র পথে এসে তারা তীরবর্তী কোন একস্থানে অবস্থান নিয়েছে এবং তাদের হামলা হবে গেরিলা ধরনের।

যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল, আলী বিন সুফিয়ান তা করে ফেলেছেন। তিনি আল-আদেলকে বিস্তারিত রিপোর্টও প্রদান করে প্রস্তাব পেশ করেছেন যে, পর্যবেক্ষণের জন্য দু'জন দু'জন ও চারজন চারজন করে সৈন্য চতুর্দিক ছড়িয়ে দেয়া হোক। তারা সুদানী ফৌজের অবস্থান খুঁজে বের করবে এবং তথ্য সংগ্রহ করবে, সুদানী হাবশী বাহিনী সত্যিই যদি ভিতরে ঢুকে গিয়ে থাকে, তাহলে তারা কোন্ দিক থেকে এল। তিনি আল-আদেলকে এই পরামর্শও প্রদান করেন যে, সুলতান আইউবীকে বিষয়টা না জানানো হোক। কেননা, সংবাদটা পেয়ে তিনি পেরেশান হওয়া ছাড়া কোন সাহায্য করতে পারবে না। কিন্তু আল-আদেলের মতে সুলতানকে বিষয়টা অবহিত করা আবশ্যক। তার আশংকা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তখন সুলতান আইউবীর উপস্থিতি আবশ্যক হয়ে পড়বে। তাই তিনি পূর্ণাঙ্গ একটি রিপোর্ট লিখে চারজন রক্ষীসহ এক সিনিয়র কমান্ডারকে সুলতানের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেন এবং তাকে নির্দেশ প্রদান করেন, প্রতিটি চৌকি থেকে ঘোড়া বদল করে নেবে এবং কোথাও দাঁড়াবে না।

রণাঙ্গনে সুলতান আইউবীর হেডকোয়ার্টার স্থির থাকছে না। তিনি দিনে এক জায়গায় থাকছেন, তো রাতে অবস্থান করছেন অন্য জায়গায়। ঘুরে-ফিরে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। কিন্তু তিনি এমন ব্যবস্থা কর রেখেছেন যে, প্রয়োজনে তাকে পাওয়া সহজ ব্যাপার। স্থানে স্থানে লোক বসিয়ে রাখা হয়েছে। তারা জানে, সুলতান কখন কোথায় অবস্থান করছেন। সুলতান আইউবীর অবস্থান একটি গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই নির্দেশক লোকগুলোকে নির্বাচন করা হয়েছে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান দেখে।

তিনদিন পথ অতিক্রম করে আল-আদেলের বার্তাবাহক কমান্ডার চার রক্ষীসহ দামেস্ক পৌঁছে যায়। সুলতান এখন আলরিস্তানের পার্বত্য এলাকায় অবস্থান করছেন। প্রচন্ড শীত পড়ছে। লাগাতার দীর্ঘ পথচলার কারণে বার্তাবাহী কমান্ডার ও তার রক্ষীদের অবস্থা শোচনীয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অনিদ্রা ও অবিরাম চলার ফলে তাদের মুখমন্ডল লাশের ন্যায় শুকিয়ে গেছে। তবু তারা এক্ষুণি– এই মুহূর্তে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উদগ্রীব। সামান্য পানাহার করে কালবিলম্ব না করে তারা আলরিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

❁ ❁ ❁

ত্রিপোলীর খৃস্টান সম্রাট খলীফা আল-মালিকুস সালিহ-এর সাহায্যে এসেছিলেন এবং যুদ্ধ না করেই ফিরে গিয়েছিলেন। কারণ, সুলতান আইউবীর বাহিনী তার বাহিনীর উপর অপ্রত্যাশিতভাবে গেরিলা হামলা চালায় এবং পিছন থেকে রসদ সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পিছনে সুলতান আইউবীর বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে রেমন্ড তার বাহিনীকে অন্য দিক দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। সুলতান আইউবী তার পশ্চাদ্ধাবন সংগত মনে করলেন না। কেননা, তাতে সময় ও শক্তি দু-ই নষ্ট হত। তিনি অধিকাংশ গেরিলা সৈন্যকে রেমন্ডের রসদ দখল কিংবা ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বর্ষাও শুরু হয়ে গেছে। খৃস্টানদের রসদ বহর ছিল বিশাল।

রাতের বেলা। রেমন্ডের রসদ রক্ষণাবেক্ষণকারী সৈন্যরা ঘোড়াগাড়ির নীচে ও তাঁবুতে নিশ্চিন্তে শুনে আছে। এই রসদ তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আগামীকাল ভোরে রওনা হবে। দিন থেকেই যে কয়েক জোড়া চোখ পাহাড় ও পাথরের আড়াল থেকে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে চলেছে, তা তারা জানে না। সম্ভবত তাদের ধারণা, এই শীত আর বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে কেউ তাদের উপর হামলা করতে আসবে না। কিন্তু রাতে হঠাৎ তাদের ক্যাম্পের একদিকে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। ক্যাম্পে আগুন ধরে যায়। তাঁবুগুলো জ্বলছে। বিষয়টা

সুলতান আইউবীর গেরিলা যোদ্ধাদের অভিযানের ফসল। তারা প্রথমে ছোট ছোট মিনজানীক দ্বারা দাহ্য পদার্থভর্তি পাতিল নিক্ষেপ করে। তারপর জ্বলন্ত সলিতাওয়ালা তীর ছোঁড়ে। ক্যাম্পে আগুন ধরে যাওয়ার পর জ্বলন্ত আগুনের আলোতে তারা হামলা করে বসে। বর্শা ও তীরের আক্রমণে বহু খৃস্টান সেনাকে খতম করে তারা পর্বতমালার অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সন্নিকটস্থ পাহাড় থেকে খৃস্টানদের ক্যাম্পের উপর তীর বর্ষিত হতে থাকে। তারপর হামলা চালায় অপর একটি কমান্ডো দল। সকাল নাগাদ দেড় মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত সুবিশাল ক্যাম্পটিতে যা কিছু পড়ে আছে, তা খৃস্টানদের ফেলে যাওয়া রসদ, নিহতদের লাশ আর গুরুতর আহত ক্রুসেডসেনা। অনেকগুলো ঘোড়া হাঁকিয়ে নিয়ে গেছে খৃস্টানরা। ফেলেও গেছে বহুসংখ্যক। কমান্ডোদের বিরতির সময়টায় খৃস্টানরা কিছু ঘোড়াগাড়ি নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছে। ফেলে যাওয়া রসদ ও ঘোড়াগুলো সুলতান আইউবীর সৈন্যরা কব্জা করে নিয়ে যায়।

হাল্‌বের অবরোধ তুলে নেয়া হয়েছিল। সুলতান আইউবী এই গুরুত্বপূর্ণ নগরীটিকে পুনরায় অবরোধ করার পরিকল্পনা করেছেন। দিনের বেলা গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার সুলতানকে বিগত রাতের কমান্ডো অভিযানের রিপোর্ট প্রদান করছে। এমন সময় দারোয়ান তাঁবুতে প্রবেশ করে সুলতানকে সংবাদ দেয়, কায়রো থেকে এক কমান্ডার বার্তা নিয়ে এসেছেন। বার্তা বহন করে থাকে দূত। সে জায়গায় কমান্ডারের নাম শুনে সুলতান আইউবী দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং কোন ভূমিকা ছাড়াই বললেন– 'খরব ভাল তো?....তুমি কেন এসেছ?'

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম নিয়ে এসেছি'– কমান্ডার বলল– 'আল্লাহ্ পাকের নিকট মুমিনের ভালোর-ই আশা রাখা উচিত।'

সুলতান আইউবী কমান্ডার থেকে পত্রখানা বুঝে নিয়ে তাকে নিয়ে ভিতরে চলে যান। তিনি বার্তাটি পাঠ করে গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান।

'এখনো কি জানা যায়নি যে, সুদানী সৈন্যরা মিশরে প্রবেশ করে কোন্ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছে?' সুলতান জিজ্ঞেসা করেন।

'তথ্য সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।' কমান্ডার জবাব দেয়।

'আমার অবর্তমানে মিশরে অবশ্যই কোন না কোন সমস্যা সৃষ্টি হবে, সে আশংকা আমার ছিল'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমার ভাইকে বলবে, ভয় পেও না। কায়রোর প্রতিরক্ষা শক্ত কর। তবে শুধু প্রতিরক্ষা যুদ্ধ-ই লড়বে

না। বেশির ভাগ সৈন্য নিজের কাছে রাখবে এবং জবাবী হামলার জন্য তাদের মধ্যে থেকে অভিজ্ঞ লোকদের বাছাই করে রাখবে। কিন্তু তাদেরকে শহরের বাইরে যেতে দেবে না। আমাদের বাহিনীর কোন তৎপরতা যেন শত্রুপক্ষ টের না পায়, যাতে তারা এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত থাকে যে, তারা আমাদের অসতর্কতার মধ্যে মিশর দখল করতে সক্ষম হবে। বুঝাতে হবে, কায়রো আক্রান্ত হচ্ছে, সে খবর কায়রোবাসী জানে না। শত্রুরা যাতে শহরকে অবরোধ করতে না পারে। তার আগেই পাল্টা হামলা করবে। আক্রমণ হওয়ার আগেই দুশমনের অবস্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। যদি তাদের অবস্থানের সন্ধান মিলে যায়, তাহলে বেশি সৈন্য দ্বারা হামলা করাবে না। বরং যথাসম্ভব অল্প সৈন্য দিয়ে গেরিলা হামলা চালাবে। সীমান্ত বাহিনীতে সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি কর, যাতে শত্রুরা পালাতে না পারে। আমি ভেবে পাচ্ছিনা, এত বিপুলসংখ্যক সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করে কোন্ দিক থেকে প্রবেশ করল! কোন না কোন সীমান্ত চৌকির সহযোগিতা কিংবা উদাসীনতা ছাড়া এ ঘটনা ঘটতে পারে না। আল্লাহ তোমাদের সাফল্য দান করুন। দুশমন রসদ ও পিছন থেকে সাহায্য ছাড়া যুদ্ধ করতে পারবে না। তুমি সীমান্তকে শক্তভাবে সীল করে দাও। যুদ্ধ যাতে দীর্ঘতর হয়, সে চেষ্টা করতে হবে, যাতে দুশমন না খেয়ে মরতে বাধ্য হয়। আমি তো তোমাদেরকে হাতে-কলমেই শিখিয়েছি, দুশমনকে বিক্ষিপ্ত করে কিভাবে যুদ্ধ করতে হয়। বিপুল সৈন্যের মোকাবেলা বিপুল সৈন্য দিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধ করা আবশ্যক নয়।

'আল-কিন্দও একদিন গাদ্দার প্রমাণিত হবে, আমি কখনো ভাবিনি। তারপরও আমি বিস্মিত নই। মানুষের ঈমান বিক্রি করতে সময় লাগে না। রাজত্বের শুধু কল্পনাই মানুষকে ঈমানহারা করতে পারে। ক্ষমতার নেশা কুরআনকে গেলাফবদ্ধ করে সরিয়ে রাখে। আমার আফসোস আল-কিন্দ-এর জন্য নয়– আমি ইসলামের ভবিষ্যৎ চিন্তায় অস্থির। আমার ভাইয়েরা একের পর এক খৃস্টানদের হাতে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমার ভাইয়েরা আমার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমার পীর ও মুরশিদ নুরুদ্দীন জঙ্গী দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। কাল-পরশু আমরাও চলে যাব। তারপর কী হবে? এই প্রশ্নটাই আমাকে অস্থির করে তুলছে। যা হোক, আমাদের চেষ্টা করতে হবে, যে ক'দিন বেঁচে থাকি, ইসলামের পতাকা অবনমিত হতে দেব না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা আমাকে নিয়মিত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবে।'

সুলতান আইউবী বার্তাবাহক কমান্ডারকে বিদায় করে দেন।

❁ ❁ ❁

যে চৌকির কমান্ডার যোহ্‌রার সঙ্গে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল, তার এক সিপাহী কায়রো এসে রিপোর্ট করে, চৌকির কমান্ডারকে কয়েকদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না। চৌকিতে যে নাচ-গানের আসর বসেছিল এবং এক নর্তকী কমান্ডারের তাঁবুতে ঢুকেছিল, সে তথ্য জানায়নি সিপাহী। এ তথ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, কমান্ডার দুশমনের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিতে পারে এবং শত্রু বাহিনী তার-ই সহযোগিতায় সীমান্ত অতিক্রম করেছে। আলী বিন সুফিয়ান অভিমত ব্যক্ত করেন, চৌকিটি যেহেতু নদীপথ পাহারার জন্য স্থাপিত, সেহেতু দুশমন সেই নদীপথেই এসে থাকবে। সিদ্ধান্ত হল, একজন বিচক্ষণ কমান্ডারকে একদল রক্ষীসেনাসহ এই চৌকির দায়িত্ব পালনে প্রেরণ করা হবে।

চৌকির কমান্ডার ও যোহ্‌রা হাবশীদের হাতে আবদ্ধ। কিন্তু বন্দি হয়েও তারা বন্দি নয়। এখন তাদের পরনে রং-বেরংয়ের পক্ষীপালকের তৈরি পোশাক। তাদেরকে যে কক্ষে রাখা হয়েছে, সেটিও পাখির পালক ও ফুল দ্বারা সজ্জিত। বিশেষ ধরনের খাবার খাওয়ানো হচ্ছে তাদের। হাবশীদের পুরোহিত তাদের সামনে সেজদা করছে ও বিড়বিড় করে কি যেন পাঠ করছে। অন্য কাউকে তাদের সম্মুখে আসতে দেয়া হচ্ছে না। একবার তাদেরকে গাছের শক্ত ডাল ও লতার তৈরি পালকিতে করে নদীতে গোসল করিয়ে আনা হয়েছে। তারা ভেবেছিল, তাদেরকে বলী দেয়া জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাতে তারা একা থাকছে। কিন্তু বাইরে আট-দশজন হাবশী পাহারা দিচ্ছে। কমান্ডার একাধিকবার পালাবার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোন সুযোগ মিলেনি।

এক রাতে হাবশীদের দু'জন পুরোহিত তাদের কক্ষে আসে। কমান্ডার ও যোহ্‌রা তখন ঘুমিয়ে ছিল। তাদেরকে জাগানো হল। তারা ভাবে, তাদের মৃত্যু এসে গেছে। পুরোহিতগণ তাদের সম্মুখে সেজদাবনত হয়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে যায়। বাইরে দু'টি পালকি রাখা আছে। তার একটিতে কমান্ডারকে, অপরটিতে যোহ্‌রাকে তুলে বসানো হল। দু'জন করে হাবশী পালকি দু'টি কাঁধে তুলে নেয়। পুরোহিতদ্বয় সামনে হাঁটতে শুরু করে। তারা সমকণ্ঠে কি যেন পাঠ করছে। পালকির পিছনে আরো দু'জন হাবশী। তাদের হাতে বর্শা। তারা রক্ষীসেনা। কমান্ডার ও যোহ্‌রা নীরব। পাহাড়ী এলাকা থেকে বের হয়ে তারা নদীর দিকে এগিয়ে যায়। সময়টা মধ্য রাত। জোসনার আলোয় চারদিক ফক্‌ ফক্‌ করছে।

নদীর কূলে পৌঁছে বেহারারা কাঁধ থেকে পালকি দু'টি নামাল। পুরোহিতগণ এগিয়ে এসে কমান্ডার ও যোহ্‌রার পরিধানের পোশাক খুলতে শুরু করে। কমান্ডার চাঁদের আলোতে দেখতে পেলেন, বর্শাধারী রক্ষীদ্বয় ও পালকি বহনকারী হাবশী বেহারারা তাদের প্রতি পিঠ দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেছে। সম্ভবত এমনটা করা তাদের প্রতি নির্দেশ। কমান্ডার হঠাৎ সিংহের ন্যায় এক হাবশীর হাত থেকে তার বর্শাটা ছিনিয়ে নেন। লোকটা একজন অভিজ্ঞ সৈনিক। তিনি পিছনে সরে গিয়ে বর্শাধারী অপর হাবশীর পাজরে বর্শার আঘাত হানেন। আঘাতের ধাক্কায় তার হাতের বর্শাটাও ছিটকে পড়ে যায়। কমান্ডার চীৎকার করে বলে উঠলেন– 'দৌড়ে এস যোহ্‌রা। বর্শাটা তুলে নাও।' যোহ্‌রা ছুটে আসে। কমান্ডার পড়ে যাওয়া বর্শাটায় পা দ্বারা লাথি মারেন। সেটি যোহ্‌রার সম্মুখে চলে যায়। যোহ্‌রা বর্শাটা হাতে তুলে নেয়। কমান্ডার বললেন– 'এবার তুমি পুরুষ হয়ে যাও।' হাবশীরা খালী হাতে মোকাবেলা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা বর্শার মোকাবেলা করতে পারল না। পুরোহিতগণ পালাতে উদ্যত হয়। কমান্ডার তাদেরকে দূরে যেতে দিলেন না। যোহ্‌রাও কমান্ডারের সঙ্গ নেয়। উভয় পুরোহিত খতম হয়ে যায়। অন্যরা মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। কমান্ডারের বর্শা ঠান্ডা করে দেয় সকলকে। কমান্ডার যোহ্‌রাকে নিয়ে চৌকি অভিমুখে রওনা হন। বেশ কিছু পথ অগ্রসর হওয়ার পর দু'জন অশ্বারোহী শান্ত্রী দেখতে পান। কমান্ডার তাদেরকে হাঁক দেন– 'জল্‌দি এদিকে এস।'

সান্ত্রীরা তাদের কমান্ডারকে চিনে ফেলে। কমান্ডার তাদেরকে বললেন– 'ঘোড়া দু'টো আমাদেরকে দাও। আমরা কায়রো যাচ্ছি। তোমরা চৌকিতে ফিরে যাও। কেউ যদি আমাদের সন্ধানে আসে, বলবে, আমরা তাদেরকে দেখিনি।'

সিপাহীদ্বয় পায়ে হেঁটে চৌকিতে ফিরে যায়। কমান্ডার যোহ্‌রাকে একটি ঘোড়ার পিঠে তুলে বসান এবং নিজে অপরটিতে সাওয়ার হয়ে যোহ্‌রাকে বললেন, তোমার যদি অশ্বচালনার অভিজ্ঞতা নাও থাকে, তবু ভয় নেই। ঘোড়া তোমাকে ফেলবে না। কমান্ডার ঘোড়া হাঁকান। ঘোড়া ছুটতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে যোহ্‌রা ভয়ে চীৎকার জুড়ে দেয়। কমান্ডার ঘোড়া থামিয়ে যোহ্‌রাকে তার ঘোড়া থেকে নামিয়ে নিজের ঘোড়ার পিছনে বসিয়ে নেন এবং অপর ঘোড়াটির বাগ নিজের ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে যোহ্‌রাকে বললেন, তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে রাখ।

ঘোড়া পুনরায় ছুটে চলে। কমান্ডার পাহাড়ী এলাকা এড়িয়ে বেশ দূর

দিয়ে এগিয়ে চলছেন। কায়রোর দিক ও পথ তার চেনা। এখনো তিনি দু'মাইল পথ অতিক্রম করেননি, একদিক থেকে আওয়াজ আসে- 'থাম, কে তুমি?' কমান্ডার থামলেন না। এক সঙ্গে চারটি ঘোড়া তাকে ধাওয়া করতে শুরু করে। কমান্ডার তার ঘোড়ার গতি আরো তীব্র করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তার। তিনি অপর ঘোড়াটিকে পাশে নিয়ে এসে তাতে সাওয়ার হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু চলন্ত অবস্থায় যোহরাকে নিয়ে ঘোড়া বদল করবেন কিভাবে। আকাশের চাঁদটা এখন ঠিক মাথার উপরে। জোসনার আলোয় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ধাওয়াকারী লোকগুলো অনেক কাছে চলে এসেছে।

দু'টি তীর ধেয়ে এসে কমান্ডারের পাশ দিয়ে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাঁক আসে,- 'থাম বলছি। অন্যথায় তীর তোমার মাথায় বিদ্ধ হবে।'

কমান্ডার ভাবছে, থামলেও মৃত্যু অবধারিত। এরা আমাদেরকে হাবশীদের হাতে তুলে দেবে আর হাবশীরা আজই আমাদেরকে যবাই করে ফেলবে। বাঁচতে হলে পালাবারই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তিনি ঘোড়াটিকে ডানে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দৌড়াতে শুরু করেন, যাতে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

কমান্ডারের বুঝটা ছিল ভুল। তার ও ধাওয়াকারীদের দূরত্ব কমে গেছে। কমান্ডার তাদের বেষ্টনীতে আটকা পড়ে গেছেন। পালকের পোশাক পরিহিত হওয়ার কারণে কমান্ডারকে পাখি বলে মনে হচ্ছে। যোহরার অবস্থাও একই। কমান্ডার চার ব্যক্তির দিকে তাকান। তার মনে সন্দেহ জাগে। তাদের একজন জিজ্ঞেস করে- 'তোমরা কারা? এই মেয়েটি কে?' একজন বলল- 'কী জিজ্ঞেস করছ? দেখেই তো বুঝা যাচ্ছে, এরা সুদানী। পরেছে কি দেখ।'

কমান্ডার হেসে ফেললেন এবং বলে উঠেন- 'দোস্তরা! আমি তোমাদের-ই ফৌজের একজন কমান্ডার।' তিনি যোহরার পরিচয় প্রদান করেন এবং পুরো ঘটনা খুলে বলেন।

এরা চারজন মিশরের টহলসেনা। সুদানী ফৌজের অবস্থান খুঁজে ফিরছে তারা। তারা কমান্ডার ও যোহরাকে নিয়ে কায়রো অভিমুখে রওনা হয়ে যায়।

✿ ✿ ✿

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ছয়জনের কাফেলা পরদিন রাতে কায়রো গিয়ে পৌঁছে। তাদেরকে সর্বপ্রথম আলী বিন সুফিয়ানের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। আল-আদেলকে রাতেই ঘুম থেকে জাগিয়ে জানানো হয়, চার হাজারের বেশি সুদানী হাবশী ফৌজ অমুক স্থানে লুকিয়ে আছে এবং সালার আল-কিন্দ

তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আল-আদেল তৎক্ষণাৎ তার বাহিনীকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন। সুলতান আইউবীর রণকৌশল মোতাবেক তিনি সম্মুখে অশ্বারোহী বাহিনীকে রাখেন। বাহিনীর পিছন অংশে দু'পার্শ্বে রাখেন দু'টি দল। নিজে অবস্থান নেন বাহিনীর মধ্যখানে। তিনি জানেন, এলাকাটা পাহাড়ী। তিনি ফৌজকে দুর্গ অবরোধের বিন্যাসে বিন্যস্ত করেন এবং কমান্ডারদের স্থানটা বুঝিয়ে দিয়ে অবরোধের-ই ন্যায় নির্দেশনা প্রদান করেন। পাহাড়ে উঠার জন্য তিনি আলাদা কমান্ডো দল ঠিক করে তাদেরকে নিজের কমান্ডে রাখেন।

ওদিকে রাত পোহাবার পর এক ব্যক্তি দেখতে পেল, নদীল কূলে হাবশীদের দু'জন ধর্মগুরু ও চারজন হাবশীর মৃতদেহ পড়ে আছে। আল-কিন্দ ও তার খৃস্টান উপদেষ্টাদেরকে সংবাদ জানানো হল। তারা ঘটনাটা কোন হাবশীকে জানতে দেয়নি। আল-কিন্দকে এ তথ্যও জানানো হয়েছে যে, যে পুরুষ ও মহিলাকে বলির জন্য রাখা হয়েছিল, তারা পালিয়ে গেছে। আল-কিন্দ এবার জিজ্ঞেস করেন, ওরা কারা ছিল? তাকে জানানো হল, তাদের পুরুষ লোকটি নিকটবর্তী চৌকির কমান্ডার। শুনে আল-কিন্দ চমকে ওঠেন। তার মনে পড়ে যায়, লোকটা তাকে দেখেছিল।

'লোকটা সোজা কায়রো চলে গিয়ে থাকবে'– আল-কিন্দ বললেন– 'তাকে চৌকিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন আমাদের আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না। আমরা অতর্কিতভাবে কায়রোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম। সে সুযোগ আমাদের শেষ হয়ে গেছে। আমরা সময় নষ্ট করে ফেলেছি। এখন উল্টো আমরা-ই বেঘোরে প্রাণ হারাব। আমি আমার বাহিনীকে জানি। তারা সংবাদ পাওয়ামাত্র উড়ে এসে পৌঁছে যাবে...। আচ্ছা, একটা কাজ কর, এক্ষুণি নিহত হাবশীদের লাশগুলো নদীতে ভাসিয়ে দাও। হাবশীরা যদি জানতে পারে, তাদের পুরোহিত ও কয়েকজন লোক খুন হয়েছে এবং তারা যাদেরকে বলি দেয়ার জন্য প্রস্তুত করেছে, তারা পালিয়ে গেছে, তাহলে উপায় থাকবে না।

পুরোহিত ও হাবশীদের লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খবর ছড়িয়ে দেয়া হল, নদীর কিনারে বলির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। খোদা আদেশ করেছেন, এবার তোমরা দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। কমান্ডারগণ সংখ্যা অনুপাতে যার যার অধীন হাবশী সেনাদের আলাদা করে ফেলে। তীরান্দাজগণ আলাদা হয়ে যায়। যুদ্ধ পরিকল্পনা মোতাবেত তাদেরকে বিন্যস্ত করা হয়।

তাদেরকে পাহাড়ের ভিতর থেকে বের করে নদীকূলের যে স্থানে পুরোহিত ও হাবশী রক্ষীরা খুন হয়েছে, তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করানো হল। সেখানে ছোপ ছোপ রক্ত ও দু'টি পালকি পড়ে আছে। এক ব্যক্তি সেখানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছে– 'এই রক্ত সেই পুরুষ ও নারীর, যাদেরকে বলি দেয়া হয়েছে।'

বাহিনীটি নদীর কূল ঘেঁষে কায়রো অভিমুখে রওনা হয়ে পড়ে। রণসঙ্গীত গাইছে হাবশীরা। দিন শেষে রাত নামে। রাত যাপনের জন্য কাফেলা ছাউনি ফেলে। পরদিন ভোরে আবার রওনা হয়। তারা পাহাড়ী এলাকা ছেড়ে অনেক দূর এসে গেছে। কেটে যায় এদিনটিও। আসে আরেকটি রাত। বাহিনী এক স্থানে ছাউনি ফেলে। তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে। অনেকটা নিশ্চিন্ত তারা।

মাঝরাতে বাহিনীর পিছন অংশের উপর আল-আদেলের একটি গেরিলা দল আক্রমণ করে বসে। কয়েকটি ঘোড়া দ্রুত ছুটে এসেই অদৃশ্য হয়ে যায়। হৈ চৈ ও তোলপাড় শুরু হয়ে যায় হাবশী ফৌজের মধ্যে। দীর্ঘক্ষণ পর এরূপ আরেকটি হামলা হয়। এবার আক্রমণকারীরা বহু হাবশী সেনাকে দলে-পিষে বেরিয়ে যায়। আল-কিন্দ বাহিনীর আগে আগে অবস্থান করছেন। সংবাদ পেয়ে তিনি পরদিনের অগ্রযাত্রা মুলতবী করে দেন।

'এই গেরিলা আক্রমণ প্রমাণ করছে, আমরা মিশরী বাহিনীর নজরে পড়ে গেছি'– আল কিন্দ বললেন– 'এটা সালাহুদ্দীন আইউবীর বিশেষ রণনীতি। আমরা আর সম্মুখে অগ্রসর হতে পারব না। যতই সাহস করনা কেন, তোমরা মিশরী সৈন্যদের সঙ্গে খোলা মাঠে লড়াই করে টিকতে পারবে না। এখন আমাদেরকে পিছনে সরে গিয়ে পাহাড়ী এলাকায় লড়তে হবে। আমাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। কায়রোবাসী শুধু টের-ই পেয়ে যায়নি- তারা বাহিনীও পাঠিয়ে দিয়েছে!'

'আমরা কি মিশরী সৈন্যদের খুঁজে বের করে খোলা মাঠে যুদ্ধ করতে পারব না?'– এক খৃস্টান কমান্ডার জিজ্ঞেস করে– 'তোমরা যদি সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীকে মুখোমুখি এনে লড়াই করাতে পারতে, তাহলে মিশর আজ তোমারদেই থাকত'– আল-কিন্দ বললেন– 'আমি সেই বাহিনীরই একজন অধিনায়ক। তাদের সঙ্গে কিভাবে লড়াই করতে হবে, আমার চেয়ে তোমরা ভাল জানবেনা।'

শেষ রাতে হাবশী ফৌজ ফেরত রওনা হয়। ছাউনির এলাকাটায় চারদিকে

সর্বত্র হাবশীদের লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। আল-কিন্দ ঠিকই বুঝেছেন যে, তার বাহিনী মিশরী ফৌজের নজরে এসে গেছে। মিশরী ফৌজের তথ্যানুসন্ধানী দল আল-কিন্দ এর প্রতিটি গতিবিধি প্রত্যক্ষ করছে। সুদানী বাহিনীকে পেছনে সরিয়ে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল-আদেল বুঝে ফেললেন আল-কিন্দ পাহাড়ী এলাকায় যুদ্ধ করতে চান। তিনি তখনি অশ্বারোহী তীরান্দাজ বাহিনীটিকে দূর পথ দিয়ে পাহাড়ী এলাকা অভিমুখে রওনা করিয়ে দেন। প্রেরণ করা হল পদাতিক বাহিনীও। তবে অধিকাংশ সৈন্যকে তিনি নিজের কাছে রেখে দেন। তিনি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সেই বাহিনীকে নিয়ে হাবশী ফৌজের পিছনে পিছনে এগিয়ে চলতে শুরু করেন।

পথেই রাত হয়ে যায়। হাবশী ফৌজ ছাউনি ফেলে। আল-আদেলের কমান্ডো সেনারা তৎপর হয়ে ওঠে। একদল হাবশীসেনা জেগে আছে। তারা তীরান্দাজ বাহিনী। তারা বিপুল পরিমাণ তীর ছুঁড়ে। তাতে কিছুসংখ্যক কমান্ডোসেনা শহীদ হয়ে যায়। কিন্তু তারা সুদানী বাহিনীর যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন করে যায়, তা অসামান্য। সবচে' বেশি ক্ষতিটা এই যে, তাতে হাবশী ফৌজের যুদ্ধ করার শক্তি-সাহস ও মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে। তারা কল্পনা করে এসেছিল অন্যকিছু। তারা মুখোমুখি লড়াই করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এখানে দুশমন তাদের চোখেই পড়ছে না। অথচ, তারা প্রলয় ঘটিয়ে ফিরে যাচ্ছে। হাবশী ফৌজ দিকহারা হয়ে পড়ে।

রাত পোহাবার পর বেলা হলে হাবশী ফৌজ তাদের সঙ্গীদের লাশ দেখে। বিপুল লাশ! লাশ আর লাশ!! তারা পিছনে সরে যায়।

সূর্য অস্ত যেতে এখনো বেশ বাকি। তারা পাহাড়ী এলাকায় ঢুকে পড়ে। বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য এখনো ভিতরে ঢুকেনি, এরই মধ্যে তাদের গায়ে উপর থেকে তীর বর্ষিত হতে শুরু করে। আল-আদেল-এর তীরান্দাজ বাহিনী আগেই সেখানে পৌঁছে ওঁত পেতে বসে থাকে। হাবশী কমান্ডারগণ হাঁক- ডাক দিয়ে সৈন্যদেরকে আড়ালে নিয়ে যায় এবং তীর ছোঁড়ার নির্দেশ দেয়। অবশিষ্ট অর্ধেক সৈন্য এখনো বাইরে। তাদেরকে পিছনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আল-কিন্দ তাদেরকে পাহাড়ে উঠিয়ে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং উপর থেকে তীর নিক্ষেপ করার পরিকল্পনা আঁটে। তার এই পরিকল্পনা বেশ সফলও হয়। বহু হাবশীসেনা পাহাড়ে উঠে যেতে সক্ষম হয় এবং তারা সফল তীরান্দাজী করে। তাতে আল-আদেল-এর অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা বেশ চমৎকার। তিনি সেখান থেকে তার বাহিনীকে পিছনে সরিয়ে

নিয়ে যান। তার আগাম নির্দেশনা মোতাবেক অপর দিক থেকে তীরান্দাজ ও অন্যান্য বাহিনী পাহাড়ের উপরে উঠে যাচ্ছে। অশ্বারোহী বাহিনীর একটি ইউনিটকে নদীর তীরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

আসওয়ানের এই পাহাড়ী অঞ্চলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হল। উপত্যকা ও পর্বতপৃষ্ঠে অনেক তীর ছোঁড়াছুঁড়ি হল। তারপর অশ্বারোহী বাহিনী উপত্যকায় প্রলয় সৃষ্টি করার নির্দেশ পেল। রাতে হাবশীরা লুকিয়ে থাকে বটে; কিন্তু আল-আদেল তার মিনজানীক বাহিনীকে নির্দেশ দেন, স্থানে স্থানে এদিক-সেদিক সর্বত্র দাহ্য পদাথ্য ভর্তি পাতিল ছুঁড়ে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে থাক। কিছুক্ষণ পরই পর্বতমালার ঢালুতে ও পাদদেশে অগ্নিশিখা জ্বলে উঠে এবং চতুর্দিক আলোকিত হয়ে যায়। এই আলোতে সারা রাত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। যখন ভোর হল, তখন হাবশীরা সর্বশান্ত-নীরব। তাদের কিছু লোক পাতাল ঠিকানায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

দিনের বেলা আল-কিন্‌দ-এর লাশ পাওয়া গেল। কারো তীর কিংবা তরবারীর আঘাতে নয়– লোকটি নিজের তরবারীর আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে। তারই তারবারীটা তার লাশের হৃদপিন্ডের উপর গেঁথে আছে। অর্থাৎ- আল-কিন্‌দ আত্মহত্যা করেছেন। কয়েকজন খৃস্টান ও সুদানী কমান্ডার জীবিত বন্দি হল। বন্দি হল এক হাজারেরও বেশি হাবশী যোদ্ধা।

আল-আদেল সেখান থেকেই সুলতান আইউবীর নিকট পয়গাম লিখে দূত প্রেরণ করেন। তাকে নির্দেশ দেন, যত দ্রুত সম্ভব সুলতানের নিকট পৌঁছে যাও; তিনি চরম অস্থিরতার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছেন।

রক্ত চাই

ইসলামী দুনিয়ার যে ভূখণ্ডে আজ সিরীয় মুসলমানরা লেবাননী খৃস্টানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ফিলিস্তিনী মুক্তি কর্মীদের উপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে, আটশত বছর পূর্বে সেই ভূখণ্ডে বহু মুসলমান আমীর, শাসক ও সুলতান জঙ্গীর বালক পুত্র খৃস্টানদের মদদে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। মুসলমান মুসলমানের রক্ত ঝরাচ্ছিল। ফিলিস্তীন তখন খৃস্টানদের কব্জায়। সুলতান আইউবী প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসের সেই ভূখণ্ডটিকে কাফেরদের হাত থেকে মুক্ত করার দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে ময়দানে নেমেছেন। ফিলিস্তীন উদ্ধারে তাঁর সফল হওয়াও নিশ্চিত ছিল। কিন্তু একদল মুসলমান-ই তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বসে। ফিলিস্তীন আজো কাফেরদের কব্জায় এবং স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনীরা যায়নবাদী হায়েনাদের ট্যাংকের চাকায় নিষ্পিষ্ঠ হচ্ছে।

১১৭৫ সালের মার্চ মাস। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সেই ভূখণ্ডের-ই আলরিস্তান পর্বতমালার কোন এক স্থানে তাঁর হেডকোয়ার্টারে বসে উপদেষ্টা ও কমান্ডারদের নিয়ে পরবর্তী যুদ্ধপরিকল্পনা সম্পর্কে কথা বলছেন। আগেই উল্লেখ করেছি, সুলতান আইউবী হাল্‌ব অবরোধ করে পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তার কারণ, আল-মালিকুস সালিহ খৃস্টান সম্রাট রেমন্ডের সঙ্গে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, সে মোতাবেক সম্রাট রেমন্ড সুলতান আইউবীর বাহিনীর উপর পিছন থেকে হামলা করার পরিকল্পনা নিয়ে এসে পড়েছিলেন। সুলতান আইউবী যথাসময়ে অবরোধ তুলে নেন এবং কৌশল অবলম্বন করে রেমন্ডের বাহিনীর পিছনের চলে যান এবং রেমন্ড যুদ্ধ ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচানো শ্রেয় মনে করেন।

হাল্‌ব মুসলিম অধ্যুষিত নগরী। কিন্তু এখন তা ইসলাম ও ইসলামী রাজ্যের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মুমিন সুলতান আইউবীর দুশমন মুসলমান আমীর ও খৃস্টানদের পুতুল খলীফা আল-মালিকুস সালিহ-এর সামরিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। খলীফা ও আমীরদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে হাল্‌বের মুসলমান সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে মাঠে নামে।

সুলতান আইউবী হাল্‌বের উপর পুনরায় আক্রমণ করে গাদ্দার ও ঈমান-বিক্রেতাদের এই আড্ডাটি গুড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছিলেন। ঠিক এমন সময় মিশর থেকে সংবাদ আসে যে, মিশরে তাঁর এক সেনা অধিনায়ক আল-কিন্‌দ খৃস্টানদের মদদে মিশরের মাটিতে সুদানী সৈন্যের সমাবেশ ঘটাচ্ছেন। তার লক্ষ্য, সুলতান আইউবীর অনুপস্থিতির সুযোগে মিশর আক্রমণ করবে এবং সুলতান আইউবীর হাত থেকে মিশরের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু সুলতান আইউবীর ভাই অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সুদানী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন এবং আল-কিন্‌দ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। তবে এই সাফল্যের সংবাদ এখনো সুলতান পাননি। তিনি আলরিস্তানের পার্বত্য এলাকায় চিন্তিত মনে বসে আছেন।

ইসলামের এই মহান সেনানী চারদিক থেকে সমস্যা ও সংকটে নিপতিত হয়ে পড়েছেন। একদিকে কয়েকজন মুসলিম আমীরের সেনাবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। অপরদিকে খৃস্টানদের ষড়যন্ত্র। এসবের মোকাবেলায় সুলতানের হাতে যে সৈন্য আছে, তা নগন্য। কিন্তু তিনি এমন কৌশল ও কৃতিত্বের সঙ্গে সেসব সমস্যার মোকাবেলা করেন, যা কারো কল্পনায় ছিল না। তাঁর দুশমনদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শীতের মওসুমে এই পাহাড়ী ভূখন্ডে যুদ্ধ করার কল্পনাও কেউ করবে না। উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোতে বরফ পড়ছে। কিন্তু সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এমন এক সময় আক্রমণ পরিচালনা করেন, যখন শীত তুঙ্গে। এই দুঃসাহসী ও অপ্রত্যাশিত অভিযান পরিচালনা করে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীটি দ্বারা শত্রু বাহিনীকে যে কোন সুবিধাজনক স্থানে টেনে নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত করাতে পারেন। তার সৈন্যসংখ্যা এতই কম যে, পরম আত্মবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও মাঝে-মধ্যে তাঁর পরাজয়ের আশংকা অনুভূত হত। কিন্তু তারপরও শত্রুপক্ষ তাঁর ভয়ে তটস্থ। সুলতান আইউবীর আশংকা, রেমন্ড পরিকল্পনা ও রাস্তা বদল করে তাঁর উপর হামলা করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে রেমন্ডের অবস্থা হল, তিনি এই ভয়ে নিজ এলাকা ত্রিপোলীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্ত করে তোলেন যে, সুলতান আইউবী হামলা করতে পারেন।

সুলতান আইউবী রেমন্ডকে যে প্রক্রিয়ায় বিতাড়িত করেন, তাতে খৃস্টান সেনাদের ধাওয়া করে সাফল্য অর্জন করার চেষ্টা করাই ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সৈন্য কম হওয়ার কারণে তিনি সে ঝুঁকি নেননি। বড় কারণ হল, মিশরে আল-কিন্‌দ-এর বিদ্রোহ ও গাদ্দারী তাঁকে থামিয়ে দিয়েছিল। তিনি আশংকা করছিলেন যে, মিশরের পরিস্থিতি গুরুতর রূপ লাভ করবে। সে পরিস্থিতিতে

তাঁকে মিশর ফিরে যেতে হবে। আর যদি তাঁকে মিশর যেতেই হয়, তাহলে মুসলিম আমীরগণ ইসলামী দুনিয়াকে খৃস্টানদের কাছে নীলাম করে দেবে, তাতে সন্দেহ নেই। এখন সবকিছু নির্ভর করছে, মিশর থেকে কী সংবাদ আসে, তার উপর।

আলরিস্তানের হেডকোয়ার্টারে বসে উপদেষ্টামন্ডলী ও কমান্ডারদের নিকট মিশরের ব্যাপারেই তাঁর উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করছিলেন সুলতান। এমন সময় তিনি সংবাদ পান যে, কায়রো থেকে দূত এসেছে। খবরটা পেয়ে সুলতান রাজা-বাদশাদের ন্যায় বললেন না, তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও। বরং সংবাদটা শোনামাত্র তিনি বসা থেকে উঠে দাঁড়ান এবং দৌড়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে যান। দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত দূত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে। সুলতান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, কোন সুসংবাদ নিয়ে এসেছ তো?

'সংবাদ খুবই ভাল মহামান্য সুলতান'– দূত জবাব দেয়– 'মাননীয় আল-আদেল হাবশী সেনা বাহিনীটিকে আসওয়ানের পার্বত্য এলাকায় এমনভাবে পরাস্ত করেছেন যে, সুদানের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিনের জন্য আংশকা দূর হয়ে গেছে।'

সুলতান আইউবী দু'হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। তাঁবুর ভিতর থেকে অন্যান্যরাও বেরিয়ে আসে। সুলতান তাদেরকে সুসংবাদটা শোনান এবং দূতকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে যান। তাঁবুতে তার জন্য আহারের ব্যবস্থা করেন। সুলতান দূতের মুখ থেকে আসওয়ান যুদ্ধের বিস্তারিত শুনে তাকে জিজ্ঞেস করেন– 'আমাদের কতজন সৈন্য শাহাদাতবরণ করেছে?'

'তিনশত সাতাশজন'– দূত জবাব দেয়– 'আর আহত হয়েছে পাঁচশ'রও বেশি। দুশমনের সম্পূর্ণ যুদ্ধ সামগ্রী আমাদের দখলে এসে গেছে। এক হাজার দু'শত দশজন হাবশী সেনা বন্দী হয়েছে। খৃস্টান ও সুদানী নেতা-কমান্ডার যারা বন্দী হয়েছে, তারা এই সংখ্যার বাইরে। আল-আদেল বন্দীদের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত জানতে চেয়েছেন।'

'খৃস্টান ও সুদানী সালার-কমান্ডারদেরকে কয়েদখানায় ফেলে রাখ'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর বলতে শুরু করেন– 'আর যে হাজারেরও বেশি হাবশী সেনাকে বন্দী করেছ, তাদেরকে আসওয়ানের পাহাড়ী এলাকায় নিয়ে যাও। তারা মিশরে অনুপ্রবেশ করে পর্বতমালার যে গুহাগুলোতে আত্মগোপন করেছিল, তাদের দ্বারা সেগুলোকে পাথর দিয়ে ভরে দাও। ওখানে ফেরাউনদের যেসব পাতালপ্রাসাদ আছে,

সেগুলোকে পাথর দ্বারা পূর্ণ করে দাও। যদি পাহাড় খনন করার প্রয়োজন পড়ে, তাও ঐ হাবশীদের দ্বারা করাও। ওখানে কোন গুহা এবং পাতালপ্রাসাদ যেন অবশিষ্ট না থাকে। আল-আদেলকে বলবে, বন্দীদের সঙ্গে যেন মানবিক আচরণ করা হয়। দৈনিক তাদের দ্বারা ঠিক অতটুকু কাজ করাবে, যতটুকু কাজ সাধারণত একজন মানুষ করতে পারে। কোন কয়েদী যেন খানা-পানিতে কষ্ট না পায় এবং কারো উপর যেন শুধু এজন্য অত্যাচার করা না হয় যে, সে বন্দী। আসওয়ানের সন্নিকটে খোলামেলা জায়গায় জেলখানা তৈরী করে নাও। তোমাদের হাতে যদি অন্য কোন কাজ থাকে, তাহলে সে কাজটাও কয়েদীদের দ্বারা করাও। সুদানীরা যদি তাদের বন্দীদের ফিরিয়ে নিতে চায়, তাহলে আমাকে অবহিত করবে। আমি স্বয়ং তাদের সঙ্গে বুঝা-পড়া করব।'

এই বার্তা প্রদানের পর সুলতান আইউবী দূতকে বললেন– 'আল-আদেলকে বলবে, আমার সাহায্যের তীব্র প্রয়োজন। নিজের প্রয়োজনের দিকেও লক্ষ্য রাখবে। সেনাভর্তির গতি বাড়িয়ে দাও। সারাক্ষণ সামরিক মহড়া অব্যাহত রাখ। গোয়েন্দা জাল আরো বিস্তৃত কর। আল-কিন্দ-এর ন্যায় নির্ভরযোগ্য সালার-ই যদি গাদ্দারীর পথ বেছে নিতে পারে, তাহলে তোমরাও গাদ্দারও হয়ে যেতে পার, আমিও পারি। এখন থেকে কাউকে বিশ্বাস করবে না। আলী বিন সুফিয়ানকেও বলবে, সে যেন আরো সতর্ক ও তৎপর হয়।'

'মিশর থেকে সাহায্য এসে না পৌঁছা পর্যন্ত কোন অভিযান পরিচালনা না করাই ভাল হবে'– দূতকে বিদায় দিয়ে সালার ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের উদ্দেশে সুলতান আইউবী বললেন– 'সে পর্যন্ত আমরা এতদিনের সাফল্য ধরে রাখার কাজে নিয়োজিত থাকব। তোমরা বর্তমান পরিস্থিতিটার উপর একটু দৃষ্টি দাও। তোমাদের ভাই-ই তোমাদের বড় দুশমন! তোমাদের শক্তিশালী দুশমন তিনজন। এক. আল-মালিকুস সালিহ, যিনি হাল্‌বে জেঁকে বসে আসেন। দুই. তার কেল্লাদার গোমস্তগীন, যিনি হাররানে সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে সময়ের অপেক্ষা করছেন এবং তিন. মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীন। এ তিনটি বাহিনী যদি সংঘবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তাদের মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে না। তোমরা রেমন্ডকে হটিয়ে দিয়েছ ঠিক; কিন্তু সে এই অপেক্ষায় আছে যে, মুসলিম বাহিনী পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়বে আর সে পিছন দিক থেকে আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। আমি অবরুদ্ধ হয়েও যুদ্ধ করতে জানি; কিন্তু সেই পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে চাই।'

'আচ্ছা, আল-মালিকুস সালিহ্, গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীনকে ইসলাম ও কুরআনের দোহাই দিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার একটা চেষ্টা চালালে কেমন হয়?' এক সালার বললেন।

'না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'যারা নিজেদের মন-মস্তিষ্ককে সত্যের আওয়াজের জন্য সীল করে রাখে, আল্লাহর কহর ও গজব ছাড়া তাদের মন-মস্তিষ্ক উন্মুক্ত হয় না। আমি কি চেষ্টা করিনি? তার জবাবে আমি নানা রকম হুমকি-ধামকি লাভ করেছি। এখন যদি আবার আমি সমঝোতার প্রস্তাব দিয়ে দূত প্রেরণ করি, তারা ভাববে, সালাহুদ্দীন ভয় পেয়ে গেছে। এখন আমি তাদের উপর আল্লাহ গজব হয়ে নিপতিত হয়ে চাই, যা তাদের বিবেক-বুদ্ধির বন্ধ দুয়ার খুলে দেবে। সেই গজব হচ্ছে তোমরা এবং এই ফৌজ।'

সুলতান আইউবী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন–

'তোমরা হাল্ব অবরোধ করার পর হাল্বের মুসলমানরা যে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করল, তা তোমরা কখনো ভুলবে না। তারা নিশ্চয় আমাদের বিপক্ষে লড়াই করেছে। কিন্তু আমি তাদের প্রশংসা করি, এমন দুঃসাহসী লড়াই কেবল মুসলমানই লড়তে পারে। হায়! যদি এই চেতনা ও এই শক্তি ইসলামের পক্ষে ব্যবহৃত হত! তোমরা তো জান, আমি রাজা হতে চাই না। আমার লক্ষ্য হল, ইসলামী দুনিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাক এবং মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলো কেন্দ্রীভূত হয়ে খৃস্টানদের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হোক এবং ফিলিস্তীনকে মুক্ত করে আমরা সালতানাতে ইসলামিয়াকে বিস্তৃত করি।'

'আমরা নিরাশ নই মাননীয় সুলতান!'– এক সালার বললেন– 'নতুন সেনা ভর্তি চলছে। এ অঞ্চলেও বিপুলসংখ্যক যুবক ভর্তি হচ্ছে। মিশর থেকেও বিশেষ সাহায্য আসছে। আমরা আপনার প্রতিটি বাসনাকে পূর্ণ করব ইনশাল্লাহ।'

'কিন্তু তোমরাই বল, আমি কতদিন বেঁচে থাকব?'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তোমরা-ই বা ক'দিন জীবিত থাকবে? শয়তানী শক্তি দিন দিন জোরদার হচ্ছে। তাদের সীমানার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। যে বন্ধুদের উপর আমার পূর্ণ আস্থা ছিল, তারা খৃস্টানদের হাতে খেলছে আর আমার হাতে খুন হচ্ছে। আল-কিন্দ তোমাদের-ই মধ্যকার একজন বিশ্বস্ত সালার ছিল। সেই আল-কিন্দ সুদান থেকে হাবশী সৈন্যদের ডেকে এনে মিশর হামলা করার চেষ্টা করেছে শুনে কি তোমরা অবাক হওনি? লোকটা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে যে, সে নিজেই নিজেকে হত্যা করেছে। আমি তাকে মৃত্যুদন্ড দেইনি। ক্ষমতার নেশা, সম্পদের লোভ আর নারীর মোহ ভাল ভাল মানুষকেও অন্ধ করে দেয়।

ঈমান সোনার ন্যায় চমকায় না। ঈমান নারীর ন্যায় বিলাসিতার বস্তু নয়। ঈমান মানুষকে রাজা ও ফেরাউনে পরিণত হতে দেয় না। আত্মার দ্বার বন্ধ করে দেখ, ঈমান নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। তারপর বিবেকের উপর আবরণ পড়ে যাবে।'

'স্পেন থেকে তোমাদের পতাকা হারিয়ে গেল কেন? ইতিহাস বলছে, স্পেনের মুসলমানদের এই পতন ছিল কাফেরদের ষড়যন্ত্রের ফল। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র সফল হল কেন? কারণ, মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদেরকে কাফেরদের ক্রীড়নকে পরিণত করেছিল। তারা তাদের ঈমান নীলাম করে দিয়েছিল। স্পেন ছিল তাদের, যারা সমুদ্র পার হয়ে পারাপারের নৌকাগুলো পুড়ে ফেলেছিল, যাতে পালাবার কিংবা ফিরে যাওয়ার চিন্তা-ই মাথায় না আসে। স্পেনের মূল্য তারা-ই বুঝে, যারা বাহন পুড়ে ফেলেছিল। স্পেন ছিল শহীদদের। খুনের নজরানা আদায় করে যারা রাজ্য জয় করে, তাদের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সেই লোকগুলো দেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, যারা এক ফোঁটাও রক্ত ঝরায়নি। ভবিষ্যতেও এমনই ঘটবে। তারা যেহেতু দেশটা বিনামূল্যে পেয়ে যায়, তাই দেশটাকে তারা বিলাসিতার উপকরণে পরিণত করে এবং সিংহাসনের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য ঈমানদার দেশপ্রেমী লোকদের জবান বন্ধ করে দেয়, তাদের গলা টিপে ধরে রাখে।'

স্পেনেও এটাই ঘটেছে। কাফেররা আমাদের রাজা-বাদশাহদেরকে হীরা-জহরত ও ইউরোপের সুন্দরী মেয়েদের বিনিময়ে হাত করে নিয়েছিল। তাদেরকে তাদের-ই সৈন্যদের বিপক্ষে দাঁড় করিয়েছিল। মুজাহিদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল। এভাবে স্পেনের ইসলামী রাজ্য ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যায়। রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সহচরগণ দেহের রক্ত দ্বারা বাতি জ্বালিয়ে আধা পৃথিবীকে সত্যের আলোয় আলোকিত করেছিলেন। সেই চেরাগ এখন কোথায়? সেই চেরাগ এখন একটি একটি করে নিভে যাচ্ছে। সেই চেরাগ এখন রক্ত চায়। কিন্তু রক্ত দেয়া যাদের কর্তব্য ছিল, তারা খৃস্টানদের মদ ও নারীর নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রথম কেবলা মুসলমানের হাতছাড়া। আর আমরা মুসলমানরা একজন আরেকজনের রক্ত ঝরাচ্ছি।'

'কাফেরদের আগে গাদ্দারদের হত্যা করা আবশ্যক'– একজন উপদেষ্টা বললেন– 'আমরা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি, তাহলে আমরা ব্যর্থ হব না।'

'আমি দেখতে পাচ্ছি, এই ভূখন্ড খুনের মাঝেই ডুবে থাকবে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'শাসনক্ষমতা হয়ত মুসলমানদের-ই হাতে থাকবে; কিন্তু তাদের মন-মস্তিষ্কের উপর খৃস্টানরা শাসন করবে।'

❁ ❁ ❁

সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীকে এমন এক পজিশনে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করে রাখেন যে, কোন একটি দুর্গ জয় হওয়ার পর শত্রুপক্ষ তার উপর সরাসরি হামলা চালাতে পারবে না। তিনি বিজিত দুর্গগুলোতে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছেন। কারণ, তিনি দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে লড়াই করার পক্ষপাতী নন। পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিটি পবর্তচূড়ায় তিনি তীরান্দাজ বসিয়ে রেখেছেন। যে পথটি সংকীর্ণ, তার উপর পাহাড়ে বড় বড় পাথরসহ কিছু লোক নিয়োজিত রেখেছেন। তাদের দায়িত্ব হল, দুশমন এই পথ অতিক্রম করার সময় উপর থেকে পাথর গড়িয়ে ফেলে দিবে। দামেস্ক থেকে আসা পথটিকে তিনি কমান্ডো ধরনের টহল সেনাদের দ্বারা নিরাপদ করে রেখেছেন, যাতে দুশমন তাঁর রসদের কোন ক্ষতি করতে না পারে। একটি জায়গা এমন যে, সেটি 'হামাতের শিং' নামে খ্যাত। প্রশস্ত একটি উপত্যকা। তাতে বেশ উঁচু একটি পাথর বিদ্যমান। পাথরটির মাথা শিং-এর ন্যায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে বলে তাকে 'হামাতের শিং' বলা হয়। সুলতান আইউবী পার্বত্য এলাকায় এই উপত্যকাটিকে ফাঁদ হিসেবে নির্বাচিত করেন। তিনি তার সালারদেরকে কৌশল শিখিয়ে দেন যে, দুশমন যদি বাইরে থেকে এসে যুদ্ধ করতে চায়, তাহলে এই উপত্যকায় টেনে নিয়ে এসে যুদ্ধ করাবে।

সুলতান আইউবী সমগ্র এলাকায় এমন জায়গাগুলোতে পজিশন গ্রহণ করেছেন যে, সেসব জায়গা থেকে দুশমনকে পছন্দমত যে কোন স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাড়াছাও তাঁর গেরিলা যোদ্ধারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে ফিরছে। গুপ্তচরবৃত্তির ব্যবস্থাপনা এতই শক্তিশালী যে, দুশমনের দুর্গগুলোতে পর্যন্ত আইউবীর চর রয়েছে। তারা খবরা-খবর প্রেরণ করছে। সুলতান তথ্য পেয়েছেন, আল-মালিকুস সালিহ তার গভর্নর গোমস্তগীন ও মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনকে সাহায্যের জন্য তলব করেছেন এবং তারা শর্তসাপেক্ষে সাহায্য দেবেন বলে জানিয়েছেন। গুপ্তচররা সুলতানকে আরো অবহিত করে যে, মুসলমান শাসক ও আমীরগণ বাহ্যত আল-মালিকুস্-সালেহের সাথে ঐক্যবদ্ধ হলেও তাদের মাঝে পরস্পর মনের মিল নেই। তারা প্রত্যেকেই যুদ্ধ করে অধিক থেকে অধিকতর ভূখণ্ডে নিজ নিজ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে। খৃষ্টানরা তাদেরকে যত না সাহায্য দিচ্ছে, উস্কানি দিচ্ছে তার চে' বেশি। তারা তাদের পারস্পরিক মতবিরোধকে জিইয়ে রাখার চেষ্টায় লিপ্ত।

'আচ্ছা, শামসুদ্দীন এবং শাদবখত-এর কোন সংবাদ আসেনি, না?' সুলতান আইউবী হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন।

'না, তাজা কোন সংবাদ আসেনি'– হাসান বিন আব্দুল্লাহ জবাব দেন– 'তারা বড় সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। গোমস্তগীন কোন পদক্ষেপ নিলে তারা তাদের যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাবে। তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে, তারা পরিস্থিতি অনুপাতে অভিযান পরিচালনা করবে।'

হাসান বিন আব্দুল্লাহ সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মকর্তা– আলী বিন সুফিয়ানের নায়েব। আলী বিন সুফিয়ান বর্তমানে মিশরে অবস্থান করছেন। সেখানকার পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। মিশরে তাকে একান্ত প্রয়োজন।

সুলতান আইউবী হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর সঙ্গে বাইরে পায়চারি করছেন। হঠাৎ করেই তিনি শামসুদ্দীন ও শাদবখত-এর প্রসঙ্গটা উল্লেখ করেন। এরা দু'জন বর্তমানে গোমস্তগীনের সেনাঅধিনায়ক। গোমস্তগীন নামে মুসলমান হলেও শয়তান চরিত্রের একজন লোক। পদমর্যাদায় আল-মালিকুস সালিহ-এর গভর্নর। অবস্থান করছেন হাররান-এর দুর্গে। এই দুর্গের ভিতরে ও বাইরে তিনি বিপুলসংখ্যক সৈন্য সমবেত করে রেখেছেন। লোকটা তথাকথিত খেলাফতের অধীন এবং খলীফার অনুগত। কিন্তু বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার বলে সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন অবস্থান তৈরি করে রেখেছেন যে, কাউকে তিনি পাত্তা-ই দিচ্ছেন না। কেন্দ্রকে উপেক্ষা করে খৃস্টানদের সঙ্গে রয়েছে তার ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক। তার দুর্গে নুরুদ্দীন জঙ্গীর ধৃত খৃস্টান কয়েদী ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন কমান্ডারও ছিল। জঙ্গীর মৃত্যুর পর কারো সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা না করেই তিনি তাদেরকে মুক্ত করে দেন। এটা করেছেন তিনি খৃস্টানদের সন্তুষ্টি ও সুদৃষ্টি লাভের আশায়। গোমস্তগীন এখন খৃস্টানদের বিরোধী নয়। বরং তাদের সাহায্য নিয়ে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি।

গোমস্তগীনের দু'জন বিশেষ সালার রয়েছে। বিচক্ষণতা ও সামরিক যোগ্যতার কারণে তারা তার অত্যন্ত আস্থাভাজন। তারা দু'জন আপন ভাই। একজনের নাম শামসুদ্দীন, অপরজনের নাম শাদবখত। দু'জন ভারতীয় মুসলমান। ইরাকের তৎকালীন ঐতিহাসিক কামালুদ্দীন 'হালবের ইতিহাস' নামক একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন– 'শামসুদ্দীন ও শাদবখত সহোদর ভাই ছিলেন এবং সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর জীবদ্দশায় ভারত উপমহাদেশ থেকে তাঁর নিকট গিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে সেনাবাহিনীর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করে হাররান প্রেরণ করেছিলেন।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদও তাঁর রোজনামচায় এদের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এও লিখেছেন– 'আরবে যেহেতু মানুষের নামের সঙ্গে পিতার নামও উল্লেখ করার নিয়ম ছিল, তাই এই দু'ভাই-এর নাম শামসুদ্দীন আলী বিন জিয়া এবং শাদবখত আলী বিন জিয়া বলে উল্লেখ করা হত। কিন্তু এই জিয়া কে ছিলেন, তার কোন বিবরণ ইতিহাসে উল্লেখ নেই। তারা ইতিহাসে আলোচিত হওয়ার পিছনে একটি ঘটনা আছে। ঘটনাটা এরকম–

গোমস্তগীন ছিলেন স্বাধীনচেতা, তথা স্বেচ্ছাচারী চরিত্রের মানুষ। হাররানে কার্যত তারই শাসন চলত। তিনি ইবনুল খাশিব আবুল ফজল নামক তার অনুগত এক ব্যক্তিকে কাজী তথা বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ইবনুল খাশিব ছিল চাটুকার ও দুশ্চরিত্র মানুষ। ইসলামের কাজীগণ তাদের ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞার কারণে মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ। কিন্তু জনসমাজে ইবনুল খাশিবের খ্যাতি ছিল অবিচার ও গোমস্তগীনের চাটুকারিতার কারণে। শামসুদ্দীন ও শাদবখত তার অন্যায়-অবিচারের কাহিনী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তারা কিছু বলতেন না। তারা দেশের সামরিক শাখার কর্মকর্তা। কাজীর বিচার-ফয়সালা ও নাগরিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। গোমস্তগীনের উপর কাজী সাহেবের বেশ প্রভাব ছিল। প্রভাব তিনি সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। গোমস্তগীন তাকে কিছু বলতে সাহস করতেন না।

নুরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের পর শত শত সৈন্য নিয়ে সুলতান আইউবী যখন দামেস্ক আসেন, তখন তিনি অত্র অঞ্চলগুলোতে তাঁর বহু গুপ্তচর ছড়িয়ে দেন। তাদের একজনের নাম আনতানুন। আনতানুন তুর্কী বংশোদ্ভূত সুদর্শন এক যুবক। তুর্কী ভাষা ছাড়াও আরবীতে কথা বলতে পারে অনর্গল। দায়িত্ব পালনার্থে আনতানুন চলে যায় হাররান। সাক্ষাৎ করে গোমস্তগীনের সঙ্গে। গোমস্তগীনকে নিজের কাহিনী শোনায়– গড়া কাহিনী।

'আমি জেরুজালেমের বাসিন্দা। খৃস্টানরা সেখানকার মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে। তারা আমার দু'টি যুবতী বোনকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে এবং ভাই ও পিতাকে আটক করে রেখেছে। আমি পালিয়ে আপনার নিকট চলে এসেছি। আমি খৃস্টানদের থেকে এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীতে যোগ দিতে চাই।'

আনতানুন এমন একটা বেশ ধারণ করে রেখছিল যে, তাতে মনে হচ্ছিল, সে জেরুজালেম থেকে পায়ে হেঁটে এসেছে এবং ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে শোচনীয় অবস্থা। গোমস্তগীন তার প্রতি সেনানায়কের দৃষ্টিতে তাকান। তার দৈহিক গঠন তার

পছন্দ হয়। তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি ঘোড়সওয়ারী ও তীরান্দাজী জান? জবাবে আনতানুন বলল, এ মুহূর্তে আমার খানিক বিশ্রাম ও খাবার প্রয়োজন। তারপর দেখাব, আমি কী জানি। গোমস্তগীন তাকে খানা খাইয়ে শুইয়ে দেন। দীর্ঘক্ষণ পর ঘুম থেকে জাগ্রত হলে তাকে গোমস্তগীনের দরবারে হাজির করা হয়। গোমস্তগীন একটি ঘোড়া তলব করেন। আনতানুনকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে এক দেহরক্ষীর ধনুক ও একটি তীর দিয়ে বললেন, তুমি তোমার খুশীমত কোথাও নিশানা করে যোগ্যতার প্রমাণ দাও। তারপর ঘোড়া দৌড়াও।

নিকটেই একটি বৃক্ষ ছিল। তার ডালে নানা প্রজাতির কতগুলো পাখি বসা। সবচে' ছোট পাখিটি হল চড়ুই। আনতানুন চড়ুইটিকে নিশানা করে তীর ছোঁড়ে। তীর পাখিটির গায়ে বিদ্ধ হয়ে তাকে নিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আনতানুন আরো একটি তীর চেয়ে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে এবং বলে, আমি ফিরে আসলে তোমরা কোন একটি বস্তু আকাশে ছুঁড়ে মারবে। গোমস্তগীনের এক দেহরক্ষী সেখানে দাঁড়ান ছিল। সে দৌড়ে গিয়ে তার খাওয়ার থালাটা নিয়ে আসে। আনতানুন ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে যায়। বেশ কিছুদূর গিয়ে আবার পিছন দিকে মোড় নেয়। এবার ধনুকে তীর সংযোজন করে। এক দেহরক্ষী থালাটা শূন্যে নিক্ষেপ করে। আনতানুন ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে থালাটা লক্ষ করে তীর ছোঁড়ে। তীরের আঘাত খেয়ে থালা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। সে ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে অশ্বচালনার আরো কিছু কৃতিত্ব প্রদর্শন করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়। উপস্থিত কারুর-ই জানা ছিল না যে, আনতানুন একজন অভিজ্ঞ গুপ্তচর ও কমান্ডো সেনা।

আনতানুনের দৈহিক কাঠামো, গাত্রবর্ণ ও যোগ্যতা দেখে গোমস্তগীন অত্যন্ত প্রীত ও প্রভাবিত হন এবং তাকে তারই দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ দেন। গোমস্তগীনের বাসভবন পাহারা দেয়ার দায়িত্বও তার উপর ন্যস্ত হয়।

একবারের ঘটনা। আনতানুন গোমস্তগীনের বাসভবন প্রহরায় নিয়োজিত। এ দায়িত্ব তাকে লাগাতার আট-দশদিন পালন করতে হবে। বিলাসপ্রিয় মুসলিম শাসকদের ন্যায় গোমস্তগীনের হেরেমও জাঁকজমকপূর্ণ। বার-চৌদ্দটি সুন্দরী মেয়ে বাস করে তার হেরেমে। আনতানুন ডিউটিতে গিয়েই প্রথমে ভবনের প্রতিটি দরজা-জানালা ও প্রতিটি কোণ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে নেয়। ভবনের সকল চাকর-চাকরানী ও মেয়েদের বলল, যেহেতু এই ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ করা আমার কর্তব্য, তাই এর প্রতিটি স্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়া আমার আবশ্যক। ঘরের প্রতিটি কক্ষের কোথায় কী আছে, আমার জানা থাকতে হবে।

আনতানুন অত্যন্ত চতুর মানুষ। কথার যাদু চালাতে পারঙ্গম। হেরেমের সর্বত্র অবাধ যাতায়াতে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকতে দিল না সে। বারান্দায় একটি মেয়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। মেয়েটি গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে? এখানে কী করছ?'

'আমি এই ভবনের মোহাফেজ সৈনিক'– আনতানুন জবাব দেয়– 'ভবনে প্রবেশ-নির্গমনের দরজা ক'টি, কিরূপ ও কোথায় কোথায়, তা ঘুরে-ফিরে দেখছি। এও দেখছি যে, আপনি ছাড়া এখানে আর কারা থাকে।'

'এখানে মোহাফেজ তো এর আগেও ছিল'– মেয়েটি খানিক বিস্মিত কণ্ঠে বলল– 'তাদের কেউ-ই তো কখনো ভিতরে প্রবেশ করেনি! এই রীতি আমি পছন্দ করি না।'

'এটা আমার কর্তব্য'– আনতানুন বলল– 'হেরেম থেকে একটি মেয়েও যদি হারিয়ে যায়, তার জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

'ও, তার মানে তুমি তোমার বোনের হেফাজতের জন্য এসেছ'– মেয়েটি মুচকি হেসে বলল।

'আজ তার হেফাজত যদি আমি করতে পারতাম, তাহলে আজ একটি মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারত না, তুমি কে? এখানে কী করছ?'– আনতানুন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল– 'আমি আমার বোনটাকে রক্ষা করতে পারিনি। তাই আপনার রক্ষণাবেক্ষণে আমি পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করছি। সেও দেখতে আপনার-ই মত ছিল। আপনি আমার কর্মতৎপরতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না।'

আনতানুন অন্ধকারে যে তীর ছুঁড়ল, সেটি নিশানায় গিয়ে আঘাত হানল। সে মেয়েটির আবেগের উপর তীর ছুঁড়েছিল। মেয়েটিও যুবতী। সে জিজ্ঞেস না করে পারল না, তুমি তোমার যে বোনকে রক্ষা করতে পারনি, তার কী হয়েছিল? তোমার বোনকে কি কেউ অপহরণ করেছিল?'

'অপহরণকারীরা যদি মুসলমান হত কিংবা যদি নিজে কোন মুসলমানের সঙ্গে পালিয়ে যেত, তাহলে আমার এত দুঃখ হত না'– আনতানুন বলল– 'অন্তরকে এই বলে সান্ত্বনা দিতাম, কেউ না কেউ তাকে বিয়ে করে নেবে নতুবা কোন মুসলিম আমীরের হেরেমে পৌঁছে যাবে। আমার বোনটাকে অপহরণ করেছে খৃস্টানরা। একটি নয়– দু'টি বোন। আমি তাদেরকে রক্ষা করতে পারিনি!'

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল– 'তারা কোথা থেকে কিভাবে অপহৃত হয়েছে?' আনতানুন সেই জেরুজালেমের কাহিনী শোনায় এবং নিজের পালিয়ে বাঁচার ও

এখানে আসার কাহিনী এমন আবেগময় ভঙ্গিতে বিবৃত করে যে, মেয়েটির চেহারা বলছে, সে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে, যেন আনতানুনের ছোঁড়া তীর তার হৃদয়ে গেঁথে গেছে। আনতানুন বলল– 'আমি জেরুজালেম থেকে পায়ে হেঁটে এখানে এই প্রত্যয় নিয়ে এসেছি যে, সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজে যোগ দিয়ে শুধু নিজের বোনদের-ই নয়, ঐ সমস্ত বোনেরও প্রতিশোধ নেব, যাদেরকে খৃস্টানরা অপহরণ করেছে। দুর্গপতি আমাকে তার মোহাফেজ বাহিনীতে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন।'

আনতানুন আরো এমন কিছু আবেগময় কথা বলল, যা মেয়েটির অন্তরে গেঁথে গেছে।

আনতানুন ভালভাবেই জানে, হেরেমের মেয়েদের আবেগ-চেতনা স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। কিন্তু স্বভাব-চরিত্রে তারা দুর্বল। কারণ স্পষ্ট। একজন পুরুষের যদি এক ডজন কিংবা আরো বেশি বউ বা রক্ষিতা থাকে, তাহলে একজনও দাবি করতে পারে না, স্বামী আমাকেই কামনা করে। আর যখন রক্ষিতাগুলোকে বিবাহ ব্যতীত হেরেমে আবদ্ধ করে রাখা হয়, তাহলে তো তারা স্বামীর ভালবাসার কল্পনাও করতে পারে না। যুবতী মেয়েদের আলাদা কিছু আবেগ থাকে। হেরেমের মেয়েরা জানে, বছর কয়েক পর তার কোন মূল্য থাকবে না। আনতানুন জানে, হেরেমের মেয়েরা তাদের স্বপ্ন-সাধ চাপা দিয়ে রাখে এবং স্বামী কিংবা মনিবের কোন যুবক বন্ধু, অন্য কোন যুবক বা কোন সুদর্শন চাকরের সঙ্গে প্রেম-ভালবাসার নেশা পূর্ণ করে।

এই মেয়েটি ঘটনাক্রমে আনতানুনের সম্মুখে এসে পড়ে। তাই সে তার আবেগ নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করে। সফল গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তাকে হেরেমের একটি মেয়ের সঙ্গে খাতির পাতানো আবশ্যকও বটে। প্রশিক্ষণের সময় তাকে জানানো হয়েছে যে, গোমস্তগীনের ন্যায় বিলাসী গভর্নর ও আমীরগণ নাচ-গান ও মদের আসর বসিয়ে থাকে। তাতে হেরেমের মেয়েরাও যোগ দেয়। মদ আর নারীর নেশায় তাদের জবান নিয়ন্ত্রণ হারিয় ফেলে। ফলে এই আসরগুলোতে গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যায়। আনতানুন আলী বিন সুফিয়ানের হাতেগড়া গুপ্তচর। দায়িত্ব পালনের স্বার্থে সুলতান আইউবী তাকে পর্যাপ্ত অর্থ ও নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রেখেছেন।

আনতানুন মেয়েটির উপর এমন প্রভাব সৃষ্টি করে ফেলে যে, তার চেহারা থেকেই তা প্রতিভাত হচ্ছে। তার মনে আশাবাদ জাগতে শুরু করে, মেয়েটি তার জালে আটকা পড়বে। কথোপকথন শেষে সে স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত

হলে মেয়েটি তাকে চাপাকণ্ঠে বলল–

'মহলের পিছনে একটি বাগান আছে। রাতের দ্বিতীয় প্রহরে ওখানে গিয়েও তদারকি করে নিও। ওদিক থেকে কেউ মহলে প্রবেশ করতে পারে।' মেয়েটির ঠোঁটে মুচকি হাসি। মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলেছে সে।

রাতে পাহারা দেয়া বডিগার্ডদের দায়িত্ব নয়। তারা মূল্যবান পোশাক পরিধান করে চকমকে তরবারী কিংবা বর্শা হাতে নিয়ে প্রধান ফটকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। বডিগার্ডদের কর্তব্য মনিবকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তাদের আসল কাজ হল যুদ্ধের ময়দানে মনিবের সঙ্গে থাকা।

আনতানুন রাতের দ্বিতীয় প্রহরে মহলের পিছনের বাগিচায় গিয়ে পায়চারি করতে শুরু করে। মহলের ভিতর থেকে গান-বাজনা ও নাচের শব্দ কানে আসছে। আনতানুন আগত মেহমানদেরকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছে। তাদের দু'-তিনজন খৃস্টান। বেশ কিছুক্ষণ বাগিচায় হাঁটাহাঁটি করার পর পিছন দরজা দিয়ে মেয়েটি বের হয়ে তার নিকট চলে আসে।

'আপনি কেন এসেছেন?' আলতানুন যেন কিছু-ই জানে না।

'তুমি কেন এসেছ?'– মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'আপনার নির্দেশ পালন করার জন্য'– আনতানুন জবাব দেয়– 'আপনি আদেশ করেছিলেন, রাতের দ্বিতীয় প্রহরে বাগিচায় এসে দেখতে, মহলের পিছন দিক থেকে অনুপ্রবেশের কোন সুযোগ আছে কিনা। আচ্ছা, আপনি এত সরগরম আসর ছেড়ে বাইরে আসলেন কেন?'

'ওখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'মদের ঘ্রাণে আমার মাথা ধরে যায়।'

'আপনি মদপান করেন না?'– আনতানুন জিজ্ঞেস করে।

'না'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'এখানকার কোন কিছুতে-ই আমি অভ্যস্ত নই। তুমি বস।' মেয়েটি একটি পাথরের উপর বসতে বসতে বলল।

'আমি একজন রাণীর সমান হওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারি না'– আনতানুন বলল– 'কেউ যদি দেখে ফেলে?'

'যারা দেখবে, তারা মদে মাতাল হয়ে আছে'– মেয়েটি বলল– 'তুমি বস এবং বোনদের কাহিনী শোনাও।'

আনতানুন তার বিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাতে শুরু করে। মেয়েটি তার ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করে। আনতানুনের বোনদের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সে নিজের কথা বলতে

শুরু করে। আনতানুন তার মনের সব গরিমা পানি করে দিয়েছে। এক পর্যায়ে আনতানুন তাকে পরিমাপ করার জন্য বলল– 'এবার আপনার চলে যাওয়া উচিত। দুর্গপতি আপনার সন্ধানে লোক পাঠাতে পারেন। তখন চরম বিপত্তি দেখা দেবে।' মেয়েটি বলল– 'আমার অনুপস্থিতি কেউ টের পাবে না। ওখানে মেয়ের অভাব নেই।'

আনতানুন আগামী রাতে আবার দেখা হবে বলে চলে যায়।

মেয়েটি আনতানুনকে নিজের ব্যাপারে যা বলেছে, তা হল, সে মদ-মাদকতাকে ঘৃণা করে। তাকে যে ভোগের উপকরণ বানানো হয়েছে, তাতেও তার ঘৃণা। সে হাল্‌বের বাসিন্দা। তার পিতার এক বন্ধু তাকে গোমস্তগীনের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং নামমাত্র বিবাহ পড়িয়ে পিতা তাকে বিদায় করে দিয়েছেন।

পরদিন রাতেও দু'জনের সাক্ষাৎ হয়। এবার আগে আসে মেয়েটি। এসে আনতানুনকে না পেয়ে অস্থির হয়ে পড়ে সে। কিছু সময় অপেক্ষা করার পর আনতানুন এসে হাজির হয়। মেয়েটি প্রথমেই বলল– 'যদি তুমি আমাকে একটি রূপসী মেয়ে মনে করে অন্য কোন উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তাহলে ফিরে যাও। তোমার নিকট আমার এরূপ কোন মনোবাসনা নেই।'

'যদি কখনো আমি তোমার নিকট অসৎ মনোবাসনা প্রকাশ করি, তখন তুমি আমার মুখে থু থু নিক্ষেপ করে চলে যেও'– আনতানুন বলল– 'আমি তোমাকে আমার বোনদের-ই ন্যায় পবিত্র মনে করি।'

'না, আমাকে তুমি তোমার বোনদের সঙ্গে তুলনা কর না'– মুখের গাম্ভীর্যকে মুচকি হাসিতে পরিবর্তন করে মেয়েটি বলল– 'কখন কী সিদ্ধান্ত নিয়ে বসি বলা যায় না।'

'তার মানে তুমি আমার সঙ্গে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার মতলব আঁটছ?' আনতানুন বলল।

'এটা নির্ভর করে তোমার উপর'– মেয়েটি বলল– 'চিরজীবন তো আর লুকিয়ে চলা যাবে না। এখানে তুমি আট-দশদিনের জন্য এসেছ। চলে যাওয়ার পর তোমার মুখটা মনে পড়লে আমি বেজায় কষ্ট পাব।'

এক রাতেই তারা একজন অপরজনের হৃদয়রাজ্যে আসন গেড়ে ফেলে। পরদিন মেয়েটি এতই অস্থির ও বেচাইন হয়ে পড়ে যে, আনতানুনকে দিনের বেলায়ই তার কক্ষে ডেকে নিয়ে যায়। সেদিন গোমস্তগীন মহলে ছিলেন না। হাররানের বাইরে অন্য কোথাও গিয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎ তাদের উভয়ের জন্য-ই ছিল বিপজ্জনক। মেয়েটি আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে ভুলে গেছে, এই

মহলে ষড়যন্ত্র চলে এবং হেরেমের মেয়েরা একজন অপরজনকে স্বামী থেকে দূরে সরিয়ে রাখার সুযোগের সন্ধানে থাকে। কিন্তু আনতানুনের ব্যক্তিত্ব ও তার যাদুমাখা বক্তব্য তাকে অন্ধ করে ফেলে। এ হল প্রেম-পিপাসার ফল। আনতানুন তাকে কল্পনা করতেও সুযোগ দেয়নি যে, তার দেহ নিয়ে তার কোন আগ্রহ আছে। মেয়েটির জন্য সে আপাদমস্তক হৃদ্যতার রূপ ধারণ করে। আনতানুন যখন কক্ষ থেকে বের হয়, তখন মেয়েটির মানসিক অবস্থা এই ছিল, যেন এক্ষুণি সে তার সঙ্গে বেরিয়ে যাবে।

দুপুর রাতে তাদের পুনরায় মিলন হওয়ার কথা।

আনতানুন যখন মেয়েটির কক্ষ থেকে বের হয়, তখন অপর একটি মেয়ে তাকে দেখে ফেলে। এই মেয়েটি কক্ষে প্রবেশ করার সময়ও তাকে দেখেছিল।

✿ ✿ ✿

গোমস্তগীন রাতেও ফিরে আসেননি। মেয়েটি নির্দিষ্ট সময়ে বাগানে চলে যায়। আনতানুনও এসে পড়ে। এবার তাদের মাঝে কোন অন্তরায় নেই, না কোন প্রতিবন্ধকতা। খোলামেলা কথা বলছে দু'জন।

'তুমি বলেছিলে, তোমার বোনদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তুমি সুলতান আইউবীর ফৌজে যোগ দিতে এসেছ'– মেয়েটি বলল– 'তাহলে এই বাহিনীতে ভর্তি হলে কেন?'

'এটা কি সুলতান আইউবীর ফৌজ নয়?'– আনতানুন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, যেন সে কিছুই জানে না– 'এটাও তো ইসলামী ফৌজ। সুলতান আইউবী ছাড়া আর কার হতে পারে এ বাহিনী?'

'এ ফৌজ ইসলামী বটে'– মেয়েটি বলল– 'কিন্তু এদেরকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।'

'তাই নাকি?'– আনতানুনের কণ্ঠে বিস্ময়, কপালে ভাজ– 'এতো বড় দুঃসংবাদ! তোমার ধারণা কী? যে ফৌজ সুলতান আইউবীর বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, আমার কি সে বাহিনীতে থাকা ঠিক হবে? তুমি হয়ত জান না, খৃস্টানরা জেরুজালেমসহ যেসব অঞ্চল দখল করে আছে, সেসব অঞ্চলের মুসলমানরা সুলতান আইউবীকে মাহদী বলে বিশ্বাস করে। তাদের সর্বক্ষণ খৃস্টানদের অত্যাচারের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। মসজিদের ইমামগণ বলছেন– 'এ জাতি তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করছে। দামেস্ক থেকে সালাহুদ্দীন আইউবীর রূপ ধারণ করে মাহদী আমাদেরকে মুক্ত করতে আসছেন। তুমি বল, এমতাবস্থায় আমি কী করব?'

'যদি সাহস হয়, আমাকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাও'— মেয়েটি বলল— 'আমি তোমাকে সুলতান আইউবীর বাহিনীর নিকট নিয়ে যাব। এই ফৌজে থাকা তোমার ঠিক হবে না। তবে আমাকে এখানে ফেলে তুমি পালিয়ে যাবে, তা হতে দেব না।'

'তুমি এখান থেকে পালাতে চাও কেন?'— আনতানুন জিজ্ঞেস করে— 'স্বামী তোমাকে দাসীর মত করে রেখেছে, সেজন্য, নাকি স্বামী বৃদ্ধ, সেকারণে? নাকি লোকটি সুলতান আইউবীর বিরোধী, সেজন্য?'

'আমি লোকটাকে ঘৃণা করি'— মেয়েটি জবাব দেয়— 'যে ক'টি কারণে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা তুমি নিজেই বলে ফেলেছ। লোকটা আমাকে দাসীর ন্যায় হেরেমে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাছাড়া সে বৃদ্ধও। সবচে' বড় কারণ, গোমস্তগীন সুলতান আইউবীর দুশমন, খৃস্টানদের দোস্ত। তার হেরেমে আসার আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমি বিয়ে করব না। নুরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট গিয়ে বলব, আপনি আমাকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করুন। আমি খৃস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই। আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর নাম জানতাম। তীরান্দাজী এবং নিশানামত বর্শা নিক্ষেপ করা শিখেছি। কিন্তু দেশদ্রোহী ও ইসলাম বিরোধী এই লোকটার হেরেমে আবদ্ধ করে আমার সেই চেতনাকে মদের পেয়ালায় ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। আশা করি, তুমি বিশ্বাস করবে, এই দুর্গে এসে প্রথমে আমি খুশী হয়েছিলাম যে, আমি এমন একজন বীর যোদ্ধার স্ত্রী হয়ে এসেছি, যিনি খৃস্টানদের বিরুদ্ধে নিজের জীবনকে কোরবান করে দিয়েছেন। কিন্তু নুরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের পরক্ষণেই লোকটা সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।'

'তিনি কি কখনো সুলতান আইউবীর মুখোমুখি হয়েছেন?' আনতানুন জিজ্ঞেস করে।

'হননি— মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন'— মেয়েটি জবাব দেয়— 'লোকটা গভীর পানির মাছ। খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ও তার দরবারী আমীরগণ তার বন্ধু। তারা সবাই সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। গোমস্তগীন তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন যে, তিনি তাদেরকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন। তিনি চাচ্ছেন, খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে স্বাধীনভাবে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। যুদ্ধ করে বিপুল এলাকা দখল করে নিতে পারবেন বলে তিনি আশাবাদী। তা-ই যদি হয়, তাহলে তিনি হাররান এবং অন্যান্য বিজিত এলাকার সম্রাট হয়ে যাবেন।'

'তুমি কি কখনো তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছ?'

'বলেছি'– মেয়েটা জবাব দেয়– 'তিনি আমাকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন। আমি সুলতানকে আমার পীর বলে মান্য করি। গোমস্তগীনের বক্তব্য আমার মধ্যে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। ফলে তারপর থেকেই তিনি আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেন। তিনি আমাকে মারধরও করতেন। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন– 'তুমি সুলতান আইউবীর এলাকায় চলে যাও। তুমি যুবতী মেয়ে, রূপসীও। আইউবীর তিন-চারজন সালারকে তোমার রূপের ফাঁদে ফেলে তার বিপক্ষে দাঁড় করাও।' তিনি আরো বললেন– 'আমি তোমার সঙ্গে আরো দু'টি বিচক্ষণ ও সুন্দরী মেয়ে দেব। তারা হবে খৃস্টান। চেষ্টা করলে তিনজন মিলে পাহাড়কেও অনুগত বানিয়ে ফেলতে পারবে। তিনি আমাকে কৌশল শিখিয়ে দিয়ে বললেন– 'যাও, তুমি গিয়ে গোয়েন্দাগিরি কর। যদি সাফল্য দেখাতে পার, তাহলে তোমার পরিবারকে আমি বিপুল সোনা-দানা দান করব। তারা তোমাকে এখন মুক্ত করে নিয়ে সম্ভ্রান্ত কোন পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিবে। কিন্তু আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি।'

'কেন, তুমি প্রস্তাবটা মেনে নিতে!' আনতানুন বলল– 'এখান থেকে বেরিয়ে তুমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট চলে যেতে!'

'ঐ শয়তানটা আর তার খৃস্টান বন্ধুরা'– মেয়েটি বলল– 'এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে যে, কোন মেয়ে কিংবা পুরুষ গুপ্তচর যদি তাদের শত্রুর এলাকায় গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে তাকে হয়ত অপহরণ করে নিয়ে আসে নতুবা ওখানেই খুন করে ফেলে। হাসান ইবনে সাব্বাহর ঘাতক দলের সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক আছে। আমার আত্মা মরে গিয়েছিল। রয়ে গিয়েছিল শুধু দেহটা। একবার ভেবেছিলাম, তুমি যা বলেছ, সে ভাবেই মরব। কিন্তু সাহস হয়নি। অবশেষে আমি তোমাকে দেখলাম। তুমি আমার ঘনিষ্ঠ হয়েছ। এখন আমার আত্মা পুনরায় জীবন লাভ করল। তোমার অনুগ্রহ আমি জীবনেও ভুলব না যে, তুমি আমাকে তোমার হৃদয়ে স্থান দিয়েছ। কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট নয়। আস, আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই।'

'তুমি এখানেই– এই দুর্গেই খৃস্টান ও সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পার।'

'তা কিভাবে?'

'তোমার মনিব গোমস্তগীন যেমন তোমাকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এলাকায় পাঠাতে চান, তদ্রূপ সুলতান আইউবীরও গুপ্তচর প্রয়োজন, যারা

এখানে অবস্থান করে তাঁকে এদের পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করবে।'

'তুমি কিভাবে জানলে যে, সুলতান আইউবীর গুপ্তচর প্রয়োজন?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'আমি স্বয়ং সুলতান আইউবীর প্রেরিত গোয়েন্দা।' আনতানুন বলল। শুনে মেয়েটি এমনভাবে চমকে উঠে, যেন কেউ তার বুকে খঞ্জরের আঘাত হেনেছে।

'কী , অবাক্ হলে? মিথ্যা বলিনি। আমি জেরুজালেম থেকে নয়– কায়রো থেকে এসেছি। আমার কোন বোনও অপহরণ হয়নি।'

'তাহলে তো যেখানে তুমি এতগুলো মিথ্যা বলেছ, সেখানে তোমার এই দাবিও মিথ্যা যে, তুমি আমাকে ভালবাসা দিয়েছ!'– মেয়েটি বলল– 'তোমার প্রেম, তোমার প্রতিশ্রুতি সবই মিথ্যা!'

'আমি যে তোমাকে ভালবাসি, তার প্রমাণ হল, আমি আমার গোপনীয়তা তোমাকে ফাঁস করে দিয়েছি'– আনতানুন বলল– 'এক কথায় বলতে পার, আমি আমার জীবনটা তোমার দু'হাতে অর্পণ করেছি। এখন তুমি গোমস্তগীনকে আমার আসল পরিচয় বলে দিয়ে আমাকে খুন করাতে পার। কোন গুপ্তচর তার আসল পরিচয় ফাঁস করে না। কিন্তু তোমার আবেগ ও ভালবাসা আমাকে বাধ্য করেছে তোমাকে আমার আসল পরিচয়টা বলে দিতে। আমি তোমার প্রতি আমার ভালবাসার দ্বিতীয় প্রমাণ তখন দেব, যখন আমি এখানকার কর্তব্য সম্পাদন করে ফিরে যাব। আমি একা যাব না– তোমাকে নিয়ে যাব। তবে একটি কথা স্পষ্ট শুনে রাখ, যদি কখনো তোমার ভালবাসা আর আমার কর্তব্যের মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হয়– অর্থাৎ যদি আমি এমন পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়ি যে, হয়ত তোমাকে বরণ করে নেব, নতুবা দায়িত্ব পালন করব, তাহলে আমি দায়িত্বকেই প্রাধান্য দেব। তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করব না– তোমার ভালবাসাকে কোরবান করে দেব। তুমি হয়ত জান না, একজন গুপ্তচরের কর্তব্য তার নিকট থেকে কিরূপ কোরবানী দাবি করে। একজন সৈনিক যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করে জীবন দেয়। বন্ধুরা তার লাশটাকে পরিজনের নিকট পৌঁছিয়ে দেয় এবং সম্মানের সাথে দাফন করে। কিন্তু গোয়েন্দা নিহত হয় না– বন্দী হয়। দুশমন তাকে কয়েদখানায় নিয়ে এমন সব নির্যাতন করে, যা শুনলে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে। গুপ্তচর মরেও না, বাঁচেও না। গুপ্তচরের জন্য লোহার ন্যায় শক্ত ঈমান আবশ্যক। আমি তেমনই ঈমান নিয়ে এসেছি। আমি তোমার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করেছি বটে; কিন্তু আমি লোহার ন্যায় শক্ত থাকব, ঈমান থেকে একবিন্দু নড়তে পারব না।'

মেয়েটি আনতানুনের ডান হাতটা নিজের দু'হাতে চেপে ধরে টেনে নিয়ে চুমো খায়। তারপর আবেগজড়িত কণ্ঠে বলল– 'তুমি আমাকেও তদ্রূপ শক্ত পাবে। বল, আমি কী করব?'

আনতানুন মেয়েটিকে সবক দিতে শুরু করে– 'তুমি গান-বাদ্য ও মদের প্রতিটি আসরে উপস্থিত থাকবে। খৃস্টানদের ঘনিষ্ট হয়ে তাদের কথা-বার্তা শুনবে। প্রয়োজন হলে দু'-এক চুমুক পানও করবে। তাদের সামনে সুলতান আইউবীকে মন্দ বলবে। এভাবে এই সালারদের মনের কথা বের করে আনবে যে, তাদের সামরিক পরিকল্পনা কী। খৃস্টানদের কথা-বার্তা মনোযোগ সহকারে শুনবে।'

আনতানুন তাকে হিন্দুস্তান থেকে আসা দু'সালার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

'শামসুদ্দীন আলী ও শাদবখত আলীকে আমি ভালভাবেই চিনি'– মেয়েটি বলল– 'গোমস্তগীন তাদের ছাড়া এক পাও হাঁটতে পারেন না। তারা প্রায়ই এখানে আসেন এবং রং-তামাশায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তারা মদপান করেন না।'

'তুমি তাদের ঘনিষ্ট হয়ে যাও'– আনতানুন বলল– 'কথা প্রসঙ্গে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, আলরিস্তানে বরফ গলছে কি? তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি আলরিস্তান যাচ্ছ নাকি? তুমি মুচকি হেসে বলবে, ইচ্ছা আছে।। তারপর তারা তোমাকে আরো কিছু কথা জিজ্ঞাসা করবে। সম্ভবত জিজ্ঞাসা করবে, ওদিক থেকে কে এসেছে? তুমি বলবে, তিনি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।'

'আমি কিছুই বুঝলাম না'– মেয়েটি বলল।

'সবই বুঝবে'– আনতানুন বলল– 'আমি তোমাকে কখনো এসব ঝামেলায় ফেলতাম না সাদিয়া! কিন্তু কর্তব্যের দাবি, প্রিয়তম বস্তুটিকেও কর্তব্যের পথে কোরবান করে দেই। তুমি আমাকে কোরবানী করে দাও, আমি তোমাকে কোরবান করে দেব। ভয় পেও না সাদিয়া! জানা নেই, ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য কিরূপ বিপদ ও কিরূপ পরীক্ষা নিয়ে আসছে। আমরা দু'জন যদি বন্দীশালার জাহান্নামে চলে যাই, কিংবা যদি নিহত হই, তবু আমাদের রক্ত বৃথা যাবে না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ভুলবেন না। মনে রেখ, রক্ত ছাড়া ইসলামকে হেফাজত করা যায় না।'

'তুমি আমাকে দৃঢ়পদ পাবে'– সাদিয়া বলল– 'তুমি আমার সেই চেতনাটাও জীবিত করে দিয়েছ, যার ব্যাপারে আমি মনে করতাম, সে মরে গেছে।'

✿ ✿ ✿

আনতানুন ফিরে যায়। সাদিয়া তার প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

আনতানুন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে সাদিয়া অনুভব করল, এখানে সে একা নয়– তার পার্শ্বে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সাদিয়া। হেরেমের-ই একটি মেয়ে দন্ডায়মান। সাদিয়ার-ই ন্যায় রূপসী যুবতী সে। মেয়েটি বলল– 'সাদিয়া! তুমি কি এই ভালবাসার পরিণতি চিন্তা করে দেখেছ? তুমি স্বাধীন নও। আমার আবেগ-চেতনাও তোমারই ন্যায়। আমিও খাঁচা ভেঙ্গে উড়ে যেতে চাই। কিন্তু এটা সম্ভব নয়। আমাদের ভাগ্যে যা লেখা ছিল, আমরা পেয়ে গেছি। আমাদের মনের বাসনাকে অবদমিত করে চলতে হবে। আর চিত্তবিনোদনের একটা উপায় যদি বের করতেই হয়, তাহলে লোক অনেক আছে। একজন রক্ষীসেনাকে তুমি এত বড় মর্যাদা দিও না।'

'কোন্ রক্ষীসেনার কথা বলছ?'– সাদিয়া মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কী বলছ?'

'দেখ, আমি তোমাদের কথোপকথন পুরোটাই শুনেছি'– মেয়েটি বলল– 'আমার থেকে কিছুই লুকাবার চেষ্টা কর না। তার সঙ্গে তুমি যে সওদা করেছ, তার মূল্য অনেক।'

মেয়েটি চলে যায়। সাদিয়া চিন্তিত মনে ওখানেই অন্ধকারে পায়চারি করতে থাকে।

সাদিয়ার মনে পড়ে যায়, আনতানুন তাকে বলে গেছে, আজ থেকেই কাজ শুরু করে দাও। তার একথাটিও মনে পড়ে যায় যে, সে আনতানুনকে বলেছিল, তুমি আমাকে দৃঢ়পদ পাবে। কিন্তু সাদিয়া একটি অনভিজ্ঞ মেয়ে। তার জানা নেই যে, পাপের এই রহস্যময় ভূবনে সে কত বড় ঝুঁকি মাথায় তুলে নিয়েছে।

দু'-তিনদিন পর সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখত-এর সঙ্গে সাদিয়ার সাক্ষাৎ ঘটে। গোমস্তগীন নাচ-মদের আসরে দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করছেন। সালার, খৃস্টান উপদেষ্টামন্ডলী ও উর্ধ্বতন অফিসারদেরকে হাতে রাখার জন্য গোমস্তাগীন এই আসরের আয়োজন করে থাকেন। এই দু'-তিন দিনের সাক্ষাতে আনতানুন সাদিয়াকে প্রশিক্ষিত করে তুলেছে। বিনোদনের এই আয়োজনটা তাকে করতে হয়।

আজকের আসরে সাদিয়া বেজায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। গোমস্তগীন যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত যে, মেয়েটার মধ্যে পরিবর্তন এসে গেছে। সাদিয়া আসরের বাইরে হাসিমুখে একজনের সঙ্গে কথা বলছে। পরক্ষণে সালার শামসুদ্দীনের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং এ-কথা ও-কথা বলার পর জিজ্ঞেস করে– 'আলরিস্তানে বরফ গলছে কি?'

সালার শামসুদ্দীন চমকে ওঠেন। গোমস্তগীনের ন্যায় অতিশয় বিচক্ষণ ও

কঠিনপ্রাণ দুর্গপতির হেরেমের কোন মেয়ের মুখ থেকে এমন কথা বের হতে পারে, শামসুদ্দীনের ধারণা ছিল না। কেননা, বাক্যটা সুলতান আইউবীর গুপ্তচরদের সাংকেতিক বাক্য। এই কোড বাক্য দ্বারা তারা পরস্পর পরিচয় লাভ করে থাকে। গোয়েন্দা ছাড়া অন্য কারো এই বাক্যটি জানা থাকার কথা নয়। শামসুদ্দীনের এও জানা আছে যে, এই দুর্গে কোন গোয়েন্দা বন্দী নেই, যে এই গোপন সংকেত বলে দিতে পারে। তিনি সংকেতের পরবর্তী বাক্য উচ্চারণ করলেন– 'তুমি আলরিস্তান যাচ্ছ নাকি?'

সাদিয়া মুচকি হেসে বলল– 'ইচ্ছা তো এমনই।'

শামসুদ্দীন কথা বলতে বলতে সাদিয়াকে নির্জনে নিয়ে যায়। অন্য সবাই মদ-নারীতে ডুবে আছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন– 'তুমি কি জান, আমি সালার?'

'আমি আরো কিছু জানি'– সাদিয়ার হাসিতে তিরস্কার নয়– ঘনিষ্ঠতার ভাব।

'কে এসেছে?'– শামসুদ্দীন অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কি জান, আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে তোমায় কী সাজা হবে?'

'প্রতারণা নয়'– সাদিয়া জবাব দেয়– 'আপনি হাঁটতে হাঁটতে প্রধান ফটকের নিকট চলে যান। সেখানে দু'জন রক্ষীসেনা দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করবেন, জেরুজালেম থেকে কে এসেছে?'

শামসুদ্দীন ফটকের নিকট চলে যান। ওখানে দু'জন মোহাফেজ দাঁড়িয়ে আছে। শামসুদ্দীন তাদেরকে চিনেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন– 'জেরুজালেম থেকে তোমাদের কে এসেছে?' আনতানুন সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমি। শামসুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন– 'তুমি যদি আলরিস্তান থেকে এসে থাক, তাহলে ওখানে বরফ গলছে।'

'আপনি আলরিস্তান যাচ্ছেন নাকি?' আনতানুন জিজ্ঞেস করে।

'ইচ্ছা তো এমনই।' শামসুদ্দীন মুচকি হেসে জবাব দেন।

শামসুদ্দীন নিশ্চিত হন যে, আনতানুন সত্যিই আইউবীর গোয়েন্দা। তিনি জিজ্ঞেস করেন– 'মেয়েটি ধোঁকা দিচ্ছে না তো?'

'না'– আনতানুন জবাব দেয়– 'সাক্ষাতের সুযোগ করে দিন, সব কথা খুলে বলব।'

✿ ✿ ✿

সাক্ষাতের সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়া হল। শামসুদ্দীন একজন সেনা অধিনায়ক। সুযোগ সৃষ্টি করা তার পক্ষে কোন ব্যাপার নয়। তিনি আনতানুনকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি সাদিয়াকে কিভাবে ফাঁদে ফেলেছ এবং তাকে কিভাবে বা

বিশ্বাস করে আমাদের সাংকেতিক বাক্য বলে দিলে? আনতানুন তাকে ঘটনাটা ইতিবৃত্ত শোনায় যে, মেয়েটির সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ কিভাবে হয় এবং তার সঙ্গে কি কি কথা হয়।

'আমি একটি আশংকা অনুভব করছি'– শামসুদ্দীন বললেন– 'তুমি যুবক। সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান। মেয়েটিও যুবতী এবং অতিশয় সুন্দরী। আমি কর্তব্যের উপর আবেগের জয়ী হওয়ার লক্ষণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আবেগের বশবর্তী হয়ে দিনের বেলা এভাবে তার কক্ষে যাওয়া তোমার ঠিক হয়নি। তুমি সাবধানতা অবলম্বন করনি। মেয়েটির মনে ভালবাসা ও ঘনিষ্ঠতার পিপাসা আছে। তুমি তাকে ভালবাসাও দিয়েছ, ঘনিষ্ঠতাও দিয়েছ। এরূপ মেয়েদের আবেগ স্পর্শকাতর ও বিপজ্জনক হয়ে থাকে। আমার ভয় হচ্ছে, তুমি তোমার কর্তব্যকে আবেগের আতিশয্যে ধ্বংস করে দেবে। আমি তোমার ঈমানের পরীক্ষা নিতে চাই।'

'আমি আমার উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষে তাকে আসক্ত বানিয়েছি'– আনতানুন বলল– 'তবে আমি মিথ্যা বলব না। এই মেয়েটি আমার মন জয় করে নিয়েছে। আমি আপনাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শপথ করে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এই ভালবাসা আমার কর্তব্যের উপর জয়ী হতে পারবে না।'

তারপর শামসুদ্দীন ও আনতানুনের মাঝে কিছু কাজের কথা হয়। সালার শামসুদ্দীন গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ দিয়ে আনতানুনকে বিদায় করে দেন।

সেদিনই শামসুদ্দীন তার ভাই শাদবখতকে জানালেন, সুলতান আইউবী এখানে একজন লোক পাঠিয়েছেন। তার নাম আনতানুন। সে এই মহলের-ই মোহাফেজ দলে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়েছে।

শামসুদ্দীন ও শাদবখতের ব্যক্তিগত দুই রক্ষীসেনা, তাদের আরদালী এবং দু'জন চাকরও সুলতান আইউবীর যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা। সালারদ্বয় তাদেরকে জানায়, তোমাদের আরো একজন সঙ্গী এখানে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু লোকটা নিজেই নিজেকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। দুর্গপতির ব্যক্তিগত বাসভবনের একটি 'মৎস' শিকার করে নেয়া তার বিরাট সাফল্য। কিন্তু সে বিপদমুক্ত নয়। শামসুদ্দীন তার সঙ্গীদেরকে বিষয়টা বিস্তারিত বুঝিয়ে দিয়ে বললেন– 'এখন পর্যন্ত হাররানে আমাদের কোন গোয়েন্দা ধরা পড়েনি। আমার ভয় হচ্ছে, আনতানুন ধরা পড়ে যাবে। তার প্রতি আমাদের নজর রাখতে হবে। আর আমাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে। লোকটা যদি ধরা পড়ে যায়, তাহলে আমাদের জন্য অপমান। তাছাড়া নির্যাতনে বাধ্য হয়ে সে

আমাদের সকলের নামও বলে দিতে পারে। আমি বেশি চিন্তা করি সুলতান আইউবীর কথা। তিনি বলবেন, দু'জন সালার আর ছয়জন যোদ্ধা গোয়েন্দা একটা লোককে রক্ষা করতে পারলে না!'

'আপনারা এবং আমরা থাকতে আরেকজন লোক পাঠাবার কী প্রয়োজন ছিল?' এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে।

'প্রয়োজন তা-ই ছিল, যা সে পূরণ করেছে'– শামসুদ্দীন জবাব দেয়– 'আমাদের গোমস্তগীনের হেরেম পর্যন্ত পৌঁছানো প্রয়োজন ছিল। যা হোক, এসব বাদ দাও। আমি জানি, এটা হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর সিদ্ধান্ত, যা সম্পূর্ণ সঠিক। আমি তোমাদেরকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম। তোমরা প্রস্তুত থাকবে। মেয়েটিকে অপহরণ করে আমাদের উধাও হওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে। তোমরা তার জন্য প্রস্তুত থাকবে।'

'আমরা প্রস্তুত'– সবাই বলল– 'প্রয়োজন শুধু সময়মত সংবাদ পাওয়া।'

'না, সময়মত সংবাদ পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে'– শামসুদ্দীন বললেন– 'এমনও হতে পারে, আমিও তখন টের পাব, যখন আনতানুন পিঞ্জিরায় আবদ্ধ থাকবে এবং তার হাড়-গোড় চুরমার হতে থাকবে।'

'কারো থেকে সাহায্য না নিয়ে আমাদের লড়াইটা আমরা স্বাধীনভাবে লড়তে চাই। তোমরা কী বল?'– গোমস্তগীন সালার শাসসুদ্দীন ও শাদবখতকে জিজ্ঞেস করেন– 'তোমরা তো জান, আমরা যারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি, সংখ্যায় নগন্য। আমরা বাহ্যত যদিও ঐক্যবদ্ধ; কিন্তু মূলত একজনের মন এক দিকে। খলীফা আল-মালিকুস সালিহ বাচ্চা মানুষ। তিনি কতিপয় আমীরের কথায় উঠাবসা করছেন। তারা সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করো তাকে ছুঁড়ে ফেলতে এবং নিজেরা স্বাধীন শাসকে পরিণত চাচ্ছে। মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীন আমার বন্ধু এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর শত্রু। কিন্তু তিনি একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের স্বাধীন শাসক হতে চান। আপনারা তো জানেন, আমি হাররানের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বিপুলসংখ্যক সৈন্য রিক্রুট করেছি। আমি খৃস্টান সম্রাট রেজিনাল্ট এবং তার সকল যুদ্ধবন্দীকে এই শর্তে মুক্তি দিয়েছিলাম যে, আমি যখন সালাহুদ্দীন আইউবীর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হব, তখন তারা সরাসরি আমার সহযোগিতা না করলেও পিছন কিংবা পার্শ্ব থেকে সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর হামলা করবে অথবা তাকে আক্রমণের ধোঁকা দিয়ে তার দৃষ্টি আমার থেকে অন্যদিকে সরিয়ে দেবে। আমি আশা করছি,

আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করতে পারব। তিনি খৃস্টানদেরকে পিছনে হটিয়ে দিতে পারেন। কেননা, খৃস্টানরা তার রণকৌশল জানে না। আমরা তো বুঝি। আমরাও মুসলমান। তার বাহিনী যদি প্রাণপণ লড়তে পারে, তো আমরাও তদপেক্ষা বেশি বীরত্বের প্রমাণ দিতে পারব। আইউবী প্রথমবার যখন হাল্‌ব আক্রমণ করেছিলেন, তখন হাল্‌বের মানুষ তাকে চরম শিক্ষা দিয়েছিল। তা থেকেই আমার সাহস বেড়ে গেছে।

সালার শাসসুদ্দীন ও শাদবখত গোমস্তগীনকে একথা বললেন না যে, মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের লড়াই না করা উচিত আর খৃস্টানরা মূলত আমাদের দুশমন। তারা আমাদেরকে সাহায্য করার কথা বলে বলে প্রতারণা করবে–সাহায্য দেবে না। তারা একথাও স্মরণ করিয়ে দিল না যে, আল-মালিকুস সালিহ খৃস্টান সম্রাট রেমন্ডকে সোনা-দানা দিয়ে চুক্তি করেছিল, সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে রেমন্ড আইউবীর উপর পিছন দিক থেকে হামলা করবেন। সুলতান যখন হাল্‌ব অবরোধ করেন, তখন রেমন্ড বাহিনী এসে পড়ে। কিন্তু সুলতান আইউবীর কমান্ডো বাহিনী তাকে প্রতিহত করে এবং তিনি যুদ্ধ না করেই ফিরে যান।

শাসসুদ্দীন ও শাদবখত কোন প্রসঙ্গেই গোমস্তগীনের সঙ্গে দ্বিমত করলেন না। বরং তাকে সমর্থন জানালেন এবং পরামর্শ দিলেন যে, এ সময়ে সুলতান আইউবী আলরিস্তানের পাহাড়ী এলাকায় বসে আছেন। এই পর্বতমালায় 'হামাতের শিং' নামক যে উপত্যকা আছে, তাকে যুদ্ধক্ষেত্র বানানো গেলে আইউবীকে পরাজিত করা যেতে পারে। তারা পরামর্শ দেয়, হ্যাঁ, আমরা স্বাধীনভাবেই লড়াই করব; কিন্তু খৃস্টানদের থেকে সাহায্যও গ্রহণ করব।

'আমি সংবাদ পাচ্ছি, আমার এখানে নাকি সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর আছে এবং তারা আমাদের প্রতিটি সংবাদ তাকে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে'– গোমস্তগীন বললেন– 'আপনারা সতর্ক থাকুন, চারদিক কান রাখুন এবং তদন্ত করুন।'

'সে কথা আপনার বলতে হবে না'– শাদবখত বললেন– 'সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক কত শক্ত ও বিস্তৃত, আমাদের জানা আছে। এখানে আমরাও আমাদের গোয়েন্দা ছড়িয়ে রেখেছি। কোন সন্দেহ দেখা দিলেই তারা আমাদেরকে অবহিত করবে।'

'এ ক্ষেত্রে আমি বড় কঠিন মানুষ'– গোমস্তগীন বললেন– 'যদি আমার পুত্রের ব্যাপারেও সন্দেহ জাগে যে, সে শত্রুর হয়ে গোয়েন্দাগিরি করছে, তাহলে তাকেও আমি পিঞ্জিরায় বন্দি করব- এক বিন্দু দয়া করব না।'

গোমস্তগীন যে দু'সালারের সঙ্গে এত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন, তারা যে সুলতান আইউবীর গুপ্তচর, তা তার কল্পনায়ও নেই। এরা দু'জন অত্যন্ত বিপজ্জনক গোয়েন্দা। অথচ, এরা গোমস্তগীনের সেনা অধিনায়ক। গোমস্তগীনের বাহিনীর কমান্ড তাদের হাতে।

গোমস্তগীন থেকে আলাদা হয়ে শামসুদ্দীন ও শাদবখত পরিকল্পনা ঠিক করেন, তারা যখন ফৌজ নিয়ে সুলতান আইউবীর মোকাবেলায় যাবেন, তখন তারা তাদের অগ্রযাত্রা সম্পর্কে আগেই সুলতানকে জানিয়ে দিবেন। আইউবী উপযুক্ত স্থানে তাদেরকে ঘিরে ফেলবেন এবং তারা আত্মসমর্পন করবে।

দু'ভাই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পরিকল্পনা করতে থাকেন এবং খুটিনাটি প্রতিটি দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করেন। গোমস্তগীন কোন্‌দিন আক্রমণ চালাবেন, তা এখনো তারা জানেন না। তাকে দ্রুত হামলা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

❁ ❁ ❁

গোমস্তগীনের বাসভবন প্রহরার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে আনতানুনের। এখন আর এখানে নেই সে। সাদিয়া তাকে কিছু কাজের কথা বলেছিল। এখন সাদিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা দুরুহ হয়ে পড়েছে তার। অথচ, মেয়েটির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রতি মুহূর্ত অস্থিরতার মধ্যে কাটাচ্ছে সে। তার কারণ দু'টি। প্রথমত, কর্তব্য পালন। দ্বিতীয়ত, হৃদয়ের টান।

মহলের এক চাকরানীকে হাত করে নিয়েছে সাদিয়া। একদিন তার মাধ্যমে সে আনতানুনকে সংবাদ পাঠায়, যেন আজ রাতে সে ঠিক আগের সময় উক্ত বাগানে চলে আসে। প্রধান ফটক অতিক্রম করে বাগানে প্রবেশ করা অসম্ভব। বাগানের পিছনে একটি উঁচু দেয়াল আছে। সাদিয়া আলতানুনকে বলে পাঠায়, দেয়ালের বাইরে একটি রশি ঝুলান থাকবে। সেই রশি বেয়ে ভিতরে ঢুকে পড়বে।

সে রাতে মহলে নিমন্ত্রণের আয়োজন ছিল। যুদ্ধে সহযোগিতা করতে পারে এজাতীয় বহু লোককে গোমস্তগীন দাওয়াত করেছেন। তাদের মধ্যে আছে বেশ ক'জন খৃস্টান কমান্ডার। মসুল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কয়েকজন মুসলিম সেনা অফিসারও এসেছেন। গোমস্তগীন এমন ক'জন বেসামরিক লোককেও দাওয়াত করেছেন, যাদের কাছে বিপুল অর্থ আছে। এই মেহমানদের থেকে যুদ্ধের জন্য সহযোগিতা নিতে চাইছেন গোমস্তগীন। সালার শামসুদ্দীন এবং শাদবখতও ভোজসভায় উপস্থিত। আছেন গোমস্তগীনের কাজী ইবনুল খাশিব আবুল ফজলও।

আসরটাকে পুরোপরি কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে সাদিয়া। এজাতীয়

আসর-সভায় তার গুরুত্ব অপরিসীম। সে তার ইচ্ছার বিপরীতে এমনভাবে সাজগোজ করে, যা উপস্থিত মেহমানদেরকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করছে। এমনিতেই মেয়েটির রূপ-যৌবনের স্বতন্ত্র এক আকর্ষণ আছে। তার উপর এত সাজসজ্জা! নারীলোলুপ পুরুষদেরকে পাগল করে তুলছে সাদিয়া। মেয়েটি এখান থেকে সেখানে হরিণীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেক মেহমানের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছে। এরই মধ্য দিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করে চলছে সে। কোন খৃস্টান কিংবা মুসলিম সেনা অফিসারকে কথা বলতে দেখলেই তার পার্শ্বে গিয়ে কান পেতে এমনভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে, তারা কিছুই বুঝতে পারছে না। সাদিয়া শামসুদ্দীন এবং শাদবখতের নিকটও গিয়ে দাঁড়ায় এবং একইভাবে হাসিমুখে কথা বলে। তারা সাদিয়াকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেন, কোন গোপন তথ্য পেয়ে গেলে আমাদেরকে জানাবে। আনতানুনের সঙ্গে বেশী দেখা-সাক্ষাৎ করবে না। কিন্তু আজ রাতই যে আনতানুনের সঙ্গে বাগানে তার সাক্ষাৎ হওয়ার কথা এবং সে মিলনটা একটু পরই ঘটতে যাচ্ছে, সে কথা গোপন রাখে সাদিয়া।

এখন গভীর রাত। ঘোর অন্ধকার। সাদিয়া চাকরানীকে দিয়ে দেয়ালের রশিটা বেঁধে রাখে। দেয়ালের ভিতর দিকে একটি গাছ আছে। আনতানুন বাহির থেকে রশি বেয়ে উপরে উঠে আবার সেই রশির অপর মাথা বেয়ে দেয়ালের ভিতর নীচে নেমে গাছটার আড়ালে লুকিয়ে থাকবে।

এই আসরে বাহির থেকে অনেক উন্নত নর্তকী আনা হয়েছে। আমদানী করা হয়েছে অল্প বয়স্ক ক'টি সুশ্রী বালককে। তারা অর্ধ উলঙ্গ হয়ে বিশেষ ধরনের নাচ নাচছে। হেরেমের সব ক'টি মেয়ের প্রতি গোমস্তগীনের নির্দেশ, যে কোন মূল্যে হোক, সব ক'জন মেহমানকে পুরোপুরি আয়ত্বে নিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। তাদেরকে এই আসরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। মদের মটকার মুখ খুলে দেয়া হয়েছে। সাদিয়াও স্বাধীনভাবে যে কারো সঙ্গে মিশছে ও হাসিমুখে কথা বলছে।

আসরের রওনক ও আনন্দ-ফূর্তির মাত্রা বেড়ে চলছে। পাশাপাশি সাদিয়ার অস্থিরতাও বাড়ছে। কারণ, আনতানুনের এসে পড়ার সময় হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে সে একজন খৃস্টান কমান্ডারের সঙ্গে আলাপে মত্ত। এই খৃস্টান লোকটা অনর্গল আরবী বলতে পারে। সাদিয়া সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে কথা বলছে, যাতে তার মনের কথা বের করা যায়। হয়েছেও তা-ই। তারা সুলতান আইউবীকে কিভাবে খতম করবে, তার বিবরণ দেয় সাদিয়াকে। এই সুযোগে

সে সাদিয়ার ঘনিষ্ঠতা লাভ করার চেষ্টা করে। সাদিয়া তাতে বাঁধা দেয়নি। মূল্যবান তথ্য হাসিল করছে সে। খৃস্টান লোকটা কথা বলতে বলতে আসর থেকে উঠে তাকে আড়ালে নিয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে সে সাদিয়াকে নিয়ে বাগানে চলে যায়। বাগানটা অন্ধকার। সেখানে গিয়ে সাদিয়া অনুভব করে, আনতানুন এসে পড়েছে। সাদিয়া লোকটাকে বলল, চলুন ফিরে যাই। কিন্তু সে এখনই যেতে চাচ্ছে না।

খৃস্টান লোকটা সাদিয়ার বাহু জড়িয়ে ধরে টেনে ঘাসের উপর বসিয়ে দেয় এবং তার রূপের প্রশংসা করতে শুরু করে। সাদিয়া তাকে ঠেকাবার চেষ্টা করে। লোকটা নেশাগ্রস্ত। সে সাদিয়ার সঙ্গে যথেচ্ছ আচরণ করার চেষ্টা করলে সাদিয়া হাসিমুখে বলল– 'জান, আমি কার?'

'তার অনুমতি নিয়েই আমি এই দুঃসাহস দেখাচ্ছি'– খৃস্টান বলল এবং সাদিয়াকে টেনে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলল– 'তুমি যাকে তোমার স্বামী বলছ, সে তোমার স্বামী নয়, এই সত্যটা তুমিও জান। সে সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করে নিজে রাজা হওয়ার মানসে তার কথিত সবগুলো স্ত্রীকে এ রাতের জন্য আমাদেরকে হালাল করে দিয়েছে।'

'লোকটার কোন আত্মমর্যাদাবোধ নেই।' সাদিয়া মনের ক্ষোভ দমন করে মুখের হাসি বহাল রেখে মনে মনে বলল। তার জানা আছে, এই খৃস্টান লোকটা যা বলছে, সবই সঠিক।

'যে লোক নিজের ঈমান বিক্রি করতে পারে, সে নিজের স্ত্রী-বোন এবং কন্যার ইজ্জতও নীলাম করতে পারে। তুমি একটা বোকা মেয়ে। ফূর্তি করতে আপত্তি করছ কেন? আবার কিনা বলছ, মদপান কর না!'

দু'টি বিষয় সাদিয়াকে ভাবিয়ে তুলছে। এক. আনতানুন এসে পড়েছে। দুই. এই খৃস্টানটার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। গোমস্তগীন যদি মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হতেন, তাহলে সাদিয়া তার নিকট ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিত এবং বলত, অমুক আমার প্রতি হাত বাড়িয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা তার উল্টো। যে কোন মূল্যে মেহমানদের সন্তুষ্ট করা গোমস্তগীনের হেরেমের মেয়েদের কর্তব্য। কোন মেহমানকে– বিশেষত, কোন খৃস্টান কমান্ডারকে অখুশী করা গোমস্তগীনের নির্দেশ অমান্য করার নামান্তর। লোকটা তার স্ত্রীদের ইজ্জতের বিনিময়ে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করছে। এমতাবস্থায় সাদিয়া খৃস্টান লোকটার মুখে থু থু ছিটাতেও পারছে না, তাকে ত্যাগ করে পালাতেও পারছে না। কিন্তু এসব বাধ্য-বাধকতা সত্ত্বেও সাদিয়া তার সম্ভ্রম বিকাতে পারে না। কি

করবে, সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে সাদিয়ার পক্ষে।

আনতানুনের বিষয়টা প্রচন্ডভাবে ভাবিয়ে তুলছে সাদিয়াকে। চরম আকার ধারণ করেছে সাদিয়ার অস্থিরতা। তার এই মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেই লোকটা তার সঙ্গে অসদাচরণ শুরু করে দেয়। সাদিয়া লাফিয়ে ওঠে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় তার। মেয়েটা ঘাসের উপর বসা ছিল। সে খৃস্টানটাকে সজোরে ধাক্কা মারে। লোকটা চীৎ হয়ে পড়ে যায়।

নারীরা অবলা। কিন্তু যদি তার মধ্যে আত্মমর্যাবোধ জেগে ওঠে, তাহলে সে বিশাল পাথরখন্ডকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারে। খৃস্টান লোকটা নেশাগ্রস্ত। সে সাদিয়ার এই আচরণকে ঠাট্টা মনে করে খিলখিল করে হেসে ওঠে। নিকটে মাটির বড় একটি পাত্র রাখা ছিল। রাগে-ক্ষোভে পাগলের মত হয়ে গেছে সাদিয়া। সে পাত্রটি হাতে তুলে নেয়। অত্যন্ত ভারি বস্তু। সাদিয়া সেটা উপরে তুলে লোকটার মুখের উপর ছুঁড়ে মারে। চীৎ হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায়-ই খিলখিল করে হাসছিল সে। ভারি গামলাটা তার কপালে গিয়ে আঘাত হানে। সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসি থেমে যায়। সাদিয়া গামলাটা আবার তুলে নেয়। লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সাদিয়া পাত্রটা তার মাথার উপর ধরে আস্তে করে ছেড়ে দেয় এবং নিজে সেখান থেকে সরে গিয়ে পিছনের বাগিচায় চলে যায়।

আসরে মদপানের ধারা চলছে। নাচ-গান এখন তুঙ্গে। কে বেঁচে আছে আর খুন হল, সে খবর কারো নেই। সাদিয়া এখন এই ঝামেলা থেকে মুক্ত। আনতানুনের ভালবাসার নেশা তাকে ভুলিয়ে রেখেছে যে, সে এক ব্যক্তিকে খুন করে এসেছে এবং লোকটা খৃস্টান। সে অত্যন্ত গর্বের সাথে আনতানুনকে এসংবাদটা দেয়ার জন্য উদগ্রীব যে, আমি আমার ইজ্জত রক্ষার্থে একজন খৃস্টানকে খুন করে এসেছি।

আনতানুন যেখানে থাকার কথা, সেখানে নেই। সাদিয়া ভাবে, সে এসে তাকে না পেয়ে ফিরে গেছে। সে বৃক্ষটার পিছনে গিয়ে দেখে রশিটা দেয়ালের বাইরে না ভিতরে। রশি দেয়ালের ভিতরে। তার অর্থ হচ্ছে, আনতানুন এসেছে। কিন্তু লোকটা গেল কোথায়! ফিরে গেলে তো রশি বাইরেই থাকত।

সাদিয়া ওখানেই দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটি ছায়া নড়াচড়া করছে দেখতে পায় সে। সাদিয়া গভীরভাবে লক্ষ করে। বোধ হয় চাকরানী হবে। সে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাক দেয়। ওদিক থেকেও ফিসফিস কণ্ঠে জবাব আসে। ও তার চাকরানী-ই। সে সাদিয়ার দিকে ছুটে এসে বলল– 'তাকে এখানে খুঁজে লাভ নেই। তিনি এসেছিলেন। আমি তার অপেক্ষায়

লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি তাকে দেয়ালের উপর দেখেছি। তিনি রশিটা ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে নামতে শুরু করেন। ওদিক থেকে দু'জন লোক আসতে দেখলাম। তখন তিনি নীচে নামছিলেন। লোক দু'জন নিকটে এসে পড়ে। আমি তাকে সতর্ক করার সুযোগ পাইনি। আমি আপনাকে খুঁজতে থাকি। কিন্তু মেহমানদের মধ্যে আসরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সাদিয়ার মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। তার মনে পড়ে যায়, সে একজন খৃস্টানকে হত্যা করে এসেছে। তার হুঁশ-জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। এটি আল্‌ফ লায়লার রহস্যময় ও তেলেসমাতি জগত, যা সাদিয়ার মত মেয়ের বোধগম্যের বাইরে। তাকে হেরেমের একটি মেয়ে সাবধানও করেছিল যে, একজন রক্ষীসেনার সঙ্গে এই প্রেমখেলা তোমার জন্য অকল্যাণ ডেকে আনবে।

একটি ভাবনা সাদিয়াকে অস্থির করে তুলতে শুরু করে যে, আনতানুনকে কে গ্রেফতার করাল? যে দু'জন ব্যক্তি তাকে গ্রেফতার করল, তারা নিশ্চয় পূর্ব থেকেই জানত যে, আনতানুন এখানে আসবে। তারা বিষয়টা কিভাবে জানল? সাদিয়ার মনে আশংকা জাগতে শুরু করে, সেও গ্রেফতার হয়ে যাবে। চাকরানীর প্রতিও তার সন্দেহ জাগে যে, সেও গোয়েন্দাগিরি করতে পারে।

সাদিয়ার কিছুই বুঝে আসছে না। চাকরানীকে দিয়ে সে রশিটা খোলায় এবং লুকিয়ে ফেলতে বলে। তারপর চরম উৎকণ্ঠা ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখত-এর উদ্দেশ্যে ছুটে যায়। নাচ-মদের আসর তখনো গরম। সাদিয়া শাদবখতকে পেয়ে যায়। আসরের অবস্থা দেখে তার মনে হল, খৃস্টান লোকটার খুন হওয়ার বিষয়টা এখনো কেউ টের পায়নি। সাদিয়া পা টিপে টিপে শাদবখত-এর নিকট চলে যায় এবং তাকে ইংগিতে ডাক দেয়। সাদিয়া তাকে আলাদা নিয়ে গিয়ে জানায়, আমি একজন খৃষ্টানকে খুন করে এসেছি। খুনের হেতুও জানায় সাদিয়া।

শাদবখত শংকিত হয়ে উঠেন যে, সাদিয়াকে খৃস্টান লোকটার সঙ্গে যেতে কেউ না কেউ নিশ্চয় দেখেছে! তার ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তিনি বললেন– তোমার আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। যদি তুমি গ্রেফতার হয়ে যাও, তাহলে গোমস্তগীন তোমার ন্যায় রূপসীকেও বন্দিশালায় কি দশা ঘটাবে, তা আমার অজানা নয়। একজন খৃস্টানের খুনী যদি তার পিতাও হন, তবুও তিনি তাকে সামান্য ছাড় দেবেন না। তিনি একজন খৃস্টান কমান্ডারের মৃত্যুর ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

'আমি যাব কোথায়?' সাদিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

'কিছু সময় এখানে ঘোরাফেরা কর'– শাদবখত বললেন– 'শামসুদ্দীন ভাই আসলে তার সঙ্গে কথা বলব।'

'তিনি কোথায় আছেন?' সাদিয়া ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

কিছুক্ষণ আগে আমরা সংবাদ পেলাম, কে একজন রশি বেয়ে পিছনের দেয়াল অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। লোকটা কে এবং কী উদ্দেশ্যে ঢুকেছে, জানতে পারিনি। শামসুদ্দীন তাকে দেখতে এবং তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে না আসলে আমি নিজে যাব। তুমি মনটা শক্ত রাখ। আমরা তোমাকে যেভাবে হোক লুকিয়ে ফেলব।' শাদবখত জবাব দেন।

সাদিয়া ভাবে, ধৃত লোকটা আনতানুন ছাড়া আর কেউ নয়। সে কিছুটা নিশ্চিত হয় যে, আনতানুনকে সালার শামসুদ্দীনের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে এবং তিনি তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন।

লোকটা আনতানুন-ই। দু'জন সিপাহী তাকে গ্রেফতার করেছে। এ ধরনের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা শামসুদ্দীনের বিভাগের দায়িত্ব। তাই সংবাদটা তাকেই দেয়া হয়েছে যে, দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করা অবস্থায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শামসুদ্দীন আসর থেকে উঠে বাইরে গিয়ে দেখেন, ধৃত লোকটা আনতানুন। শামসুদ্দীন তাকে চিনেন না ভান ধরে জিজ্ঞেস করেন– 'তুমি সম্ভবত রক্ষী বাহিনীর জওয়ান। দেয়াল অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকলে কেন? সত্য সত্য বলে দাও; অন্যথায় মৃত্যুদন্ড হবে তোমার শাস্তি।'

আনতানুন নীরব। শামসুদ্দীন তার প্রতি এ কারণে ক্ষুব্ধ যে, তিনি বলেছিলেনও, সতর্ক থাকবে এবং আবেগকে কর্তব্যের উপর জয়ী হতে দেবে না।

কিন্তু আনতানুন সিনিয়রের এই নির্দেশনা মান্য করেনি। সে একদিকে যেমন যোগ্যতা দেখিয়েছে যে, এক চেষ্টায়-ই গোমস্তগীনের রক্ষী বাহিনীতে ঢুকে পড়েছে এবং পরক্ষণেই হেরেম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অপরদিকে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে অল্পতেই ধরা পড়ে গেল। আনতানুন যে কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ল, একজন গুপ্তচরের জন্য তা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু তাকে সেই অপরাধের শাস্তি এখন দেয়া যাবে না। এ মুহূর্তে তাকে এখান থেকে রক্ষা করতে হবে। পাশাপাশি সাদিয়াকেও এখান থেকে বের করতে হবে। কেননা, আনতানুন সাদিয়ার ডাকে এসেছে এবং সাদিয়া-ই রশি ঝুলানোর ব্যবস্থা করেছে, এ তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

শামসুদ্দীন সিপাহীদেরকে একটি জায়গার নাম উল্লেখ করে বললেন,

আসামীকে ওখানে নিয়ে যাও; আমি ওকে কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। সিপাহীরা আলতানুনকে নিয়ে যায়। শামসুদ্দীন মহলের ভিতরে চলে যান। তিনি তার ভাই শামসুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করেন।

আসরে নাচ-গান চলছে। মেহমানগণ চরম আনন্দ উপভোগ করছেন আর গায়ক-নর্তকীদের বাহবা দিচ্ছেন। মটকার পর মটকা মদ খালি হচ্ছে। মশালের কিরণ আর ফানুসের রং-বেরং আলো নর্তকীদের গায়ের মূল্যবান ফিনফিনে পোশাকে এমন চমক সৃষ্টি করছে যে, তা আল্ফ লায়লার যাদুকেও হার মানায়। সবাই অচেতন-মাতাল। খৃস্টান লোকটার মৃতদেহটা ওখানে-ই পড়ে আছে। এমনি তেলেসমাতি পরিবেশে শামসুদ্দীন ও শাদবখতের মাঝে আনতানুন ও সাদিয়ার প্রসঙ্গে কথোপকথন হয়। শাদবখত শামসুদ্দীনকে অবহিত করেন, সাদিয়া এক খৃস্টান মেহমানকে খুন করে ফেলেছে।

তাঁরা সাদিয়াকে তাদের কক্ষে নিয়ে যায় এবং বেশ-ভূষা পরিবর্তন করে সেখান থেকে পালাবার কৌশল শিখিয়ে দেয়। সাদিয়া পরিকল্পনা মোতাবেক ধীর পায়ে মহল থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর দারোয়ান এসে শামসুদ্দীনকে সংবাদ জানায়, বাইরে অমুক কমান্ডার দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আপনাকে ডাকছেন। শামসুদ্দীন বাইরে চলে যায়। ভীত-সন্ত্রস্ত এক কমান্ডার দন্ডায়মান। সে রিপোর্ট দেয়– 'আনতানুন নামক যে রক্ষীসেনাকে দেয়াল ডিঙ্গানো অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়েছে, সে পালিয়ে গেছে।'

'কী বললে?'– আগুনের মত গরম হয়ে যান শামসুদ্দীন– 'সিপাহী দু'টা কি মরে গিয়েছিল?'

'মনে হচ্ছে, কাজটা একা আনতানুনের নয়– অনেক লোকের'– কমান্ডার বলল– 'সিপাহী দু'জন সেখানে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। তাদের মাথায় আঘাতের চিহ্ন আছে।'

শামসুদ্দীন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সিপাহীদ্বয়ের জ্ঞান ফিরে এসেছে। তারা জানায়, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে পিছন দিক থেকে কে যেন আমাদের মাথায় একটি করে আঘাত হানে। আমরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

শামসুদ্দীন দৌড়-ঝাপ শুরু করে দেন। ঠিক সে সময়ে আপাদমস্তক কালো রেশমী চাদরে আবৃত- যার দু'টি চোখ ছাড়া আর কোন অংশ দেখা যায় না–গোমস্তগীনের বাসভবন থেকে প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে যায়। সে রাতে

মেহমানদের আসা-যাওয়া অব্যাহত ছিল। আপাদমস্তক পোশাকাবৃত করে বের হওয়া লোকটা কে, দারোয়ান ও রক্ষীসেনারা তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজনই অনুভব করল না।

মধ্যরাতের পর যখন আসর ভাঙ্গে, তখন দুর্গের দরজা খুলে যায়। ঘোড়া ও ঘোটকযান ফটক অতিক্রম করতে শুরু করে। এক অশ্বারোহী ফটক অতিক্রম করে, যার মুখটা নেকাবে ঢাকা। তার সঙ্গে অপর একটি ঘোড়ায় সেই চাদরাবৃতা মহিলা, যে গোমস্তগীনের বাসভবন থেকে একাকী বেরিয়ে এসেছিল।

ব্যবস্থাটা শামসুদ্দীন ও শাদবখতের। শামসুদ্দীন উক্ত সিপাহীদ্বয়কে একটি জায়গার নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন, আনতানুনকে ওখানে নিয়ে গিয়ে আমার অপেক্ষা কর। অপরদিকে তিনি তার বডিগার্ডকে বলে দিলেন, তুমি আনতানুনকে মুক্ত করে আমার কক্ষে লুকিয়ে রাখ। আগেই বলেছি, শামসুদ্দীন ও শাদবখতের বডিগার্ড, দু'জন আরদালী ও দু'জন চাকর সুলতান আইউবীর কমান্ডো গোয়েন্দা। তারা যথাসময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং আনতানুনকে মুক্ত করে ফেলে। ওদিক থেকে সাদিয়াও সাফল্যের সাথে বেরিয়ে শামসুদ্দীনের ঘরে চলে যায়। সেখানে আয়োজন পূর্ব থেকেই সম্পন্ন করা ছিল। মেহমানরা যখন বের হতে শুরু করে, তখন তাদেরকে দু'টি ঘোড়া দিয়ে সেখান থেকে বের করে দেয়া হল।

নাচ-গান আর মদ-নারীতে রাতটা কেটে যায়। পরদিন সকালে খৃস্টান লোকটার লাশ চোখে পড়ে। গোমস্তগীনের মহলের একটি মেয়েও নিখোঁজ। গোমস্তগীন নির্দেশ দেন, যে দু'জন সিপাহীর প্রহরা থেকে আনতানুন পালিয়েছে, তাদেরকে আজীবনের জন্য কয়েদখানায় নিক্ষেপ কর।

আনতানুন ও সাদিয়ার পলায়নের কথা ভুলে গেছে সবাই। গোমস্তগীনের খৃস্টান বন্ধুরা তাদের একজন কমান্ডারের খুনের ঘটনায় তোলপাড় শুরু করে দেয়। তাদের মূলত একজন সহকর্মীর মৃত্যুতে ততটা দুঃখ নেই, যতটা তারা হুলস্থুল সৃষ্টি করেছে। তাদের উদ্দেশ্য হল, অসন্তোষ প্রকাশ করে গোমস্তগীন থেকে আরো সুবিধা আদায় করা এবং অতিশীঘ্র সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর আক্রমণ করার জন্য গোমস্তগীনকে ক্ষেপিয়ে তোলা। খৃস্টানরা জানে, মুসলমানদের হেরেমগুলোতে এমন ড্রামা খেলা হয়ে থাকে, যাতে একটা মেয়ে অপহৃতও হয়, স্বেচ্ছায় উধাও হয়ে যায় এবং দু'-একটা খুনের ঘটনাও ঘটে থাকে। তারা গোমস্তগীনকে অসহায় করে ফেলতে চাইছে, যাতে তিনি তাদের

কাছে সম্পূর্ণরূপে নতি স্বীকার করেন। মানুষ যার প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে, তার দাম বেড়ে যায় এবং সাহায্য প্রার্থনাকারীর অসহায়ত্বের সুযোগে নিজের সব শর্ত আদায় করে নেয়ার এবং অসহায়কে গোলামে পরিণত করার চেষ্টা করে। খৃস্টানরাও সেই একই নীতি অবলম্বন করছে।

ঘটনাটা গোপন রাখা গেল না। হাল্‌ব পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সংবাদ। সেখানকার দরবারীগণ–যারা সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত–গোমস্তগীনকে তাদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করছে। আল-মালিকুস সালিহ্-এর পক্ষ থেকে তারা গোমস্তগীনের নিকট দূত প্রেরণ করে। সঙ্গে রীতি অনুযায়ী মূল্যবান উপঢৌকনও পাঠায়। উপহারের মধ্যে আছে দু'টি যুবতী মেয়ে।

গোমস্তগীন বিশ্রাম করছিলেন। দূত এবং মেয়ে দু'টোকে শামসুদ্দীনের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। গোমস্তগীনের পর সালার শামসুদ্দীন-ই রাষ্ট্রীয় কাজ দেখা-শুনা করে থাকেন। শামসুদ্দীন মেয়েগুলোকে তার ঘরে আলাদা বসিয়ে রেখে দূতকে জিজ্ঞেস করেন– 'বল, কী বার্তা নিয়ে এসেছ?'

দূত যে দীর্ঘ বার্তা নিয়ে আসে, তার সারমর্ম হল, সুলতান আইউবী হাল্‌ব অবরোধ করার পর সম্রাট রেমন্ড বাহিনী নিয়ে আসেন। ফলে আইউবী অবরোধ তুলে নেন। কিন্তু রেমন্ড যুদ্ধ না করেই বাহিনী নিয়ে ফিরে যান। খৃস্টানরা ভবিষ্যতেও আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করবে। আমরা যদি এভাবে আলাদা আলাদাভাবে আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করি, তাহলে আমরা প্রত্যেকেই পরাজিত হব। আইউবীকে চিরতরে খতম করার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা একান্ত আবশ্যক।

বার্তার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করার একটি পরিকল্পনাও ছিল। তা এরকম–

আলরিস্তানের পাহাড়ে বরফ গলতে শুরু করেছে। আমরা গুপ্তচর মারফত জানতে পেরেছি, সুলতান আইউবীর সৈন্যরা পাহাড়ের উঁচুতে অবস্থান করতে পারছে না। কারণ, সেখানে গলিত বরফের পানি তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আমাদের জন্য এটি মোক্ষম সুযোগ। আমরা সব দল যদি একত্রিত হয়ে আইউবীর বাহিনীকে ঘিরে ফেলি, তাহলে অতি সহজেই তাকে পরাজিত করতে পারব।

পরিকল্পনায় এ-ও ছিল যে, খৃস্টান সম্রাট রেজিনাল্টকে আমাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে নিতে হবে। তা এভাবে যে, আপনি (গোমস্তগীন) তাকে পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করুন এবং যে প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে আপনি তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন, সেকথা স্মরণ করিয়ে দিন।

শামসুদ্দীন পয়গামটা শাদবখতের কানে দেন। দু'ভাই বসে মতবিনিময় করেন। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বার্তাটি গোমস্তগীনকে জানতে দেয়া যাবে না। আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, গোমস্তগীন সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াইটা যেন একাকী করেন। তাহলে তার পরাজয় সহজতর হবে। তারা জানতেন, আইউবীর সৈন্যসংখ্যা কম। তা দিয়ে তিনি গাদ্দার মুসলিম শাসনকর্তাদের আলাদা আলাদাভাবে খতম করতে পারবেন।

শামসুদ্দীন ও শাদবখত নিজেদের আসল পরিচয় গোপন রাখার ব্যাপারে পুরোপুরি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু এ মুহূর্তে তারা আবেগ-প্রবণ হয়ে পড়েন। তাদের আবেগকে উস্কে দিয়েছে উপহার হিসেবে আসা মেয়ে দু'টো। তারা মেয়েদেরকে তাদের ধর্মপরিচয় জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তারা জানায়, আমরা মুসলমান। বয়সে তারা যুবতী। শামসুদ্দীন ও শাদবখতের মনে অনুশোচনা জাগে, একদিকে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে এই দুর্বলতা সৃষ্টি করে নিয়েছে যে, তারা সুন্দরী মেয়েদের বিনিময়ে ঈমান বিকিয়ে ফেলছে। অপরদিকে যেখানে মুসলিম মেয়েদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের শোভা বর্ধন করার কথা, সেখানে তাদেরকে তাদের-ই বাবা-মা আমীরদের হেরেমে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন।

'তোমরা কোথাকার বাসিন্দা এবং এদের হাতে পড়লে কিভাবে?'- শাদবখত জিজ্ঞেস করেন- তোমাদের পিতারা কি জীবিত? ভাই আছে?

এসব প্রশ্নের জবাবে মেয়েরা যা বলল, তাতেই শামসুদ্দীন ও শাদবখতের চেতনা ক্ষেপে ওঠে। যেসব অঞ্চলে খৃস্টানদের কর্তৃত্ব চলছে, সেসব এলাকার মুসলমানদের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। একজন মুসলমানের ইজ্জতেরও কোন নিরাপত্তা ছিল না। ফলে সেসব মুসলমান বাসিন্দারা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে হলে দলবদ্ধভাবে চলত। কাফেলায় মেয়েরাও থাকত এবং মাল-সম্পদও থাকত। অপরদিকে খৃস্টানরা কাফেলা লুট করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকত। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, কোন কোন খৃস্টান সম্রাট- যারা মধ্যপ্রাচ্যের কোন না কোন অঞ্চল শাসন করতেন- সেনাবাহিনী দ্বারা মুসলমানদের কাফেলা লুণ্ঠন করাত। লুটেরারা যুবতী মেয়ে, পশুপাল ও অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যেত। তারা মেয়েদেরকে বাজারে নিয়ে বিক্রি করত কিংবা মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে মুসলিম আমীরদের হাতে তুলে দিত। কিছু কিছু মেয়েকে খৃস্টানরা নিজেদের কাছে রেখে দিত এবং তাদেরকে গুপ্তচরবৃত্তি ও চরিত্র বিধ্বংসী কাজের জন্য গড়ে তুলত। তাদেরকে তারা মুসলমানদের এলাকায় ব্যবহার করত।

এই মেয়ে দু'টোকেও একটি কাফেলা থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। তখন তাদের বয়স ছিল তের-চৌদ্দ বৎসর। তারা ফিলিস্তীনের কোন এক অধিকৃত অঞ্চল থেকে পরিবারের সঙ্গে কোন নিরাপদ এলাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। কাফেলাটা ছিল বিশাল। খৃস্টান দস্যুরা রাতের বেলা কাফেলার উপর হামলা চালায় এবং অনেকগুলো মেয়েকে তুলে নিয়ে যায়। এরা দু'জন অস্বাভাবিক সুন্দরী ছিল বিধায় এদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করে বিশেষ যত্নে লালন-পালন করতে শুরু করে। প্রথম দিকে তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হলেও পরে তাদের সঙ্গে এমন সদ্ব্যবহার শুরু হয়, যেন তারা রাজকন্যা। আসলেই তাদেরকে রাজকন্যা রূপে গড়ে তোলা হয়েছিল। তাদেরকে মদপানে অভ্যস্ত করে তোলা হয় এবং অত্যন্ত উন্নত পন্থায় তাদের চিন্তা-চেতনাকে খৃস্টানদের ধাঁচে গড়ে তোলা হয়। চার্-পাঁচ বছর পর যখন সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী মৃত্যুবরণ করেন, তখন এদেরকে খৃস্টানদের পক্ষ থেকে উপহারস্বরূপ দামেস্ক প্রেরণ করা হয়। উদ্দেশ্য, খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ও তার আমীরদেরকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে এবং নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসা।

মেয়েরা জানায়–

'আমাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে ধর্ম ও চরিত্র বের করে দেয়া হয়েছিল। আমরা এক একটি সুদর্শন খেলনায় পরিণত হয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমাদেরকে দামেস্ক পাঠানো হল, তখন আমাদের মস্তিষ্কে ধর্ম ও সচ্চরিত্রতা পুনরায় জেগে ওঠে। আমাদের রক্তে যে ইসলামী ঐতিহ্য ছিল, তা ফিরে এসে আমাদের আত্মাকে জাগ্রত করে। তখন আর আমাদের পিতা-মাতা ও ভাই-বোনদের ফিরে পাওয়ার সুযোগ ছিল না। আমরা মুসলিম শাসনকর্তা ও রাজা-বাদশাহদেরকে পিতা ও ভাই হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের একজনও আমাদেরকে কন্যা কিংবা বোনের চোখে দেখেনি। খৃস্টানদের হাতে সম্ভ্রম হারিয়ে আমরা ততটুকু কষ্ট পায়নি, যতটুকু কষ্ট এই মুসলিম ভাইদের নিকট এসে পেয়েছি। কারণ, খৃস্টানরা আমাদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে, তা প্রত্যাশার বাইরে ছিল না। কিন্তু খৃস্টানরা আমাদেরকে যে মুসলমানদের নিকট প্রেরণ করেছিল, আমরা তাদের হাতে ধরেছি পায়ে ধরেছি। ইসলাম, আল্লাহ ও রাসূলের দোহাই দিয়েছি যে, আমরা আপনাদের কন্যা। আমরা নির্যাতিতা। আমরা আপনাদের মর্যাদার প্রতীক। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। মদ ও শয়তান তাদের চোখে চাঁদ-তারা আর ক্রুশের মাঝে কোন ব্যবধান থাকতে দেয়নি... ।'

'আমাদের ভিতরে প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে ওঠে। সুলতান সালাহুদ্দীন

আইউবীর দামেস্ক আগমনের সংবাদ শুনে আমরা অত্যন্ত আনন্দি হই। খৃস্টানদের এলাকায় মুসলমানরা সুলতান আইউবীর পথপানে চেয়ে আছে। আইউবীকে তারা ইমাম মাহ্দী মনে করে। তিনি যখন দামেস্ক আসেন, তখন আমরা প্রতিজ্ঞা নেই, যেভাবে হোক, আমরা তাঁর নিকট যাব। তাঁকে বলব, আপনি আমাদেরকে আপনার ফৌজে রেখে দিন এবং আমাদের কিছু একটা কাজ দিন। কিন্তু আমাদেরকে সেখান থেকে জোরপূর্বক হাল্ব নিয়ে আসা হল। এখন আমরা আপানাদের হাতে। আমরা আপনাদের নিকট এই প্রত্যাশা রাখতে পারছি না, আপনারা আমাদেরকে কন্যা হিসেবে বরণ করে নেবেন। তবে আমরা এটুকু অবশ্যই বলব যে, আমাদের সম্ভ্রম তো ছিন্নভিন্ন, ঈমানটুকু যেন নষ্ট না হয়।

আমরা যখন খৃস্টানদের নিকট ছিলাম, সেখানেও সুলতান আইউবী ও ইসলাম বিরোধী পরিকল্পনা হতে দেখেছি, তেমনি যখন মুসলমানদের নিকট ছিলাম, তখনও আইউবী বিরোধী তৎপরাত-ই দেখেছি। এখন আপনাদের পরীক্ষা নেয়ার পালা। আমরা শুনেছি, খৃস্টান মেয়েরা এখানে গুপ্তচরবৃত্তি করতে আসে। আপনারা আমাদেরকে খৃস্টানদের এলাকায় পাঠিয়ে দিন। আমাদের এ ভয় তো নেই যে, আমাদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হবে। তাতো লুট হয়েই গেছে। আপনারা আমাদেরকে ইসলামের সুরক্ষা ও প্রসারের জন্য সুযোগ দিন।'

মেয়ে দু'টোর উপাখ্যান ও জীবন কাহিনী সালার শামসুদ্দীন ও সাদবখতকে চরম প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে। তাদের আবেগ ও চেতনায় প্রচন্ড একটা ধাক্কা দেয়। সব শুনে তারা মেয়েদেরকে বললেন, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, এখন আর তোমাদেরকে কোন বিলাস পুজারী দুশ্চরিত্র শাসকের হাতে তুলে দেয়া হবে না।

❁ ❁ ❁

শামসুদ্দীন ও শাদবখত বসে কথা বলছেন। হঠাৎ এক দেহরক্ষী ভিতরে প্রবেশ করে বলল, কাজী সাহেব এসেছেন। দু'ভাই অভ্যর্থনা কক্ষে চলে যান। কাজী সাহেব ইবনুল খাশিব আবুল ফজল বসে আছেন। লোকটা মধ্যবয়সী। তিনি বললেন– শুনেছি, হাল্ব থেকে দূত এসেছে এবং পয়গামের সঙ্গে উপহারও এসেছে।'

'হ্যাঁ'– শাদবখত বললেন– 'দুর্গপতি ঘুমিয়ে আছেন বলে দূতকে আমাদের কাছে বসিয়ে রেখেছি।'

'আমি উপহার দু'টো দেখতে এসেছি'– ইবনুল খাশিব চোখ টিপে বললেন–

'তাদেরকে এক ঝলক দেখাও তাড়াতাড়ি।'

কাজী সাহেব কেমন চরিত্রের মানুষ দু'ভাইয়ের জানা আছে। লোকটা গোমস্তগীনকে মুঠোর মধ্যে রেখেছে। শামসুদ্দনি মেয়ে দু'টোকে অভ্যর্থনা কক্ষে ডেকে পাঠান। তাদেরকে দেখে কাজী সাহেবের চোখ আটকে যায়। তিনি বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বললেন– 'শাবাশ! ...এত রূপ!'

শামসুদ্দীন এক ঝলক দেখিয়েই মেয়ে দু'টোকে কক্ষে পাঠিয়ে দেন। কাজী সাহেব বললেন– 'এদেরকে আমার হাতে তুলে দাও। আমি নিজে এদেরকে দুর্গপতির নিকট নিয়ে যাব। মনে হচ্ছে, যেন তার দু'চোখ থেকে দু'টি শয়তান উঁকি মারছে।'

'আপনি একজন বিচারক'– শামসুদ্দীন বললেন– 'জাতির নিকট আপনার মর্যাদা গোমস্তগীনের চেয়েও উচ্চে। মানুষের ন্যায় বিচার আপনার হাতে।'

কাজী সাহেব খিলখিল করে হেসে ফেললেন এবং বললেন– 'তোমরা সৈনিকরা আসলেই বোকা হয়ে থাক। নাগরিক জীবনের ব্যাপার-স্যাপার তোমরা কিচ্ছু বুঝ না। আরে, যে কাজির হাতে আল্লাহর আইন ও আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হত, সেই কাজী মারা গেছেন। তিনি শাসনকর্তাকে নয়– আল্লাহকে ভয় করতেন। শাসনকর্তা বরং তার ভয়ে মানুষের উপর অবিচার করা থেকে বিরত থাকতেন। এখন শাসনকর্তারা সেই ব্যক্তিদেরকে কাজী নিয়োগ করছেন, যারা অবিচারকে বৈধ সাব্যস্ত করেন এবং সংবিধানকে নয়– শাসককে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে থাকেন। আমি আমার আল্লাহর নয়– শাসনকর্তার কাজী।

'আর তারই ফলে কাফেররা তোমাদের হৃদয়ের উপর জেঁকে বসেছে'– শাদবখত বললেন– 'ঈমান নীলামকারী শাসকের কাজী ঈমান নীলামকারীই হয়ে থাকে। তোমাদের ন্যায় বিচারকগণ-ই আল্লাহর রাসূলের উম্মতকে এই অধঃপাতে নামিয়ে এনেছে যে, আমাদের আমীর-শাসকগণ আপন কন্যাদের সম্ভ্রম নিয়ে পর্যন্ত তামাশা করছে। এরা আপনার মুসলিম কন্যা, যাদেরকে আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন।'

গোমস্তগীনের এই কাজীটার উপর শয়তান এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে, তিনি শামসুদ্দীন ও শাদবখতের বক্তব্যকে বিদ্রূপে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন এবং হেসে বললেন– 'আসলে হিন্দুস্তানী মুসলমানরা হৃদয়মরা মানুষ। আচ্ছা, তোমরা হিন্দুস্তান থেকে এদেশে কেন এসেছ?'

'মন দিয়ে শোন বন্ধু!'– শামসুদ্দীন বললেন– 'আমি তোমাকে শুধু এ কারণে

শ্রদ্ধা করি যে, তুমি বিচারক। অন্যথায় তোমার আসল পরিচয় তো আমার জানা আছে। তুমি আমার একজন অধীন কমান্ডার ছিলে। তুমি এই পদমর্যাদা অর্জন করেছ তোষামোদ আর চাটুকারিতার বলে। তোমার আত্মমর্যাদাকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে আমরা হিন্দুস্তান থেকে কেন এসেছি, তার হেতু বলছি। ছয়শত বছর আগের কথা। মোহাম্মদ বিন কাসিম নামক এক যুবক সেনাপতি একটি নির্যাতিত মেয়ের আর্তনাদে সাড়া দিয়ে এই ভূখণ্ড থেকে হিন্দুস্তান গিয়ে হামলা করেছিলেন। তুমি তো জান, এখান থেকে হিন্দুস্তানের দূরত্ব কতটুকু। তুমি কি অনুমান করতে পারছ, যুবকটি তার বাহিনীকে কিভাবে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন? তুমি নিজেও একজন সৈনিক। লোকটা এত দূরত্ব পথ অতিক্রম করে রসদ ও পিছনের সাহায্যপ্রাপ্তির আশা ব্যতীত কিভাবে যুদ্ধ করল, তুমি তো তা বুঝ। আবেগের জগত থেকে বেরিয়ে বাস্তবতা একটু ভেবে দেখ...।'

'মোহাম্মদ বিন কাসিম এমন কঠিন পরিস্থিতিতে বিজয় অর্জন করলেন যে, ঐ পরিস্থিতিতে তার পরাজয় বরণ করার সম্ভাবনা-ই ছিল বেশী। তিনি শুধু রাজ্য জয়-ই করেননি, হিন্দুস্তানীদের হৃদয়গুলোও জয় করে নিলেন এবং কোন জুলুম-নির্যাতন ছাড়া সেই কুফরের মাটিতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করলেন। তারপর একদিন তিনি মারা গেলেন। যে লোকগুলো এত পথ অতিক্রম করে একটি মেয়ের ইজ্জতের প্রতিশোধ নিলেন এবং ইসলামের আলো ছড়ালেন, তারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। দেশটা এমন রাজা-বাদশাহদের হাতে চলে যায়, যারা মুজাহিদদের কাফেলায় ছিল-ই না। বিনা মূল্যে প্রাপ্ত দেশটায় তারাও সেসব কর্মকান্ড করতে শুরু করল, যা আজ এখানে চলছে। হিন্দুরা সে দেশের মুসলমানদের উপর জয়ী হতে শুরু করল, যেমন এদেশে খৃস্টানরা জয়ী হচ্ছে। সালতানাতে ইসলামিয়া নিঃশেষ হতে শুরু করল। আমরা যৌবনে পদার্পন করে দেখি, মোহাম্মদ বিন কাসিম ও তার যোদ্ধারা রক্ত দ্বারা যে রাজ্যটিকে জয় করেছিলেন, তার গোড়া শুকিয়ে গেছে। মুসলমান শাসকগণ আরবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে। আমরা দু'ভাই– যাদের বংশ লড়াকু বংশ বলে খ্যাত– নিরাশ হয়ে দেশ ছেড়ে এদেশে চলে এসেছি। আমরা ভারতীয় মুসলমানদের দূত হয়ে এসেছি। ছিন্ন সম্পর্ক জুড়তে এসেছি...।'

'এসে আমরা সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি বললেন, কিভাবে আমি ভারতবর্ষের কথা ভাবতে পারি! কিভাবে আমি ভারত অভিযানের চিন্তা করতে পারি! আমার গোটা আরব ভূখন্ড গাদ্দারদের দ্বারা পরিপূর্ণ!'

মরহুম জঙ্গী দূরের কোন অভিযানে এ কারণে যেতেন না যে, তার অবর্তমানে

এখানে বিদ্রোহ ঘটে যাবে, যার দ্বারা উপকৃত হবে খৃস্টানরা। তিনি বললেন, 'আমার বড় আফসোস হয়, ভারতবর্ষে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর জয়ী হচ্ছে আর এখানে জয়ী হচ্ছে খৃস্টানরা!'

সুলতান জঙ্গী আমাদেরকে তার বাহিনীতে ভর্তি করে নেন। পরে গোমস্তগীন, সাইফুদ্দীন ও ইজ্জুদ্দীন প্রমুখ যখন গোপনে গোপনে খৃস্টানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে শুরু করেন, তখন জঙ্গী আমাদেরকে এ লক্ষ্যে গোমস্তগীনের বাহিনীতে প্রেরণ করেন, যেন আমরা তার গোপন তৎপরতার প্রতি নজর রাখি।'

'তার মানে তোমরা দু'জন গুপ্তচর।' তিরস্কারের সুরে কাজী ইবনুল খাশিব বললেন।

'তুমি আমার বক্তব্য বুঝবার চেষ্টা কর'– শামসুদ্দীন বললেন– 'তুমি তো দেখছ, আমাদের মুসলিম আমীরগণ সেই মর্দে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, যার লক্ষ্য ইসলামকে ক্রুশের হাত থেকে রক্ষা করা। আজকের দূত অত্যন্ত বিপজ্জনক বার্তা নিয়ে এসেছে।' শামসুদ্দীন বার্তাটি শুনিয়ে বললেন– 'গোমস্তগীনের উপর তোমার প্রভাব আছে। তুমি তাকে ঠেকাতে পার। তুমি যদি আমাদের মতে একমত হও, তাহলে এস, আমরা গোমস্তগীনকে বুঝাবার চেষ্টা করি যে, আপনি গাদ্দারদের সঙ্গে ঐক্য গড়ার পরিবর্তে সুলতান আইউবীর সঙ্গে যোগ দিন। অন্যথায় তিনি এমন শোচনীয় পরাজয়বরণ করবেন যে, তাকে আজীবন কয়েদখানায় কাটাতে হবে।'

'তার আগে আমি তোমাদেরকে কয়েদখানায় আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করছি'– ইবনুল খাশিব বললেন– 'মেয়ে দু'টোকে আমার হাতে তুলে দাও।'

ইবনুল খাশিব বসা থেকে ওঠে মেয়েরা যে কক্ষে অবস্থান করছে, সেই কক্ষের দিকে পা বাড়ায়। শাদবখত তারা বাহু ধরে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে আসেন। বললেন– 'কোথায় যাচ্ছেন?' ইবনুল খাশিব শাদবখতকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করেন। শাদবখত তার মুখের উপর সজোরে এক ঘুষি মারেন যে, ইবনুল খাশিস পেছন দিকে চীৎ হয়ে পড়ে যান। শামসুদ্দীন কক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে ইবনুল খাশিরের ধমনীতে পা রেখে এমনভাবে চেপে ধরেন যে, লোকটা কিছুক্ষণ ছটফট করে নির্জীব হয়ে যান।

ইবনুল খাশিব মারা গেলেন। তাকে হত্যা করা দু'ভাইয়ের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা ভাবলেন, এবার আমাদের ধরা পড়া নিশ্চিত। তারা তাদের আরদালী দু'জনকে ডেকে চারটি ঘোড়া প্রস্তুত করতে বললেন। ঘোড়া প্রস্তুত হয়ে গেল। শামসুদ্দীন ও শাদবখত মেয়ে দু'টোকে দু'টি ঘোড়ায় বসিয়ে দেন।

আরদালীদেরকে তরবারী ও তীর-ধনুক দিয়ে অপর ঘোড়ায় সাওয়ার হতে বললেন। তারা সঙ্গে গিয়ে দুর্গের ফটক খুলিয়ে চারজনকে পালিয়ে যেতে বললেন। তাদেরকে বলে দেয়া হল, তোমরা সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছে যাবে। তারা আরদালীদেরকে গোমস্তগীনের পরিকল্পনাটা বিস্তারিত বলে দেন।

চারটি ঘোড়া ফটক অতিক্রম করেই ছুটে চলে। শামসুদ্দীন এবং শাদবখতেরও বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কি যেন ভেবে তারা ফিরে আসেন।

গোমস্তগীন ঘুম থেকে জেগে বেরিয়ে এসেছেন। দূতকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে এবং কোথা থেকে এসেছ? দূত তার পরিচয় প্রদান করে। দূত উপহারস্বরূপ নিয়ে আসা মেয়ে দু'টোর কথাও বলল। কিন্তু গোমস্তগীন মেয়েদেরকে দেখতে পেলেন না। শামসুদ্দীন ও শাদবখত বললেন– 'তারা চলে গেছে। কারণ, তারা মুসলমান। যেখানে তাদের ইজ্জত নিরাপদ থাকবে, আমরা তাদেরকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি।' তারা গোমস্তগীনকে জানালেন, কাজী সাহেবের লাশ ভিতরে পড়ে আছে।

গোমস্তগীন লাশটা দেখলেন। তিনি জ্বলে ওঠলেন। সালার শামসুদ্দীন আলী ও শাদবখত আলীকে বন্দী করে ফেললেন।

চারজন অশ্বারোহী দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য নিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর উদ্দেশ্যে ছুটে চলছে। সুলতান আইউবী আলরিস্তানের পাহাড়ী এলাকায় বসে হাসান বিন আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করছেন– 'শামসুদ্দীন ও শাদবখতের পক্ষ থেকে কোন সংবাদ এসেছে কি?'

ভয়ংকর ষড়যন্ত্র

কাজী ইবনুল খাশিবের খুন এবং উপহার স্বরূপ আসা মেয়ে দু'টোকে পালাবার সুযোগ করে দেয়ার অপরাধে যে সময় সালার শামসুদ্দীন ও শাদ বখ্‌তকে কয়েদখানায় নিক্ষোপ করা হচ্ছিল, ঠিক তখন অপর এক দূত মসুলে গাজী সাইফুদ্দীনের নিকট গিয়ে পৌঁছে। গাজী সাইফুদ্দীন খেলাফতের অধীনে মসুল ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার গবর্নর হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে মসুলের স্বাধীন শাসক হিসেবে দাবি করে বসেন। তিনি চরিত্র ও চিন্তা-চেতনার দিক থেকে ছিলেন আইউবীর বিপরীত। মসুল ছিল ইসলামী সালতানাতের অঙ্গ। কিন্তু সাইফুদ্দীন তথাকার স্বাধীন শাসকে পরিণত হয়ে বসেন এবং সুলতান আইউবীর শত্রু পক্ষের সঙ্গে যোগ দেন। তার ভাই ইজ্জুদ্দীন একজন অভিজ্ঞ সেনা অধিনায়ক ছিলেন। সেনা বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের কমান্ড ছিল তার হাতে। সাইফুদ্দীন যেহেতু নিজেকে রাজা মনে করতেন, তাই তার চাল-চলনও ছিল রাজকীয়। তিনি দেশ-বিদেশের সুন্দরী নারী ও নর্তকী দ্বারা তার হেরেম পরিপূর্ণ করে রেখেছিলেন। নারী-নর্তকীর পর তার দ্বিতীয় সখের বস্তু ছিল পাখি। তার হেরেমে যেমন একটি অপেক্ষা অপরটি সুন্দরী নারী শোভা পেত, তেমনি তার ঘরে শোভা পেত খাঁচাভর্তি রং-বেরংয়ের পাখি। নারী আর পাখি নিয়েই ছিল তার জীবন।

ভাই ইজ্জুদ্দীনের সামরিক যোগ্যতার উপর পূর্ণ আস্থা ছিল সাইফুদ্দীনের। তার আশা ছিল, ইজ্জুদ্দীন সুলতান আইউবীকে পরাজিত করে তার জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। এ লক্ষ্যে তিনি হাররানের দুর্গপতি গোমস্তগীনের এবং কথিত শাসক আল-মালিকুস সালিহ-এর ন্যায় নিজের জন্য খৃষ্টান উপদেষ্টা নিয়োগ করে রেখেছিলেন, যারা তাকে আশা দিয়ে রেখেছিল, সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে খৃষ্টানরা তাকে সাহায্য করবে। এভাবে মুসলমানদের তিনটি বাহিনী সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। একটি হাল্‌বে, একটি হাররানে এবং একটি মসুলে। তারা ছিল বড় বড় মুসলিম শাসক ও আমীর। ছোট ছোট শেখ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম প্রদেশের নবাবগণ- যাদের সংখ্যা বহু– তারা এই তিন বৃহৎ

শাসকের সমর্থক ও সহযোগি ছিল। তারা এই তিন শাসনকর্তাকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিল এবং দিচ্ছিলও। তাদেরকে বুঝানো হল, সুলতান আইউবী যদি জয়লাভ করে বসেন, তাহলে যেভাবে তিনি মিশর ও সিরিয়াকে একীভূত করে একটি সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন, তেমনি প্রতিটি মুসলিম প্রদেশকে তাঁর সালতানাতে সংযুক্ত করে প্রত্যেককে তাঁর নিজের গোলামে পরিণত করে ফেলবেন।

তারা বাহ্যত ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু ভিতর থেকে ছিল চরম অনৈক্য। আমি অন্যের তুলানায় দুর্বল থাকি এমনটা তাদের কেউ কামনা করত না। তাদের অবস্থা ছিল ছোট ও বড় মাছের মত। প্রতিটি ছোট মাছ বড় মাছকে ভয় করে চলে এবং কামনা করে, আমিও বড় মাছ হয়ে যাই। সুলতান আইউবী গোয়েন্দাসূত্রে ভালভাবেই অবহিত ছিলেন যে, তার বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কপটতা বিদ্যমান। তথাপি তিনি কোন ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন না। তিনি সবসময় এই বাস্তবতাকে সামনে রাখতেন যে, তিনটি বৃহৎ বাহিনী তার মুখোমুখি দন্ডায়মান। ফৌজ যেমনই হোক, ফৌজ-ই– তারা ভেড়া-বকরীর পাল নয়। তাঁর এই অনুভূতিও ছিল, এই ত্রিপক্ষের কমান্ডার ও জওয়ানরা মুসলমান এবং আল্লাহ পাক যে পরিমাণ সামরিক যোগ্যতা ও বীরত্ব মুসলমানদেরকে দান করেছেন, অন্য জাতিকে তা দান করেননি। ইতিহাস সাক্ষী, খৃষ্টানরা চার-পাঁচগুণ বেশী শক্তিধর বাহিনী নিয়ে হামলা করা সত্ত্বেও স্বল্পসংখ্যক নিরস্ত্রপ্রায় মুসলিম সৈনিক তাদেরকে পরাজিত করেছে।

সুলতান আইউবী হাল্‌ব অবরোধ করে পরিস্থিতি আন্দাজ করে নিয়েছিলেন। একদল মুসলিম বাহিনী আরেকদল মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম। হাল্‌বের মুসলিম সৈনিকরা এবং সেখানকার মুসলিম জনসাধারণ যেরূপ উদ্দীপনা ও বীরত্বের সঙ্গে হাল্‌ব রক্ষা করল, তাতে সুলতান আইউবীর পা ফস্‌কে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি এই লড়াইয়ের কথা ভুলতে পারছিলেন না।

সুলতান আইউবীর উপর অভিযোগ আরোপ করা হয়েছিল যে, তিনি মুসলমানদের উপর সেনা অভিযান পরিচালনা করছেন। এই দুর্নাম রটনাকারীদের প্রধান লোকটি ছিলেন আব্বাসী খেলাফতের সমর্থক, যাকে সুলতান আইউবী মিশরে পদচ্যুৎ করেছিলেন। এক কথায় এই মুসলিম শাসক ও আমীরগণ সুলতান আইউবীর ফিলিস্তীন স্বাধীন করার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। 'কিন্তু প্রথম কেবলা কাফেরদের দখলে' এই বাস্তবতা সুলতানকে এক

মুহূর্তের জন্যও স্থির হতে দিচ্ছিল না। তিনি ইহুদীদের প্রত্যয়-পরিকল্পনা সম্পর্কেও বে-খবর ছিলেন না। তিনি জানতেন, ইহুদীরা দাবি করে ফিরছে, ফিলিস্তীন তাদের জন্মভূমি এবং প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস মুসলমানদের নয়– ইহুদীদের উপাসনালয়। ইহুদীরা স্বসৈন্য সামনে আসছে না বটে; কিন্তু তারা খৃষ্টানদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে যাচ্ছে। তারা খৃষ্টানদেরকে সবচে' ভয়াবহ যে সহযোগিতাটা দিয়ে রেখেছিল, তা ছিল, অসাধারণ রূপসী যুবতী, অতিশয় বিচক্ষণ ও চতুর নারীর আকারে। সেসব মেয়েকে গুপ্তচরবৃত্তি এবং মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হত।

সুলতান আইউবীকে আরো একটি বাস্তবতা বেশী অস্থির করে রেখেছিল যে, খৃষ্টান সৈন্যরাও তার বিরুদ্ধে সোচ্চার, যাদের উর্ধ্বতন কমান্ডার ও সম্রাটগণ তার বিরুদ্ধবাদী মুসলদানদেরকে উষ্কানী দিয়ে যাচ্ছিল।

এমত পরিস্থিতিতে সুলতান আইউবী অতিশয় সাবধানতার সঙ্গে পা বাড়াচ্ছিলেন। তিনি তার বাহিনীকে অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে বিন্যস্ত করে নেন এবং তাঁর গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনাকে দুশমনদের এলাকায় প্রেরণ করে রাখেন। তাঁর যুদ্ধ পরিকল্পনার মধ্যে বেশী ভরসা ছিল কমান্ডো বাহিনী ও গুপ্তচরদের উপর।

✿ ✿ ✿

হাল্‌বের দূত পৌঁছে গেছে মসুলেও। আল-মালিকুস সালিহ ও তার আমীরগণ মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনের জন্য প্রেরিত পয়গামের সঙ্গে উপহার প্রেরণ করেছিলেন। তাতে তেমনি দু'টি মেয়েও ছিল, যেমনটি প্রেরণ করা হয়েছিল হাররানের দুর্গপতি গোমস্তগীনের নিকট। হাররানে তো দু'জন ভারতীয় সেনাপতি শামসুদ্দীন ও শাদবখত মেয়ে দু'টোকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং সে সূত্রে কাজী ইবনুল খাশিবকে হত্যা করে নিজেরা কয়েদখানায় বন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু মসুলে প্রেরিত মেয়ে দু'টো সাইফুদ্দীনের হাতে পৌঁছে যায় এবং সাইফুদ্দীন তাদেরকে সাদরে বরণ করে নেন। এই দু'টো মেয়ে তার হেরেমের শোভা আরো বাড়িয়ে তোলে। দূত সাইফুদ্দীনকেও সে একই পয়গাম পৌঁছায়, যা পৌঁছিয়েছিল আরেক দূত গোমস্তগীনকে। তাহল, খৃষ্টানরা হাল্‌ববাসীকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে প্রতারণা করেছে। সে কারণে তাদের উপর বেশী আস্থা রাখা যাবে না। তবে তাদের বন্ধুত্ব থেকেও হাত গুটানো ঠিক হবে না। তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করার উত্তম পন্থা হল, আমরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতান আইউবীর উপর হামলা করব। তিনি আলরিস্তানের পর্বতমালায় হামাতের শিং নামক স্থানে অবস্থান করছেন। এ

অবস্থায় যদি আমরা তার উপর হামলা করি, তাহলে খৃষ্টানরা পিছন দিক থেকে তাদের উপর হামলা করবে।

বার্তার সঙ্গে একটি পরিকল্পনাও ছিল। তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আলরিস্তানের বরফ গলছে। গোয়েন্দাদের সংবাদ মোতাবেক বরফের প্রবাহমান পানির তোড়ে সুলতান আইউবীর মোর্চাসমূহ তছনছ হয়ে গেছে। আমরা তিনটি বাহিনী একত্রিত হয়ে তাকে সেই উপত্যকায় অবরুদ্ধ করে অনায়াসে পরাজিত করতে পারি। বার্তায় আরো উল্লেখ করা হয়েছিল, গোমস্তগীনকেও পয়গাম প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করছি, তিনি আমাদের সামরিক জোটে অংশগ্রহণ করবেন। আপনিও সময় নষ্ট না করে জোটে এসে যোগ দিন। তবেই সালাহুদ্দীন আইউবীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা সম্ভব হবে।

বার্তাটা পেয়েই সাইফুদ্দীন তার ভাই ইজ্জুদ্দীন, দু'জন সিনিয়র সেনা অধিনায়ক ও মসুলের স্বনামধন্য খতীব ইবনুল মাখদুম কাকবুরীকে নিয়ে বৈঠকে বসেন।

তিনি সকলকে দূতের বার্তাটা শুনিয়ে বললেন–

'আপনারা আমার এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছেন যে, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর আনুগত্য মেনে নেব না। তার শিরায় যে খুন প্রবাহিত, আমার শিরায়ও সেই একই খুন বিদ্যমান। আপনারা আমাকে শুধু এই পরামর্শ দিন যে, আমরা জোটে যোগ দেব কি-না। আমার ইচ্ছা হল, আমাদের বাহিনী প্রকাশ্যে সম্মিলিত বাহিনীর অধীনে থাকবে। কিন্তু আপনারা লড়াই করবেন আলাদাভাবে। যাতে আমাদের বাহিনী যে যে এলাকা জয় করবে, তার অধিকর্তা আমি ছাড়া কেউ না হতে পারে।'

'আপনি যে সিদ্ধান্ত স্থির করেছেন, তার চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত আর কিছু হতে পারে না। আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।' এক সালার বললেন।

'সালাহুদ্দীন আইউবী খৃষ্টান ও সুদানীদেরকে পরাজিত করতে পারেন– আমাদেরকে নয়।' আরেক সালার বললেন– 'আপনি আপনার বাহিনীকে সম্মিলিত বাহিনীতে যুক্ত করে নিন। কিন্তু কমান্ড রাখুন নিজের হাতে। আমরা আমাদের সৈন্যদের দ্বারা এমনভাবে যুদ্ধ করাব যে, আমাদের বিজয় হাল্‌ব ও হাররানের বাহিনী থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা দেখা যাবে।'

'আমরা আপনার আদেশের সামনে নিজেদেরকে কোরবান করে দেব মাননীয় সম্রাট'– প্রথম সালার বললেন– 'আমরা আপনাকে সেই সালাতানাতে ইসলামিয়ার রাজা বানাব, সালাহুদ্দীন আইউবী যার স্বপ্ন দেখছেন।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর মাথা কেটে আমরা আপনার পায়ে রাখব'– দ্বিতীয় সালার বললেন– 'তার ফৌজ আলরিস্তানের উপত্যকা থেকে জীবিত বের হতে পারবে না। আপনি এখনি রওনা হওয়ার নির্দেশ দিন। বাহিনী প্রস্তুত।'

উভয় সালার একজন অপরজনের চেয়ে নিজের অফাদারী প্রকাশে ব্যাকুল। ইজ্জুদ্দীন চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছেন কখন তার পালা আসবে। খতীব ইবনুল মাখদুম কখনো সালারদ্বয়ের প্রতি, কখনো সাইফুদ্দীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন। আবার কখনো মাথা নত করে বসে থাকছেন।

'ইজ্জুদ্দীন! তোমার মতামত কী বল।' ভাইকে উদ্দেশ করে সাইফুদ্দীন বললেন।

'আমি আপনার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত যে, আমাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে'– ইজ্জুদ্দীন বললেন– 'কিন্তু আমাদের সালারদের এজাতীয় আবেগময় বক্তব্য আমি সমর্থন করি না।' 'আইউবী খৃষ্টান ও সুদানীদের পরাজিত করতে পারেন আমাদেরকে নয়' শুধু এ ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়লেই আইউবীকে পরাজিত করা যাবে না। আমি বরং বলব, যার স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিজেদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী খৃষ্টান সেনাকে পরাজিত করতে পেরেছে, সেই তিনি আপনাকেও পরাজিত করতে পারবেন। যিনি মরুভূমির সৈন্যদের দ্বারা তুষারাবৃত এলাকায় যুদ্ধ করিয়ে চার চারটি দুর্গ জয় করলেন এবং রেমন্ডের বাহিনীকে পিছনে সরে যেতে বাধ্য করলেন, তিনি বরফ গলে যাওয়ার পর আরো ভালভাবে যুদ্ধ করতে পারবেন। আমাদের কোন প্রকার আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হওয়া উচিত হবে না। শত্রুকে কখনো দুর্বল ভাবতে নেই। কিরূপ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এবং কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা করতে হবে, তা আমাদের অনুধাবন করতে হবে।'

ইজ্জুদ্দীন সুলতান আইউবীর সৈনিকদের বৈশিষ্ট্যের বিবরণ প্রদান করেন। তারপর আইউবীর লড়াই করার পদ্ধতি বিবৃত করেন এবং সামনের যুদ্ধটা যে ময়দানে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তার উপর আলোকপাত করে বললেন– 'বরফ গলতে শুরু করেছে। এ বছর বর্ষা শুরু হয়েছে বিলম্বে। সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ তাঁবুতে অবস্থান করছে। কিন্তু উট-ঘোড়া তো আর তাঁবুতে রাখা যায় না। এ সময়ে তার ফৌজের উট-ঘোড়াগুলো গাছের তলে কিংবা গুহায় বাস করছে। উট-ঘোড়া এভাবে সুস্থ্য-সবল থাকতে পারে না। তাছাড়া এই আশাও রাখা যায় যে, আইউবীর সৈনিকরা পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থান করে করে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আমাদেরকে এ

বিষয়টাও নজরে রাখতে হবে যে, আমরা যদি আমাদের বাহিনীকে হাল্‌ব ও হাররানের বাহিনীর সঙ্গে একীভূত করে যুদ্ধ করি, তাহলে আইউবীকে ঘিরে ফেলা সহজ হবে। কিন্তু আমাদেরকে একথা ভুলে গেলে চলবে না, মুসলমান সৈনিক যখন মুসলমান সৈনিকের মুখোমুখি হবে, তখন ইসলামের চিরন্তর আত্মীয়তা তাদেরকে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে পারে। যে তরবারী পরস্পর যুদ্ধ করতে কোষমুক্ত হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হবে, তা অবনমিতও হয়ে যেতে পারে এবং রক্ত না ঝরিয়ে-ই কোষে ফিরে যেতে পারে।'

'ইজ্জুদ্দীন!' –ইজ্জুদ্দীনকে থামিয়ে দিয়ে সাইফুদ্দীন বললেন– 'তুমি একজন সৈনিক মাত্র। তুমি রক্ত, তরবারী আর তরবারীর কোষের কথা ভাবতে পার শুধু। মুসলমান সৈনিককে মুসলমান সৈনিকের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াতে হয়, সেই কৌশল তোমাকে আমার নিকট থেকে শিখতে হবে। আগামী পরশু রমযান শুরু হচ্ছে। সালাহুদ্দীন আইউবী নিজে নামায-রোযার যতটুকু পাবন্দ, ততটুকু পাবন্দী তার সৈন্যদের দ্বারাও করিয়ে থাকেন। যুদ্ধটা যখন শুরু হবে, তখন তার সব সৈন্য রোযাদার থাকবে। আমরা আমাদের সৈন্যদেরকে বলে দেব, যুদ্ধের সময় রোযা রাখার পাবন্দী নেই। মাননীয় খতীব সাহেব তোমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আমি তার পক্ষ থেকে ঘোষণা করিয়ে দেব যে, যুদ্ধের সময় রোযা মাফ। আমরা হামলা করব দুপুরের পর। সকাল বেলা হামলা করলে তখন আইউবীর সৈন্যরা তরতাজা থাকবে। দুপুরের পর আমাদের সৈন্যদের পেটে খাবার থাকবে আর আইউবীর সৈন্যরা থাকবে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। আমি শুধু এটুকু জানতে চাই যে, সালাহুদ্দীন আইউবীর বিপক্ষে লড়াই করার সিদ্ধান্তটা সঠিক কিনা।'

'আপনার এই সিদ্ধান্ত যথার্থ।' এক সালার বললেন।

'আমরা আপনার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করে প্রমাণ দেব, এই সিদ্ধান্ত সর্বদিক থেকেই সঠিক।' আরেক সালার বললেন।

'আমি আপনার সিদ্ধান্তের বিপক্ষে কোন কথা বলিনি'– ইজ্জুদ্দীন বললেন– 'আপনাকে আমি আরো একটি পরামর্শ দেব। আপনি আমাকে রিজার্ভ রেখে দিন। যদি প্রয়োজন পড়ে, তাহলে আমি পরে সময়মত হামলা করব। প্রথম সংঘর্ষের কমান্ড আপনি নিজের হাতে রাখুন।'

'তা-ই হবে'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'বাহিনীকে দু'ভাগে ভাগ করে নাও এবং দ্রুত প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দাও। রিজার্ভ বাহিনীটিকে তোমার কাছে রাখ।'

❁ ❁ ❁

খতীব ইবনুল মাখদুম বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সাইফুদ্দীন তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুচকি হেসে বললেন– 'মহামান্য খতীব! আপনি একাধিকবার কুরআন থেকে ফাল বের করে আমাকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। আপনি মহান আল্লাহর দরবারে আমার নিরাপত্তা ও বিজয়ের জন্য দু'আও করেছিলেন। আপনি জানেন, আমি আপনার অপেক্ষা আর কাউকে বড় বুজুর্গ মনে করি না। মানুষের যদি কোন মানুষকে সেজদা করার অনুমতি থাকত, তাহলে আমি আপনাকে সেজদা করতাম। এ মুহূর্তে আমি এমন এক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছি, যার সফলতার কোন নিশ্চয়তা নেই। আমি একটি শক্তিশালী দুশমনের মোকাবেলায় যাচ্ছি। যুদ্ধে জয় হয়, নয় পরাজয়। আপনি কোরআন থেকে ফাল বের করে আমাকে বলুন, এ যুদ্ধে আমার ভাগ্যে বিজয় লেখা আছে, না পরাজয়।'

'আমীরে মোহতারাম!' –খতীব বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন– 'একথা সঠিক যে, আপনি আমার দ্বারা কয়েকবার কুরআন থেকে ফাল বের করিয়েছিলেন। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী মরহুমের জীবদ্দশায় আপনি একবার একদল ডাকাতকে ধাওয়া করেছিলেন। তখন আমি কুরআন থেকে ফাল বের করে আপনাকে সাফল্যের সুসংবাদ শুনিয়েছিলাম এবং আপনি সফল হয়ে ঘরে ফিরেছিলেন। আপনি যখন খৃষ্টানদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আমি কুরআন থেকে ফাল বের করে আপনাকে বিপদ সম্পর্কে সাবধান করেছিলাম ও কামিয়াবির সুসংবাদ প্রদান করেছিলাম। আল্লাহর শোকর, আমার বের করা প্রতিটি ফাল সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু...।

খতীব প্রথমে ইজ্জুদ্দীনের প্রতি, তারপর সালারদ্বয়ের প্রতি তাকিয়ে বললেন–

'কিন্তু, মসুলের শাসনকর্তা! এবার ফাল বের না করেই আমি আপনাকে বলে দিতে পারব, আপনি যে অভিযানে বের হচ্ছেন, তাতে আপনি জয়লাভ করবেন, নাকি পরাজয়।'

'শীঘ্র বলুন মাননীয় শায়খ!' অস্থির হয়ে সাইফুদ্দিন বললেন।

'আপনি এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করবেন যে, যদি সময়মত পলায়ন না করেন, তাহলে আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবেন' –খতীব বললেন– 'আমার পরামর্শ, এ অভিযানে না আপনি নিজে যাবেন, না ভাইকে প্রেরণ করবেন, না আপনার ফৌজ পাঠাবেন।'

সাইফুদ্দীনের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যায়। ইজ্জুদ্দীন এবং সালারদ্বয়ের

মুখও বন্ধ হয়ে যায়। খতীব সাইফুদ্দীনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে থাকেন।

'আপনি তো কুরআন খুললেনই না'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'কুরআন ছাড়া আপনি ফাল বের করলেন কিভাবে? আমি কিভাবে মেনে নেব যে, আপনি যে দুঃসংবাদ শোনালেন, তা সঠিক?'

'শুনুন মসুলের শাসক!' –খতীব ইবনুল মাখদুম বললেন– 'আমি এতকাল কুবআন থেকে যেসব ফাল বের করে আপনাকে সুসংবাদ শুনিয়ে আসছিলাম, কুরআনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। কুরআন কোন জাদুমন্ত্রের বই নয়। কুরআন ঘোষণা করছে যে, এই কুরআনের যেসব বিধিবিধান রয়েছে, যে ব্যক্তি তা মান্য করবে, সে সফল হবে। আর যে তা অমান্য করবে, সে ব্যর্থ ও পরাজিত হবে। এর আগে আপনি ক্রুশের পূজরীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছিলেন। তখন আমি বলেছিলাম, আপনি কামিয়াব হবেন। তারপর আপনি যখনই যে অভিযানে গিয়েছিলেন, আমি আপনাকে সাফল্যের সুসংবাদ শুনিয়েছি এবং বলেছি, এটা কুরআনের ফাল। প্রতিটি ফালই শুভ ছিল। তার কারণ একটি-ই ছিল যে, আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ ও কর্মকান্ড আল্লাহর বিধানের অনুকূলে ছিল। কিন্তু এখন আপনি যে অভিযানে বের হচ্ছেন, তা আল্লাহর বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন ও বিরোধিতা। আপনি কাফেরদের হাতকে শক্তিশালী করছেন। তাদের সহযোগিতা নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নিবেদিত ঈমানদান লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছেন।'

'আপনি কিসের ভিত্তিতে বলছেন, সালাহুদ্দীন আইউবী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নিবেদিত হয়ে এখানে এসেছেন?'– উত্তেজিত কণ্ঠে সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমি তো বলছি, তিনি একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এসেছেন। আমরা তাঁর এই স্বপ্ন পূরণ হতে দেব না। তাকে এখানে যমে টেনে এনেছে। আমরা প্রথমে তাকে যমের হাতে তুলে দিয়ে তারপর ক্রুশের পূজারীদের খতম করব।'

'অন্তসারশূন্য শব্দমালা দ্বারা আপনি আমাকে ধোঁকা দিতে পারেন– আল্লাহকে নয়'– খতীব বললেন– 'আমাদের কার অন্তরে কী আছে, আল্লাহ পাকের সবই জানা আছে। বিজয় তার কপালেই জুটবে, যে নিজের নফ্সের উপর জয়ী হতে পেরেছে। এ মুহূর্তে আমি আপনাকে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বানী করছি, পরাজয় আপনার কপালের লিখন হয়ে আছে। আপনি যদি ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নেন এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য দাঁড়ান, তবেই শুধু আপনার ললাটের লিখন টলতে পারে।'

'মোহতারাম খতীব!' –ইজ্জুদ্দীন বলে উঠলেন– 'আপনি আপনার ধর্ম আর মসজিদ নিয়ে ব্যস্ত থাকুন। সামরিক বিষয়াবলী ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড আপনি বুঝবেন না। আমি আপনাকে আমাদের মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা না করার পরামর্শ দেব। যুদ্ধজয়ের সব উপকরণই আমাদের আছে, আপনার হয়ত তা জানা নেই।'

'আপনি যদি যুদ্ধকে ধর্ম ও মসজিদ থেকে আলাদা করে লড়াই করেন, তাহলে না হৃদয় আপনার সঙ্গ দেবে, না জযবা'– খতীব বললেন– 'আপনি ঠিকই বলেছেন যে, আমি সামরিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ। কিন্তু আমি এ কথাটা জানি যে, যুদ্ধ শুধু অস্ত্র আর ঘোড়া দ্বারা জয় করা যায় না এবং সেই সামরিক যোগ্যতার বলেও জয় করা যায় না, আপনি যার জন্য গর্বিত এবং যার উপর নির্ভর করে আপনি কুরআনের বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত হচ্ছেন। আরো একটি বিষয় এমন রয়েছে, যা জয়কে পরাজয়ে পরিণত করে দেয়।'

সবাই চকিত নয়নে তাঁর প্রতি তাকিয়ে থাকে। তিনি বললেন–

'যে শাসক চাটুকারিতা পছন্দ করে সে নিজের সঙ্গে দেশ ও জাতিকে নিয়ে একসঙ্গে ডুবে মরে। সে শাসক রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডকে চাটুকার ও দাস মানসিকতাসম্পন্ন লোকদের হাতে তুলে দিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতিকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন ও দাসানুদাস প্রজায় পরিণত করে ছাড়ে। আর এই শাসক যখন ফৌজের কমান্ড চাটুকার সালারদের হাতে তুলে দেয়, তখন দুশমন দেশটাকে হজম করে ফেলে। চাটুকার সেনা অধিনায়ক তার অধীনদের দ্বারা চাটুকারিতা আদায় করে। তারপর দেশ ও জাতির জন্য লড়াই করার পরিবর্তে শাসকের সন্তুষ্টি অর্জন তাদের লক্ষ্যে পরিণত হয়। আমি এই দরবারেই দেখলাম যে, উপস্থিত দু'সালারই আপনার হ্যাঁ-এর সঙ্গে হ্যাঁ মিলাবার কসরত করেছে এবং এমন আবেগময় কথা-বার্তা বলেছে, যা একজন যোদ্ধা বলে না। তারা উভয়ে আপনার সিদ্ধান্ত ও প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছে বটে; কিন্তু আপনাকে সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করেনি। তারা আপনাকে এইকথা জানায়নি যে, খৃষ্টানরা আমাদের সকলকে ঘিরে রেখেছে। আল-আক্সা কাফেরদের দখলে। এমতাবস্থায় ভাল হবে, আপনি গোমস্তগীন ও হাল্বের আমীর প্রমুখ সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট গিয়ে যোগ দিন এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর দুশমন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করুন। আর যদি আপনি-ই সত্য পথের অনুসারী হয়ে থাকেন, তাহলে আইউবীকে মিথ্যুক ও ক্ষমতালোভী প্রমাণ করুন।'

কিন্তু আপনার সালারগণ আপনাকে এরূপ কোন পরামর্শ দেয়নি। তারা আপনাকে একথাও বলেনি যে, সালাহুদ্দীন আইউবী আলরিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলকে ঘাঁটি বানিয়ে তাঁর বাহিনীকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এমনভাবে ছড়িয়ে রেখেছেন যে, আপনি তাকে অবরোধ করার কল্পনাও করতে পারবেন না। তাঁর গেরিলা সেনাদের সম্পর্কে তো আপনি ভালভাবে অবহিত। কিন্তু আপনার সালারগণ আপনার চোখে পট্টি বেঁধে এ বিষয়টাকে আপনার দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে রেখেছে যে, আইউবীর গুপ্তচর ও কমান্ডো সেনারা আপনার অন্তর থেকে তথ্য বের করে নিয়ে যেতে পারে এবং আপনার চোখে ধূলি দিয়ে আপনার হেরেমের মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে যেতে পারেন। আপনার ফৌজ এখান থেকে রওনা হওয়া মাত্র আইউবী তাদের গতিবিধি, সংখ্যা ও গন্তব্য জেনে ফেলবেন।'

'মহামান্য সুলতান!'– এক সালার ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন– 'আমরা কি এভাবেই আপনার অপমান সহ্য করে যাব? মসজিদে বসে রাত-দিন আল্লাহ আল্লাহ জিকিরকারী দরবেশ আমাদের গুরু হওয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে! ইনি আমাদের সামনে আপনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচারণ করে আপনাকে অপমান করছেন। আমরা এটা সহ্য করতে পারিনা।'

'আমাকে শুনতে দাও'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমি আমার মোহতারাম খতীবকে এখনো সম্মানের চোখেই দেখছি।'

'বলুন মুহতারাম খতীব!'– 'অবজ্ঞার সুরে ইজ্জুদ্দীন বললেন– 'শেষ পর্যন্ত আপনাকে একথাও বলতে হবে, আপনার আনুগত্য কার প্রতি। আমাদের প্রতি, নাকি সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতি।'

'আমার আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেল প্রতি'– ইজ্জুদ্দীনকে উদ্দেশ করে খতীব বললেন– 'আমি আপনার প্রশংসা করব যে, আপনি আপনার ভাইকে দু'-চারটা সত্য কথা শুনিয়েছেন। বাদবাকী কথা আপনিও চোখ-দেমাগ বন্ধ করে বলেছেন। ইমামুদ্দীনও তো আপনার ভাই। আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর সুহৃদ কেন এবং কেন আপনার সহযোগিতায় এগিয়ে আসছেন না?'

'আপনি আমাদের পারিবারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না'– ইজ্জুদ্দীন বললেন– 'আপনি আসলে প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, সালাহুদ্দীন আইউবী খোদার পয়গাম্বর এবং আমাদের সকলকে তাকে সেজদা করতে হবে। আপনাকে শুধু বলা হয়েছিল, কুরআন থেকে ফাল বের করে বলুন আমাদের এই অভিযান সফল হবে না ব্যর্থ।'

'কুরআন তার বিধি-বিধান স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছে'– জোরালো কণ্ঠে খতীব বললেন– 'আমি আপনাদের সম্মুখে বাস্তব সত্যটা খোলাখুলি ব্যক্ত করেছি। সালাহুদ্দীন আইউবী খোদার প্রেরিত পয়গাম্বর নন। তিনি একটি ঝড়, একটি স্রোত, যা কুফরকে শুষ্ক তৃণলতার ন্যায় ভাসিয়ে নেয়ার জন্য দামেস্ক থেকে উঠে এসেছে। আপনারা সবাই বৃক্ষের ভেঙ্গে পড়া ডাল, যার পাতাগুলো একে একে ঝরে পড়ছে আর সেই স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে। আইউবী আপনাদের উপর চড়াও হননি– আপনারাই-ই বরং তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। আপনাদের পরিণতি তা-ই হবে, যা স্রোতের মুখে পড়া পত্র-পল্লবের হয়ে থাকে।'

'খতীব!'– সাইফুদ্দীন গর্জে উঠে বললেন– 'অনুগ্রহপূর্বক আমার অন্তর থেকে আপনার মর্যাদাবোধ বের করে ফেলবেন না।'

'তুমি... সাইফুদ্দীন!'– গম্ভীর কণ্ঠে খতীব বললেন– 'তুমি পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র ভূখন্ডটির রাজা। ভয় কর সেই সত্ত্বাকে, যিনি উভয় জগতের বাদশাহ। আমাকে তোমার শ্রদ্ধা করার প্রয়োজন নেই। তুমি আমার মুখে থু থু নিক্ষেপ কর; তবু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ থেকে সরে যেও না। তোমার উপর রাজত্বের নেশা চেপে বসেছে। এই আত্মমর্যাদাহীন সালার এবং তোমার প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ তোমাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তোমাকে রাজা বানিয়েছে। তুমি বুঝছ না যে, এটা নিছক চাটুকারিতা এবং তুমি রাজা নও। তুমি জান না, এই চাটুকার লোকগুলো তোমার শত্রু, জাতি ও দেশের দুশমন। যখন তোমার পতন ঘনিয়ে আসবে, তখন এরা তোমাকে চিনতেও অস্বীকার করবে এবং সেই ব্যক্তির পাপোষ চাটবে, যে তোমার সিংহাসনে বসবে। আমার প্রতি ক্রুদ্ধ চোখে দৃষ্টিপাত কর না সাইফুদ্দীন! জাহান্নামে ঠিকানা নিও না। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। এই গোলাম মানসিকতার লোকগুলো বহু প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাহকে ভিখারীতে পরিণত করেছে। ইতিহাস বলছে, এমনটি অতীতেও হয়েছে এবং হতে থাকবে। দুঃখ হল, রাসূলের উম্মতও এই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে।'

'লোকটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও'– ক্ষোভ-কম্পিত কণ্ঠে গর্জে উঠলেন সাইফুদ্দীন– 'একে এমন জায়গায় আবদ্ধ করে রাখ, যেখান থেকে এর কণ্ঠ আমার কানে এসে না পৌঁছে।'

এক সালারের ডাকে দু'জন দেহরক্ষী ভিতরে প্রবেশ করে। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হল, খতীবকে কয়েদখানায় নিয়ে যাও।

খতীব ইবনুল মাখদুমকে যখন দু'বাহুতে ধরে কয়েদখানা অভিমুখে নিয়ে

যাওয়া হচ্ছিল, তখন সাইফুদ্দীন তার কণ্ঠ শুনতে পান–

'রাজত্বের মোহ মানুষকে দ্বীন থেকে সম্পর্কহীন করে তোলে। তোষামদপ্রিয় শাসক জাতিকে বিক্রি করে খায়। কাফেরের বন্ধুত্ব শত্রুতা অপেক্ষা বেশী ক্ষতিকর। ফিলিস্তীন আমাদের। ফিলিস্তীন আমার রাসূলের। কাফেররা তোমাদেরকে পরস্পর এজন্য যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছে, যাতে ফিলিস্তীনের উপর তাদের দখল অটুট থাকে। তোমরা যদি আপসে লড়াই করতে থাক, তাহলে প্রথম কেবলা তোমাদেরকে অভিশম্পাৎ করতেই থাকবে।'

খতীব ইবনুল মাখদুমকে টেনে-হেঁচড়ে কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তিনি চিৎকার করে এ কথা বলছেন। বহু সৈনিক বাইরে বেরিয়ে আসে এবং মুহূর্তের মধ্যে দাবানলের ন্যায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, 'খতীব ইবনুল মাখদুম পাগল হয়ে গেছেন এবং তাকে কয়েদখানায় আটকে রাখা হয়েছে।'

সংবাদটা শহরময় ঘুরেফিরে খতীবের বাসগৃহের দরজায় গিয়ে আছড়ে পড়ে। ঘরে আছে খতীবের ষোড়শী এক কন্যা। ঘরে পিতা-কন্যা দু'জনই বাস করতেন। মেয়েটা খতীবের একমাত্র সন্তান। তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। তিনি পরে আর বিয়ে করেননি। এভাবেই বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন বলে তিনি মনস্থির করেছিলেন।

'আশ-পাশের বহু মহিলা খতীবের ঘরে এসে ভীড় জমায়। পরিবারটা সকলের শ্রদ্ধাভাজন। মহিলারা খতীবের কন্যার নিকট জানতে চায়, তোমার পিতার হঠাৎ করে কী হয়ে গেল? তিনি কি সত্যই পাগল হয়ে গেছেন?'

'এমন হওয়ারই কথা ছিল'– মেয়ে বলল– 'এমনটা হওয়ারই কথা ছিল।' তার কণ্ঠে গাম্ভীর্য। ভয়-ভীতির লেশ মাত্র নেই। যত মহিলা তার ঘরে এসেছে, প্রত্যেককে সে একই জবাব দিয়েছে– 'এমনটা হওয়ার-ই কথা ছিল।'

মসুলে খতীবকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হয়েছে। হাররানে দু'সেনা অধিনায়ক শামসুদ্দীন ও শাদবখতকে গোমস্তগীন বন্দী করে রেখেছেন। গোমস্তগীন এ-ই প্রথমবার জানতে পারলেন যে, তার এই দু'সালার মূলত সালাহুদ্দীন আইউবীর লোক এবং গোয়েন্দা। দু'জন আটক হওয়ার পর গোমস্তগীন রাতে কয়েদখানায় যান এবং তাদেরকে ওখান থেকে বের করে সে কক্ষে নিয়ে যান, যেখানে আসামীদের মুখ থেকে তথ্য বের করার সব ধরনের ব্যবস্থা বিদ্যমান। ওখানে দু'জন লোককে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যে, তাদের উভয় বাহু রশি দ্বারা ছাদের সঙ্গে বাঁধা, পা দু'টো মাটি থেকে কয়েক

ফুট উঁচুতে এবং পায়ের গোড়ালীর সঙ্গে অন্তত দশ সের ওজনের লোহা ঝুলানো। প্রচন্ড শীতের মধ্যেও তাদের সমস্ত শরীর ঘামে জবজবে হয়ে আছে। তাদের বাহু ছিঁড়ে কাঁধ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে যেন। জায়গাটায় রক্ত ও পঁচা-গলা লাশের দুর্গন্ধে এক অসহনীয় পরিবেশ বিরাজ করছে।

'এদেরকে দেখে নাও'– গোমস্তগীন দু'ভাইকে উদ্দেশ করে বললেন– 'এই বন্দীশালায় আসার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা আমার সেনাবাহিনীর মালিক ছিলে। এখন কর্মদোষে এখানে এসে স্থান নিয়েছ। তোমরা গাদ্দার। তোমরা আমার আস্তিনের তলে সাপ হয়ে পালিত হয়েছিলে। তবে আমি তোমাদেরকে এখনো ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত আছি। তোমরা আমাকে শুধু বলে দাও, যে দু'টো মেয়েকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছ এবং তাদের সঙ্গে আরো যে দু'জন পুরুষ গিয়েছে, তারা কোথায় গেছে এবং এখান থেকে কি কি তথ্য নিয়ে গেছে। জবাবে শামসুদ্দীন ও শাদবখত মুচকি হাসি দিয়ে চুপ করে থাকেন। গোমস্তগীন বললেন– 'তারা সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট গেছে। কী, মিথ্যা বললাম? শামসুদ্দীন ও শাদবখত কান দিলেন না। গোমস্তগীন বললেন– এই দু'জনকে দেখে নাও। এরা যুবক বলে এখনো সহ্য করতে পারছে। তোমাদেরকে যদি এভাবে ঝুলিয়ে পায়ে বিশ সের ওজন বেঁধে দেই, তাহলে অল্পক্ষণের মধ্যেই বক্ষ উন্মুক্ত করে আমার সামনে রেখে দেবে। কিন্তু আমার পরামর্শ, এসব বাদেই তুমি আমাকে সব বলে দাও।'

'তারা কোন তথ্য নিয়ে যায়নি'– শামসুদ্দীন বললেন– 'এখানে কোন তথ্য নেই। তোমার ব্যাপারে সালাহুদ্দীন আইউবী ভাল করেই জানেন যে, তুমি খৃষ্টানদের সহযোগিতা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছ। আইউবী পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই তোমাদেরকে পরাজিত করতে এসেছেন। এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার মত কোন তথ্য নেই। তথ্য শুধু এতটুকু ফাঁস হয়েছে যে, আমরা দু'ভাই তোমার ফৌজের সালার ছিলাম। তুমি আমাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করতে। অথচ আমরা আসলে আইউবীর লোক।'

'অপর তথ্যটিও আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি'– শামসুদ্দীনের ভাই শাদবখত বললেন– 'দু'টি মুসলিম মেয়ে উপহার স্বরূপ তোমার কাছে এসেছিল। ঘটনাক্রমে আমরা জানতে পারলাম, তারা মজলুম এবং মুসলমান। তোমার কাজী ইবনুল খাশিব তোমার আগেই তাদেরকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমরা তাদেরকে নিজ কন্যা মনে করে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছি এবং কাজী ইবনুল খাশিব আমাদের জন্য এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন যে, তাকে খুন

করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। তুমি ঘটনাটা জেনে ফেলেছ এবং আমাদেরকে গ্রেফতার করে বন্দী করে ফেলেছ। আমরা যদি ধরা না পড়তাম, তাহলে আমাদের পরিকল্পনা ছিল, যখন তুমি আমাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করতে, আমরা গোটা বাহিনীটিকে সুলতান আইউবীর বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে যেতাম এবং তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ করে তোমাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতাম। দুঃখ, আমাদের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল না।'

'তারপরও আমরা সফল'– শামসুদ্দীন বললেন– 'তুমি আমাদেরকে মৃত্যুদন্ড দিয়ে দাও। আমাদেরকে ছাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে আমাদের পায়ের সঙ্গে বিশ বিশ সের ওজনের পাথর বেঁধে দাও। আমাদের বাহু কাঁধ থেকে আলাদা করে ফেল। আমরা কষ্ট অনুভব করব না। আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য তীর ফুলে পরিণত হয়ে যায়। তাদের দেহ নিঃশেষ হয়ে যায়; আত্মা মরে না। আল্লাহর পথের পথিকের আত্মা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় বস্তু।'

'আমি তোমাদের ওয়াজ শুনতে আসিনি'– গোমস্তগীন বললেন– 'ওহে বিশ্বাসঘাতকরা! তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট কী গোপন তথ্য প্রেরণ করেছ বল।'

'তুমি আমাদেরকে বিশ্বাসঘাতক বলছ'– শামসুদ্দীন বললেন– 'এটাই আসল তথ্য, যা তুমি গোপন করতে চাচ্ছ যে, গাদ্দার কে? অনাগত বংশধরদের নিকট থেকে তুমি এ তথ্য গোপন করতে পারবে না যে, তুমি গাদ্দার। ইতিহাস চীৎকার করে করে বলবে, সালাহুদ্দীন আইউবী ফিলিস্তীনকে খৃষ্টানদের কবল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মাঠে নেমেছিলেন; কিন্তু গোমস্তগীন নামক একজন মুসলিম দুর্গপতি তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।'

'তোমরা যদি এতই পাকা মুসলমান হতে, তাহলে হিন্দুস্তানকে হিন্দুদের হাতে তুলে দিয়ে নুরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট পালিয়ে আসতে না'– গোমস্তগীন অবজ্ঞার সুরে বললেন– 'তোমরা গোলাম দেশ থেকে এসেছ।'

'হিন্দুস্তানকে হিন্দুদের হাতে আমরা তুলে দেইনি'– শাদবখত বললেন– 'ওখানেও তোমাদের মত কিছু মুসলমান ছিল, যারা হিন্দুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পেতেছিল এবং তোমাদের-ই ন্যায় রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছিল। রাজত্বের নেশা তাদেরকে পেয়ে বসেছিল। সে সুযোগে হিন্দুরা মুসলমানদের পরাজিত করে হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। দেশের ভাগ্য যদি সেনা অধিনায়কদের হাতে থাকত, তাহলে আজ হিন্দুস্তান আরবের ভূখন্ডের সঙ্গে মিলিত থাকত। কিন্তু সেখানে সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্রনায়করা নিজেদের গোলাম বানিয়ে নিয়েছিল।'

'ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে আরো দু'দিন সময় দিলাম'– গোমস্তগীন বললেন– 'আমার প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব যদি পেয়ে যাই, তাহলে এই নরক থেকে বের করে আমি তোমাদেরকে তোমাদের ঘরে নজরবন্দী করে রাখব। তবে যদি আমাকে নিরাশ কর, তাহলে তোমাদেরকে আমি মৃত্যুদন্ড দেব। তোমরা এই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পঁচে-গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তোমরা ভেবে দেখ।'

গোমস্তগীন তার দুর্গে খৃষ্টান উপদেষ্টা নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাদেরকে জানালেন, তাদের যে বন্ধু খুন হয়েছে, সে কারো ষড়যন্ত্রের শিকার হয়নি। বরং সে হেরেমের একটি মেয়ের হাতে খুন হয়েছে। গোমস্তগীন তাকে অবহিত করেন, আমি কাজী ইবনুল খাশিবের খুন ও বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে আমার দু'জন সালারকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করেছি। তিনি উপদেষ্টার নিকট থেকে পরামর্শ কামনা করেন, সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে এখনই অভিযান পরিচালনা করব কিনা।

'আমি জানি না সালারদ্বয় কি কি তথ্য সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট সরবরাহ করেছে'– গোমস্তগীন বললেন– 'প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক প্রস্তুতি নেয়ার আগেই আমাদের হামলা করা উচিত। এ পরিস্থিতিতে আমাকে আপনাদের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।'

খৃষ্টান উপদেষ্টাগণ গোমস্তগীনকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে বলল, আজ রাত-ই আমরা খৃষ্টান ক্যাম্পে লোক পাঠাব।'

সে রাতেই এক খৃষ্টান দূত রওনা হয়ে যায়।

মসুলে খতীব ইবনুল মাখদুম কয়েদখানার একটি প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ। তার যুবতী কন্যা– যার নাম সায়েকা– ঘরে একাকী পড়ে আছে। মহিলারা দিনভর তার নিকট আসা-যাওয়া করছে আর সে সবাইকে বলছে– 'এমনটা হওয়ার-ই কথা।' কিন্তু কথাটার অর্থ কী, মহিলারা গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেনি। তবে দু'টি যুবতী মেয়ে বিষয়টা লক্ষ্য করে। তাদের মনে সন্দেহ জাগে।

রাতের বেলা। সায়েকার ঘরে আর কেউ নেই। মেয়ে দু'টো ঘরে প্রবেশ করে। সায়েকা তাদেরকে ভালভাবে চিনে না।

'আচ্ছা, সারাক্ষণ তুমি একথা কী বলছ যে, 'এমনটা হওয়ার-ই কথা?' এক মেয়ে বলল।

'আল্লাহর সিদ্ধান্ত এমনই ছিল'– সায়েকা জবাব দেয়– 'আমি এ ছাড়া আর কী বলতে পারি?'

কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করে। শেষে অপর মেয়ে বলল– 'তুমি কথাটার মর্ম বুঝিয়ে বল, দেখি, আমরা তোমার কোন উপকার করতে পারি কিনা।'

'আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ আমার সাহায্য করতে পারবে না'– সায়েকা বলল– 'আব্বাজান কোন অন্যায় করেননি। তিনি সব সময় সত্য কথা বলে থাকেন। সম্ভবত তিনি মসুলের শাসনকর্তাকে কোন কড়া কথা শুনিয়েছেন। সেজন্যই আমি বলছি, এমনটা হওয়ারই কথা। কেননা, তিনি তোষামোদ করবার মত মানুষ নন।'

'তিনি আসলে কী বলেছেন বা কী করেছেন, আল্লাহ-ই ভাল জানেন'– অপর মেয়ে বলল– 'আমার মনে হচ্ছে, তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর পক্ষে কথা বলেছেন। তবে তিনি আসলে কার সমর্থক, তুমি-ই ভাল জান।'

'তোমরা যাকে সত্য মনে কর, তিনি তার সমর্থক'– সায়েকা মুচকি হেসে বলল এবং জিজ্ঞেস করল– 'তোমরা কাকে সমর্থন কর?'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর!' উভয় মেয়ে বলল।

'আব্বাজানও আইউবীর সমর্থক'– সায়েকা স্পষ্ট বলে দিল– 'বিষয়টা সম্ভবত সাইফুদ্দীন জেনে ফেলেছেন।'

'তিনি কি আইউবীকে শুধু মৌখিকভাবে সমর্থন করেছেন, নাকি কাজেও?' এক মেয়ে জিজ্ঞেস করে।

'আচ্ছা, তোমরা কি গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছ?'– সায়েকা হঠাৎ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করে– 'মসুলের তরুণ প্রাণগুলোকে কি কাফেরদের পক্ষে চলে গেল?'

'হ্যাঁ'– এক মেয়ে জবাব দেয়– 'আমরা দু'জনে গুপ্তচরবৃত্তি করতে এবং তোমাকে এই নিশ্চয়তা দিতে এসেছি যে, মসুলের যুবকরা কাফেরদের সমর্থক নয়। তারা কাফেরদের পদতল থেকে আরবের মাটিকে উদ্ধার করার জন্য অস্থির। তারা তাদের মিশনে সফল হতে বদ্ধপরিকর। তুমি যে বলতে, এমনটা হওয়ার-ই কথা ছিল– একথার অর্থ আমরা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেনি। এথেকেই তুমি আমাদেরকে আন্দাজ করে নিতে পার। আমরা তোমার কথা থেকেই বুঝে ফেলেছি, তোমার পিতা সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থক ছিলেন এবং সাইফুদ্দীন বিষয়টা জেনে ফেলেছেন।'

দীর্ঘ আলাপ ও মতবিনিময়ের পর সায়েকা নিশ্চিত হয়, মেয়ে দু'টো তাকে ধোঁকা দিচ্ছে না। সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, আমি কী করতে পারি এবং

তোমরা আমার কী সহযোগিতা করবে?

'প্রথমে জানতে হবে, মোহতারাম খতীবকে কয়েদখানায় কষ্ট দেয়া হচ্ছে কিনা'– এক মেয়ে বলল– 'যদি তিনি নির্যাতনের সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তাহলে তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে।'

'কয়েদখানায় তাঁর সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হচ্ছে, তা জানব কী করে?' সায়েকা জিজ্ঞেস করে।

'আমরা চেষ্টা করব'– অপর মেয়ে বলল– 'তুমি মসুলের শাসনকর্তার নিকট গিয়ে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আবেদন জানাও। তিনি যদি অনুমতি না দেন, তাহলে অন্য ব্যবস্থা নেব।'

'আমি কাল সকালেই যাব'– সায়েকা বলল– 'আমি তাকে একথাও জিজ্ঞেস করব, আমার পিতার অপরাধ কী?'

'মেয়েরা চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ তাদের মনে পড়ে যায়, সায়েকা ঘরে একা। তারা সায়েকাকে বলল, রাতে তুমি আমাদের সঙ্গে থাক। কিন্তু সায়েকার মনে কোন ভয় নেই। তবু মেয়েরা নিজ নিজ পরিবারের নিকট বলে সায়েকার ঘরে ঘুমাতে আসে।

শীতকাল। তিনজন এক কক্ষে শুয়ে পড়ে। মধ্যরাতের পর এক মেয়ে বাথরুমে যাওয়ার জন্য বাইরে বের হয়। সে দেখতে পায়, ঘরের বাইরে কালোমত একটি ছায়া নড়াচড়া করতে করতে কোন দিকে যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। মেয়েটির গা ছমছম করে ওঠে। সে দ্রুত ঘরে ফিরে গিয়ে বান্ধবীকে জাগিয়ে তোলে এবং ঘটনাটা জানায়। তাদের দু'জনেরই কাছে খঞ্জর ছিল। তারা কক্ষ থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে এদিক-ওদিক তাকায়। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

তারা সায়েকাকে জাগায়নি। কিন্তু সায়েকার চোখ খুলে গেছে। বিছানা থেকে উঠে বান্ধবীদেরকে কক্ষে না পেয়ে বারান্দায় গিয়ে ডাক দেয়। তারা এগিয়ে এসে বলে, এই, বাইরে কালোমত একটি ছায়া নড়াচড়া করছে! মানুষ-টানুষ কিনা কে জানে।

ধুত্তুরি, আস তো শুয়ে থাকি'– সায়েকা বলল– 'ওসব কিছু না। তুমি যখনই বের হবে, এরকম কিছু নড়াচড়া করতে দেখবে। দৌড়ে গিয়ে ছায়াকে খঞ্জর দ্বারা আঘাত কর না আবার।'

'ছায়া বলছ কেন?'– এক মেয়ে বলল– 'ওটা তো মানুষ। আমি দেখেছি।'

'যা হয় হোক, ওসব আমি ভয় করিনা'– সায়েকা বলল– 'তোমরাও ভয় করনা।'

সায়েকার এসব কথায় মেয়ে দু'টোর গা ছমছম করে ওঠে। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়। তারা মানুষকে ভয় করে না। সায়েকার কথা অনুযায়ী যদি ওটা মানুষ না হয়, তাহলে জিন-ভূত তো নিশ্চয়। সায়েকা বলল– 'এটা আমার আব্বাজানের ছায়া। তোমরা তাদেরকে জিন-ই মনে কর। আমি কখনো তাদের কাছে যাইনি। আমার বিশ্বাস, তারা আমার নিরাপত্তার জন্য ঘরের চারপাশে ঘোরা-ফেরা করছে।'

'খতীব সাহেব বড় বুজুর্গ মানুষ'– এক মেয়ে বলল– 'জিনদের মধ্যেও তার ভক্ত আছে।'

'ব্যাপারটা এমনই'– সায়েকা বলল– 'ওদেরকে ভয়ও করনা, ওদের কাছেও যেও না।'

❁ ❁ ❁

সেই রাত। খতীব ইবনুল মাখদুম সাইফুদ্দীনের বন্দীশালায় আবদ্ধ। তিনি এখনো জানে না, তাঁর সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হবে। এক সান্ত্রী তাঁর কক্ষের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে। খতীব তাকে থামিয়ে বললেন– 'আমার এক কপি কুরআন প্রয়োজন। জেলখানায় কুরআন শরীফ আছে নিশ্চয়।'

'এখানে? ...কুরআন?'– সান্ত্রী বিস্ময় ও অবজ্ঞার সুরে বলল– 'কুরআন পাঠকারীরা এখানে আসে না। এটা জাহান্নাম। এখানে আসে পাপিষ্ঠরা। আপনি ঘুমিয়ে থাকুন।'

সান্ত্রী হেঁটে সামনের দিকে চলে যায়।

খতীব কুরআনের হাফেজ ছিলেন না। তবে অনেক সূরা ও আয়াত মুখস্ত ছিল। তিনি উচ্চস্বরে সূরা আর-রাহমান তেলাওয়াত শুরু করলেন। খতীবের সুললিত কণ্ঠ গোটা কয়েদখানাকে মাতিয়ে তোলে। তেলাওয়াত শেষ করার পর তিনি দেখলেন, উর্দি পরিহিত এক জেল কর্মকর্তা বিমুগ্ধ মুখে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে।

'তুমি কে?'– কর্মকর্তা খতীবকে জিজ্ঞেস করলেন– 'আমি ছয় বছর যাবত এই জেলখানায় চাকরি করছি। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত এবং এই সুর এ-ই প্রথমবার শুনলাম, যা আমার হৃদয়ে গেঁধে গেছে। আমি কুরআন পড়া জানি না। অথচ, এটি আমার মাতৃভাষায় লেখা গ্রন্থ।'

'আমি মসুলের খতীব।' খতীব জবাব দেন।

'আপনার অপরাধ?' কর্মকর্তা বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করেন।

'আমার অপরাধ হল, আমি কুরআনের ভাষায় কথা বলি'– খতীব জবাব

দেন– 'আমার অপরাধ, আমি আমার রাজার আদেশ অমান্য করেছি এবং কুরআনের বিধানকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।'

'আবার পড়ুন'– কর্মকর্তা অনুরোধের সুরে বললেন– 'আমার ভিতরে কিছু বিষ আছে, কুরআনের ভাষা ও আপনার সুর যাকে বের করতে শুরু করেছে।'

খতীব পূর্বের চেয়ে অধিক হৃদয়কাড়া সুরে আবারো সূরা আর-রাহমান তেলাওয়াত শুরু করেন। কর্মকর্তা কক্ষের জানালার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছেন। তার দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তেলাওয়াত শেষে খতীব থামলে কর্মমর্তা চক্ষু বন্ধ করে ভাঙ্গা গলায় ক্ষীণ কণ্ঠে সূরা আর-রহমানের দু'একটি আয়াত আবৃত্তি করতে শুরু করেন।

আপনার কণ্ঠে যখন এত যাদু, তো আপনার ভক্তদের মধ্যে জিনও আছে নিশ্চয়'– কর্মকর্তা বললেন– 'আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমি শুনেছি, কুরআন থেকে নাকি ফাল বের করা যায়। বিশেষ পন্থা অবলম্বন করে প্রশ্ন করলে নাকি জিনরা কুরআনের ভাষায় জবাব দেয়?'

কিন্তু প্রশ্ন হল, তোমার প্রশ্নটা কী?'– খতীব বললেন– 'কুরআন শুধু ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে থাকে।'

'আর যার ঈমান পাকা নয়?' কর্মকর্তা প্রশ্ন করেন।

'তার বক্ষে ঈমানের প্রদীপকে আলোকিত করে'– খতীব বললেন– 'তোমার প্রশ্নটা বল।'

'আমার একটি আকাংখা আছে'– কর্মকর্তা বললেন– 'আমার বুকে আগুন জ্বলছে। জানি না, এটা ঈমানের দীপশিখা, নাকি প্রতিশোধের আগুন। যে ফৌজ জেরুজালেম উদ্ধার করতে মাঠে নেমেছে, আমি সে ফৌজে যোগ দিতে চাই। আমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে।'

'জেরুজালেম জয় করাকে যদি তুমি ঈমান মনে করে থাক, তাহলে শীঘ্রই তুমি সেখানে পৌঁছে যাবে'– খতীব বললেন– 'প্রতিশোধ ব্যক্তিগত কাজ। ঈমান আল্লাহর নির্দেশ। আচ্ছা, তুমি কিসের প্রতিশোধ নেয়ার কথা বলছ? আর জেরুজালেম বলছ কেন?– বাইতুল মুকাদ্দাস বল।'

'আমি এর আগে কখনো কোন কয়েদীর সঙ্গে এরূপ কথা-বার্তা বলিনি'– জেল কর্মকর্তা বললেন– 'আপনি খতীব। আমি আমার হৃদয়টা খুলে আপনার সম্মুখে রাখতে চাই। আমার আত্মার প্রশান্তি প্রয়োজন। আমি বাইতুল মোকাদ্দাসের বাসিন্দা। ওখানে খৃষ্টানদের শাসন চলছে। ওখানে মুসলমানদের সঙ্গে বকরী-ভেড়া ও পশুর ন্যায় আচরণ করা হয়। খৃষ্টানরা যে মুসলমানকে

ইচ্ছা খুন করে, যাকে খুশি কারাগারে নিক্ষেপ করে। বেগার খাটানোর প্রচলন তো ব্যাপক। যে পরিবারে যুবতী মেয়ে আছে, সে পরিবারের মুখ সব সময় শুষ্ক থাকে। ওখানকার মুসলমানরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পথপানে তাকিয়ে আছে। সাত বছর আগের ঘটনা। একদিন এক খৃষ্টান আমাকে ধরে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। কিছু মাল-পত্র মাথায় করে তার ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে বলে। কিন্তু আমি অস্বীকার করি। সে আমার মুখের উপর প্রচন্ড একটা চপেটাঘাত করে বলল, হারামজাদা! মুসলমান হয়ে আমার আদেশ অমান্য করার দুঃসাহস দেখাচ্ছিস! আমি রাগের মাথায় তার মুখে একটা ঘুষি মারি। লোকটা মাটিতে পড়ে যায়। আমি তার মাথার চুলগুলো মুঠি করে ধরে টেনে দাঁড় করাই এবং আরেকটি ঘুষি মেরে আবারো ফেলে দেই।'

'এমন সময়ে পিছন থেকে কে যেন আমাকে ঝাপটে ধরে। পরক্ষণেই চারদিকে খৃষ্টানরা এসে ভীড় জমায়। সংবাদ পেয়ে পুলিশও ধেয়ে আসে এবং আমাকে বেগার ক্যাম্পে নিয়ে যায়। আমি সেখানে তিনদিন অতিবাহিত করি। তৃতীয় রাতে আমি এক সান্ত্রীকে পিছন থেকে ঝাপটে ধরে খঞ্জরের আঘাতে তাকে কাবু করে পালিয়ে যাই। পরিকল্পনা ছিল, ঘরে পৌঁছে রাতেই পরিবারের সকলকে নিয়ে বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে পালিয়ে যাব। অন্যথায় ধরা পড়ে যাওয়ার আশংকা প্রবল। কিন্তু ততক্ষণে আমার বাড়ীটা ধ্বংসস্তূপ। সব জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে আছে। আমি এক মুসলিম পরিবারের দরজায় করাঘাত করি। গৃহকর্তা ভয়ে ভয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার পরিবারের লোকজন কোথায়? আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে তিনি আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে ফেললেন। তিনি বললেন– 'তোমার পরিবারের পুরুষদেরকে খৃষ্টানরা ধরে নিয়ে গেছে। তোমার দু'কুমারী বোনকে খৃষ্টান সেনারা নিয়ে গেছে। শেষে তারা আগুন দিয়ে ঘরটাকে জ্বলিয়ে দিয়ে গেছে।'

'তখন আমার মানসিক অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিল, আপনি তা আন্দাজ করতে পারবেন। আমি জানতাম, আমি আমার বোনদেরকে ফিরে পাব না এবং এখানে বেশী সময় অবস্থান করলে আমি ধরা পড়ে যাব এবং খৃষ্টানরা আমাকে মেরে ফেলবে বা কয়েদখানায় আটক করে রেখে আজীবন নির্যাতন চালাতে থাকবে। কোন মুসলিম পরিবারের ঘরে লুকাবার মত ভুলও আমি করতে পারছিলাম না। কেননা, তার পরিণতিতে সেই পরিবারটা ধ্বংস হয়ে যেত। তাই আমি রাতেই বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে বেরিয়ে আসি। আমার জখম থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। কিন্তু আমি নিরুপায়। ভোর বেলা পথে এক অশ্বারোহী খৃষ্টানের সঙ্গে

দেখা। লোকটা সাধারণ নাগরিক। আমি তার পথ আগলে দাঁড়াই এবং কথার ফাঁদে ফেলে তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নীচে নামাই। তার এক পা ঘোড়ার রেকাবে, অপর পা মাটিতে- এমন অবস্থায় আমি পেছন দিক থেকে তার ঘাড়টা দু'বাহু দ্বারা ঝাপটে ধরি। তার কোমরে ছোট আকারের একটি তরবারী বাঁধা ছিল। সেটি কেড়ে নিয়ে আমি তাকে খুন করি এবং তার ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত অগ্রসর হতে শুরু করি।'

'এ নিয়ে আমি দু'জন খৃষ্টানকে হত্যা করলাম। তার আগে কয়েদখানায় সান্ত্রীকে হত্যা করে এসেছি। কিন্তু আমার মন শান্ত হল না। আমি সকল খৃষ্টানকে হত্যা করার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। এ অবস্থায় আমি কত সময় পথ চললাম এবং কোথায় কোথায় ঘুরে ফিরলাম, তা আমার স্মরণ নেই। এত দীর্ঘ সময়ে না আমার পেটে ক্ষুধা লাগল, না পিপাসা। একটু পরপর আমার বোনদের কথা মনে পড়ত আর আমি তারবারীটা হাতে নিয়ে বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকতাম। আমার গা কাঁপতে শুরু করত। আমি বেশ ক'বার আল্লাহকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাকে কোন্ পাপের শাস্তি দিচ্ছ? যদি আমি গুনাহ্গার হয়ে থাকি, তাহলে শাস্তি তো শুধু আমার পাওয়া দরকার। বোন এবং অবুঝ ভাইটির তো কোন পাপ ছিল না।' কিন্তু আল্লাহ আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। আমি সেজদাবনত হয়ে আল্লাহকে ডেকেছি এবং নিরাশ হয়েছি। আমি আল্লাহর সমীপে এ ফরিয়াদও করেছি যে, 'তুমি আমাকে শান্ত করে দাও এবং আমার অন্তরের প্রতিশোধের আগুন নিভিয়ে দাও। আমার অনুভূতি মরে যাক।'

'আমি মসুলের এমন একটি জায়গায় এসে পৌঁছে গেলাম, যেখানে আর খৃষ্টানদের হাতে ধরা পড়ার আশংকা রইল না। কিন্তু একটি নির্দয় হাত আমার হৃদয়টাকে এমনভাবে চেপে ধরে রাখল যে, আমি প্রতি মুহূর্ত অস্থিরতার মধ্যদিয়ে অতিবাহিত করতে বাধ্য হই। আমি মসজিদে চলে গেলাম। ইমাম সাহেবকে বললাম, খোদা কোথায় আমাকে দেখিয়ে দিন। বলুন, আমার অন্তর কোথায় শান্তি পাবে। কিন্তু তিনি আমার কোন সাহায্য করলেন না। সেখান থেকে আমি অন্য এক গ্রামে চলে গেলাম। তারপর সেখান থেকেও চলে গেলাম। তারপর এক এক করে ইমামদের নিকট আমার প্রশান্তি ভিক্ষা করতে থাকি। কিন্তু কেউই আমাকে সাহায্য করল না। কেউ আমাকে আল্লাহর সন্ধান দিল না। কেউ এমন কোন বুদ্ধি আমাকে বলল না, যার বলে আমি আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারি এবং তাঁর নিকট শান্তি প্রার্থনা করতে পারি। আমি

অধিকাংশ রাতে বোনদেরকে স্বপ্নে দেখতাম। দেখতাম, তারা কাঁদছে। জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের ফোঁপানি ও হিচকি শুনতে পেতাম। আমার মনে অনুভূতি জাগে যে, বোনরা আমাকে অভিশম্পাত করছে।'

'এক ব্যক্তি আমাকে বলল, যদি খৃস্টানদের থেকে প্রতিশোধ নিতে হয়, তাহলে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে যাও। সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী ফিলিস্তীনকে মুক্ত করার লক্ষ্যে লড়াই করছেন। মুসলমান ও খৃস্টানদের মাঝে যে যুদ্ধ চলছে, তা আমার জানা ছিল। কোন্ যুদ্ধে কারা পরাজিত হচ্ছে, বাইতুল মোকাদ্দেসে বসেই আমি খবর পেতাম। বাইতুল মোকাদ্দাসে যখন খৃস্টানরা সেখানকার মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা হঠাৎ বাড়িয়ে দিত, তখনই আমরা বুঝে ফেলতাম, কোন এক ময়দানে খৃস্টানরা পরাজিত হয়েছে, যার প্রতিশোধ তারা এখানকার নিরস্ত্র-নিরীহ মুসলমানদের থেকে গ্রহণ করছে। ওখানে বসে আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর নাম শুনতাম। এ নামটা এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, সেখানকার খৃস্টান অদিবাসীরা এ নামে আতংকিত হয়ে উঠে এবং তাকে ঘৃণার সাথে স্মরণ করে। আমরা এও শুনেছি যে, সালাহুদ্দীন আইউবী বানের ন্যায় ধেয়ে আসছেন। কিন্তু তিনি আসলেন না। তার পরিবর্তে উল্টো আমিই বুকে গভীর একটা জখম নিয়ে এখানে চলে এসেছি। আমি সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে গেলাম। কিন্তু যুদ্ধের জন্য ময়দানে না পাঠিয়ে আমাকে এই জেলখানার দায়িত্ব দেয়া হয়। ইতোমধ্যে আমি প্রমোশনও পেয়েছি।'

'এখানে আমি মানুষের উপর জুলুম দেখেছি। জুলুম দেখে দেখে আমি কেঁপে উঠি। এখানে মানুষের হাড়-গোড় ভেঙ্গে ফেলা হয়। বাইতুল মোকাদ্দাসে খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে থাকে। এখানে আমি মুসলমানদেরকে মুসলমানের উপর জুলুম করতে দেখেছি। আমি জানতে পেরেছি, এখানে নির্দোষ লোকদেরও আনা হয় এবং অত্যাচার-নির্যাতন করা হয়। তাদের অপরাধও তা, যা আপনার অপরাধ। আপনাকে এখানে এনে কেন আটক রাখা হল, আমি বুঝে ফেলেছি। এ কাজটা আমাকেও করতে হয়েছে। আমি মানুষকে এমন এমন কষ্ট দিয়েছি, যার বিবরণ দিলে আপনি বেহুঁশ হয়ে যাবেন। আমার সঙ্গীরা পুরোপুরি হিংস্র হায়েনায় পরিণত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে মানবতা শুধু এটুকু অবশিষ্ট আছে যে, তারা মানুষের ন্যায় চলাফেরা করে ও মানুষের মত কথা বলে। তাদের থেকে আমার পার্থক্য হল, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কয়েদীদের সঙ্গে সমবেদনার দু'চারটা কথা বলি, তাদের দুঃখ বুঝবার চেষ্টা করি। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, তোমাদের অপরাধ কী? কিন্তু

সমবেদনার এই জযবা আমার হৃদয়ের বোঝা হাল্কা করার পরিবর্তে আরো ভারী করে তুলছে। আমি এক মুহূর্তের জন্যও মনে শান্তি পাই না। আমি আল্লাহ্‌কে দেখি না। আমার চোখের সামনে থেকে আমার বোনরা সরছে না। মনে হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি খৃস্টানদের থেকে প্রতিশোধ না নেব, ততক্ষণ এভাবে আমাকে অস্থিরতার মধ্যেই কাটাতে হবে।'

'আজ আমি আপনার কণ্ঠে কুরআনের ঘোষণা শুনেছি–

'পাপিষ্ঠদেরকে তাদের চেহারা দেখেই চিনে নেয়া হবে। তারপর পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে তাদের পাকড়াও করা হবে। তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? এটাই সেই জাহান্নাম, পাপিষ্ঠরা যাকে অবিশ্বাস করত। তারা জাহান্নামের অগ্নি ও টগবগে গরম পানির মাঝে ছুটাছুটি করবে।'

আপনার কণ্ঠে জীবনে এই প্রথমবার কুরআনের অমোঘ ঘোষণা শুনে আমার মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। আমার মনে হতে লাগল, আমি যে সত্যের সন্ধানে ঘুরে ফিরছি, তা এই ক'টি শব্দের মধ্যেই লুকায়িত আছে।'

জেল কর্মকর্তা জানালার ফাঁক দিয়ে একটা হাত ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে খতীব ইবনুল মাখদুমের পরনের চোগা ধরে ফেলে এবং অস্থির চিত্তে বলে ওঠে– 'বলুন, এ আপনি আমাকে কী শোনালেন। বলুন, আমার মস্তিষ্কে কি খুন চেপেছে? তা-ই যদি হয়, বলুন, আমি কিভাবে প্রতিশোধ নেব? আমি পাগল হয়ে যাব না তো? আল্লাহ্ যদি সত্যিই থাকেন, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করে আমাকে বলুন, আমার প্রশ্নগুলোর জবাব কী?'

'তোমার মস্তিষ্কে খুন চেপেছে'– খতীব বললেন– 'তুমি আল্লাহ্‌র আওয়াজ শুনে ফেলেছ। আমার কণ্ঠে আল্লাহ্‌ই কথা বলছিলেন। তুমি প্রতিশোধ নিতে অস্থির হয়ে পড়েছ। কিন্তু এখানে তোমাকে এভাবে বেহাল ও বেচাইন হয়েই থাকতে হবে। তুমি যে ফৌজের কর্মকর্তা, তারা কখনো বাইতুল মোকাদ্দাস যাবে না।'

'কেন?'

'কারণ, এ ফৌজ প্রথমে সুলতান আইউবীকে পরাজিত করবে'– খতীব জবাব দেন– 'তারপর তাকে হত্যা করবে। তারপর খৃস্টানদের ক্রীড়নকে পরিণত হবে।'

জেল কর্মকর্তার চোখ খুলতে শুরু করেছে। খতীব তাকে বললেন– 'মুসলিম শাসকরা কী করছে, তা কি তুমি জান?'

কর্মকর্তা বললেন– 'আমি বেশ ক'দিন ধরেই এ জাতীয় কথাবার্তা শুনছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। জাতির যে মেয়েগুলো খৃষ্টানদের বর্বরতার শিকার হয়েছে, আমাদের শাসকরা তাদের কথা ভুলে যাবে, আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।'

'তারা ভুলে গেছে'– খতীব বললেন– 'তারা এ কথাও ভুলে গেছে, সেই অপহৃত মুসলিম মেয়েদেরকেই যে তাদেরকে উপহার দেয়া হয় এবং তাদেরকে নিজেদের হেরেমের শোভা বানায়। তারা এ কারণেই সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমনে পরিণত হয়েছে। কারণ, তিনি কুরআনের বিধান অনুসরণ করে চলেন এবং জাতির মর্যাদা রক্ষা করতে চান। তার কোন বাড়ি-ঘর আছে কিনা, তাও তিনি ভুলে গেছেন। জীবনটা কাটছে তার পাহাড়-জঙ্গল আর মরুভূমি ও উপত্যকায়– জিহাদের ময়দানে। আমার অপরাধও এটাই যে, আমি মসুলের শাসনকর্তাকে কুরআনের বিধান স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছিলাম, একজন মর্দে মুজাহিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তুমি পরাজিত হবে। কুরআনের যে পবিত্র বাক্যগুলো একটু আগে তোমাকে জাদুর ন্যায় প্রভাবিত করেছে, সাইফুদ্দীনকে আমি তা-ই স্মরণ করিয়েছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম, তোমার ন্যায় পাপিষ্ঠদের চেহারা দেখে চিহ্নিত করা হবে এবং মাথার ঝুঁটি ও পায়ে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাকে আমি কুরআনের বিধানও শুনিয়েছি যে, তুমি যদি মস্তিষ্ক থেকে রাজত্বের নেশা দূর না কর, তাহলে তুমি জাহান্নামের অগ্নি ও টগবগে ফুটন্ত পানির মাঝে ছুটাছুটি করবে। কিন্তু সে আল্লাহর বিধান মান্য করতে অস্বীকার করে প্রবৃত্তির কথা মান্য করল এবং সত্য বলার অপরাধে আমাকে গ্রেফতার করে বন্দী করে রাখল।'

'এখানে আপনাকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে'– কর্মকর্তা বললেন– 'তবে আমি আপনার যতটুকু সম্ভব সেবা ও সহযোগিতা করব।'

'এই জাগতিক ও দৈহিক নির্যাতন আমাকে কোন কষ্ট দিতে পারবে না'– খতীব বললেন– 'তুমি আমার কণ্ঠে যে জ্বলন ও প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছ, তা ছিল আমার আত্মার কণ্ঠ। দুনিয়ার জাহান্নামে আমি নিশ্চিন্ত। আমার আওয়াজ আল্লাহর আওয়াজ। আমার কোন কষ্ট নেই। তবে আমার একটি চিন্তা আছে, যা আমাকে পেরেশান করছে। আমার একটা যুবতী মেয়ে আছে। মেয়েটা আমার একমাত্র সন্তান। স্ত্রী মারা গেছে বহু বছর আগে। এই মেয়েটির স্বার্থে আমি আর বিয়ে করিনি। আমরা একজন অপরজনের জন্য বেঁচে আছি। মেয়েটা ঘরে একা।'

'আমি তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব।' কর্মকর্তা বললেন।

'প্রত্যেকেরই হেফাজতকারী আল্লাহ'– খতীব বললেন– 'আমি তোমাকে আমার ঘরের ঠিকানা দিচ্ছি। কন্যা সায়েকাকে বলবে, যেন সে অটল থাকে এবং আমার ব্যাপারে কোন চিন্তা না করে। এখানে যদি কুরআন পাঠ করার অনুমতি থাকে, তাহলে তার নিকট থেকে আমার কুরআনটা নিয়ে আসবে।'

জেল কর্মকর্তা ভোরেই খতীবের বাড়ি চলে যান এবং তার কন্যাকে সান্ত্বনা দেন যে, পিতার ব্যাপারে কোন চিন্তা করবে না, তিনি ভাল আছেন। কর্মকর্তা সায়েকাকে জানায়, আমি আপনার পিতার দ্বারা অনেক প্রভাবিত হয়েছি। যতটুকু সম্ভব আমি তাকে সাহায্য করব। তবে আমি উপরের আদেশের পরিপন্থী কিছু করতে পারব না। আমি কয়েদখানার একজন নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা। সে সায়েকাকে বলল, মোহতারাম খতীব আপনাকে তাঁর কুরআন শরীফখানা দিতে বলেছেন। সায়েকা কুরআন দেয়ার আগে তার সঙ্গে নানা কথা বলে নিশ্চিত হয় যে, লোকটা আসলেই অন্তর থেকে তার পিতার সহযোগিতা করতে চাচ্ছে। সায়েকার নিকট লোকটাকে আবেগপ্রবণ বলে মনে হল। কর্মকর্তা যখন বলল, আমি আপনার ও আপনার পিতার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুতি আছি, তখন সায়েকা তাকে বলল, আপনি কি জানেন, আব্বাজানকে কি অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে? আমার মনে হচ্ছে, তথ্য বের করার জন্য সাইফুদ্দীন তার উপর নির্যাতন চালাবে। আপনি কী সহযোগিতা দিয়ে তাকে কয়েকখানা থেকে পালাবার সুযোগ করে দিতে পারেন না? আমরা দু'জন মসুল ছেড়ে চলে যাব।'

কর্মকর্তা মুচকি হেসে বললেন- 'আল্লাহর যা ইচ্ছা। আমি আপনার পিতার কণ্ঠে আল্লাহর কণ্ঠ শুনেছি এবং তার চোখে ঈমানের নূর দেখেছি। আল্লাহর আওয়াজ ও ঈমানের নূরকে কোন মানুষ কয়েদখানায় আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। সম্ভবত এই আওয়াজ ও নূরকে মুক্ত করার শুভ কর্মটি আল্লাহ পাক আমার জন্য লিখে রেখেছেন এবং তার বিনিময়ে আমার মনের আগুন নির্বাপিত হবে। আমি আপনাকে বলতে পারব না যে, আমি কী করব। বিষয়টা অত্যন্ত গোপনীয়।'

'আপনি বসুন, আমি আব্বাজানের জন্য কুরআন নিয়ে আসছি'– বলেই সায়েকা ভেতরে চলে যায় এবং দীর্ঘ সময় পর ফিরে আসে। তার হাতে এক কপি কুরআন। কুরআন শরীফখানা কর্মকর্তার হাতে দিয়ে সায়েকা বলল– 'আব্বাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি নেয়ার জন্য আমি মসুলের

শাসনকর্তার নিকট যাচ্ছি।'

'আচ্ছা যান, আমিও যাচ্ছি।' বলে জেল কর্মকর্তা খতীবের ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

❁ ❁ ❁

সায়েকা প্রস্তুত হয়ে সাইফুদ্দীনের দরবারে চলে যায়। তাকে ফটকের বাইরে থামিয়ে দেয়া হল। সাইফুদ্দীন সালাহুদ্দীন আইউবী নন যে, তার সঙ্গে যে কারো সাক্ষাৎ করার অনুমতি থাকবে। সাইফুদ্দীন রাজা। তার রীতি-নীতিও রাজকীয়। তাকে মদপান করতে হয়। হেরেমের জন্য সময় বের করতে হয়, বাইজি নাচের আসর বসাতে হয় এবং এসব করে যেটুকু সময় বাঁচে তা সুলতান আইউবী থেকে রাজত্বকে বাঁচানোর পরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজে ব্যয় করেন। জনসাধারণের কোন খোঁজ-খবর তিনি রাখেন না। ক্ষমতালোভীরা জনগণকে ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে শুধু। জনগণের ভাল-মন্দ ও সুখ-দুঃখে তাদের কিছু যায় আসে না। যতটুকু খাবার খেয়ে প্রজারা বেঁচে থেকে তাদের সামনে সেজদাবনত হয়ে থাকবে, ততটুকুর বেশি সুযোগ-সুবিধা তাদের দেয়া হয় না।

সায়েকা সেই প্রজাদেরই একটি মেয়ে। দারোয়ান তাকে জিজ্ঞেস করল– 'আপনি কে?' সায়েকা বলল– 'আমি মসুলের খতীব ইনবুল মাখদুম কাকবুরীর কন্যা।'

অন্যদের ন্যায় দারোয়ানও শুনেছে, খতীব ইবনুল মাখদুম হঠাৎ পাগল হয়ে গেছেন এবং তাকে জেলখানায় আটক করে রাখা হয়েছে। মসুলের সব মানুষই খতীবকে শ্রদ্ধা করে থাকে। তার পাগল হয়ে যাওয়ার কারণে সকলেই মর্মাহত ও অনুতপ্ত। দারোয়ান দরবারের এক কর্মকর্তাকে বলে সায়েকাকে সাইফুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি নিয়ে দেয়।

সায়েকা সাইফুদ্দীনের নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়। মেয়েটির রূপ-যৌবন দেখে সাইফুদ্দীন চমকে ওঠেন। সাইফুদ্দীন নারী-শিকার পুরুষ। তিনি সায়েকাকে স্বস্নেহে নিজের পার্শ্বে বসতে দেন। তিনি বুঝে ফেলেন, মেয়েটা তার পিতার মুক্তির আবেদন নিয়ে এসেছে।

'শোন মেয়ে'– সাইফুদ্দীন সায়েকার বক্তব্য না শুনেই বললেন– 'আমি জানি, তুমি কেন এসেছ। কিন্তু আমি বেজায় বাধ্য হয়েই তোমার পিতাকে বন্দী করেছি। দু'-একদিন পর ছেড়ে দেয়ার মতো অবস্থা হলে আমি তাকে গ্রেফতারই করতাম না। আমি তাকে মুক্তি দিতে পারব না।'

'তার অপরাধ কী?' সায়েকা জিজ্ঞেস করে।

'বিশ্বাসঘাতকতা।' সাইফুদ্দীন জবাব দেন।

'তিনি কি আপনার বিরুদ্ধে খৃস্টানদের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন?' সায়েকা জিজ্ঞেস করে।

'রাষ্ট্রের শত্রু খৃস্টান হোক কিংবা মুসলমান'– সাইফুদ্দীন জবাব দেন– 'তাকে সঙ্গে রেখে রাষ্ট্রের ক্ষতি করা অন্যায়। তোমার পিতা কি সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থক ছিলেন না?'

'আমার জানা নেই'– সায়েকা জবাব দেয়– 'তবে আমার বিশ্বাস, সালাহুদ্দীন আইউবীকে সমর্থন করা অন্যায় নয়।'

'এ বিষয়টা তোমার পিতাও বুঝতে পারেননি'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমি ভেবে অবাক হই, বহু মানুষ সালাহুদ্দীন আইউবীকে ফেরেশতা মনে করে থাকে। অথচ তিনি নারীর ক্ষেত্রে হায়েনা। তিনি দামেস্ক এবং কায়রোয় তার হেরেমকে তোমার ন্যায় শত শত রূপসী মেয়ে দ্বারা পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। তিনি তার হেরেমের মেয়েদেরকে তিন-চার মাস পর তার সালারদের হাতে তুলে দেন। তার বাহিনী যেখানেই হামলা করে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে অসদাচরণ করে। তারা যে কোন বাড়ি-ঘর লুট করে এবং যে কোন মেয়েকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তোমার ন্যায় সুন্দরী মেয়েরা তার থেকে কখনো রক্ষা পায় না। তোমার ইজ্জতের হেফাজত করা আমার কর্তব্য– তোমাকে আমার ঘরে রেখে হলেও।'

'আমাকে আল্লাহই রক্ষা করবেন'– সায়েকা বলল– 'আপনার নিকট আমার আবেদন এটুকু যে, কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমাকে আব্বাজানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিন।'

'বিচারক তার শাস্তি ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত অনুমতি দেয়া যাবে না।'

'শাস্তি কী হবে?'

'মৃত্যুদণ্ড।'

সায়েকার দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করে। সাইফুদ্দীন মেয়েটাকে আরো আতংকিত করার জন্য বললেন– 'তবে এই মৃত্যুদণ্ড অত সহজ হবে না যে, তরবারী দ্বারা তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। তাকে ধীরে ধীরে কষ্ট দিয়ে মারা হবে। প্রথমে তার চোখ দু'টো তুলে ফেলা হবে। তারপর সাড়াশি দ্বারা টেনে টেনে একটা একটা করে দাঁত তুলে ফেলা হবে। তারপর তার হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো এক এক করে কাটা হবে। তারপরও যদি তিনি

না মরেন, তাহলে গায়ের চামড়া তুলে ফেলা হবে।'

মেয়েটির গা কাঁপতে শুরু করে। সে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে। চেহারার রং পিতবর্ণ ধারণ করে। সায়েকা কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে- 'আপনি কি তার প্রতি এতটুকু দয়া করতে পারেন না যে, তরবারী দ্বারা এক কোপে মাথাটা কেটে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করবেন? তাকে মৃত্যুদণ্ডই যদি দিতে হয়, স্বল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেললেই তো হয়।'

'তুমি যদি তোমার মূল্যবান যৌবনের প্রতি সদয় হতে পার, তাহলে আমি তোমার পিতার উপর রহম করতে পারি।'

সায়েকা সাইফুদ্দীনের প্রতি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালে সাইফুদ্দীন বললেন- 'পিতার মৃত্যুর পর তোমাকে একটা অসহায় ও নিরাশ্রয় মেয়ে হিসেবে জীবনযাপন করতে হবে। তার চেয়ে বরং ভাল, তুমি আমার স্ত্রী হয়ে যাও। তাতে তোমার পিতারও উপকার হবে, তুমিও মসুলের রাণীর মর্যাদা লাভ করবে।'

'আব্বাজান যদি আমাকে আত্মমর্যাদা শিক্ষা না দিতেন, তাহলে আপনার স্ত্রীত্ব বরণ করে মসুলের রাণী হওয়া একটা বিষয় ছিল। তখন আমি আপনার সঙ্গে একটি রাত অতিবাহিত করে গৌরববোধ করতাম'- সায়েকা বলল- 'কিন্তু আমার ইজ্জত রক্ষায় আব্বাজান নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হওয়ার মতো লোক নন। এ সওদা আপনি আব্বাজানের সাথে করুন। আপনি তাকেই জিজ্ঞেস করুন, জল্লাদের হাতে সোপর্দ হওয়া এবং কন্যাকে আমার হাতে তুলে দেয়া এ দু'টি বিষয়ের কোন্‌টি তোমার পছন্দ? আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, জবাবে আব্বাজান বলবেন, আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দাও। আমি আপনার সমীপে শুধু এই আবেদন নিয়ে এসেছিলাম যে, অল্প সময়ের জন্য হলেও আমাকে আব্বাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দিন। এবার আমি আমার আবেদনের সঙ্গে নতুনভাবে এ কথাটা সংযোগ করছি যে, আপনার এ সওদা আমি প্রত্যাখ্যান করলাম।'

'তুমি আমার ঘরে আসবে না, এই কি তোমার সিদ্ধান্ত?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'এ আমার অটল সিদ্ধান্ত'- সায়েকা জবাব দেয়- 'আপনি মসুলের অধিপতি। বল প্রযোগ করেই তো আপনি আমাকে আপনার হেরেমে ঢুকিয়ে ফেলতে পারেন।'

'এমন অন্যায় আমি কখনো করিনি।' সাইফুদ্দীন জবাব দেন।

সায়েকা বসা থেকে উঠে দাঁড়ায়। পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ নয়– তার আসল উদ্দেশ্য ছিল, কয়েকখানায় তার পিতার সঙ্গে কিরূপ আচরণ হচ্ছে, তা জানা। আর তা সে জেল কর্মকর্তার নিকট থেকে জানতে পেরেছে। তার আশা ছিল, এই কর্মকর্তা তার পিতার পলায়নে সাহায্য করবে। সায়েকা সাইফুদ্দীনকে সালাম করে হাঁটা দেয়। সাইফুদ্দীন তাকে চলে যেতে দেখে বললেন– 'দাঁড়াও, আমি তোমাকে এ কথা বলতে দেব না যে, মসুলের শাসনকর্তা একটি মেয়ের মনোবসনা পূরণ করেননি। তুমি আজ রাতেই তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে। এক লোক তোমার ঘরে যাবে। সে তোমাকে সঙ্গে করে কয়েদখানায় নিয়ে যাবে। তুমি যত দীর্ঘ সময় ইচ্ছা পিতার সঙ্গে কথা বলতে পারবে।'

সায়েকা সাইফুদ্দীনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় নেয়। সাইফুদ্দীনের পেছনে একজন বডিগার্ড দাঁড়িয়ে ছিল। সায়েকা বেরিয়ে গেলে তিনি তাকে বললেন– 'এই সুদর্শনা পাখিটা পিঞ্জিরায় আসা উচিত। আমি তাকে সন্ত্রস্ত করার জন্য বলেছিলাম, তার পিতাকে কিরূপ নির্যাতন দিয়ে হত্যা করার হবে। কিন্তু মেয়েটা বড় শক্ত ধাতুর মানুষ। আমি তাকে বলেছি, এক ব্যক্তি তোমার ঘরে যাবে। সে তোমাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাবে। তুমি কি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ?'

'কি যে বলেন? আপনার ইশারা বুঝতে কি আমার এখনো বাকী আছে?'– বডিগার্ড ঠোঁটে শয়তানি হাসি টেনে বলল– 'সেই ব্যক্তিটি আমিই হব। আজ সন্ধ্যার পরই আমি কয়েকখানায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে তাকে জায়গা মতো নিয়ে আসব।'

'জান তো, কোথায় নিতে হবে?'– সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন– 'খবরদার! মেয়েটার মনে যেন সন্দেহ না জাগে যে, আমি তাকে অপহরণ করিয়েছি?'

'আমি সবই বুঝি'– বডিগার্ড জবাব দেয়– 'এ কাজ আমি এই প্রথমবার তো আর করছি না। আমি তাকে আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরিয়ে এমন অবস্থায় আপনার নিকট নিয়ে আসব যে, সে মনে করবে একমাত্র আপনিই তার হিতাকাঙ্খী ও আপনজন। তারপর এরূপ পক্ষীদের পিঞ্জিরায় কিভাবে আবদ্ধ করতে হয়, তা আপনিই ভাল জানেন।'

সাইফুদ্দীন তার বডিগার্ডের কানে কানে কী যেন বললেন। বডিগার্ডের চোখের তারায় শয়তান পিট পিট হাসতে শুরু করে।

রাতের বেলা। কয়েদখানার যে কর্মকর্তা সায়েকার ঘরে গিয়েছিল এবং তাকে সান্ত্বনা দিয়ে খতীবের জন্য কুরআন নিয়ে ফিরে গিয়েছিল, সে ডিউটি করছে। লোকটা সন্ধ্যার পর কারাগারে প্রবেশ করে দিনের দায়িত্বশীলকে বিদায় করে দেয় এবং খতীব ইবনুল মাখদুমের কক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। এদিক-ওদিক দেখে সে কুরআনখানা খতীবের হাতে দিয়ে বলল– 'আপনি আপনার মেয়ের ব্যাপারে কোন চিন্তা করবেন না; সে সব দিক থেকেই ভাল এবং নিরাপদ আছে। সে আমার নিকট একটা আবদার রেখেছে; আপনি দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে মেয়েটার আবদার পূরণে তাওফীক দান করেন।'

'কী আবদার করেছে ও?' খতীব কৌতূহলী মনে জিজ্ঞেস করেন।

কর্মকর্তা এদিক-ওদিক তাকিয়ে জানালার সঙ্গে মুখ লাগিয়ে বলল– 'পলায়ন, আপনার কি সাহস হয়? আমি আপনাকে সাহায্য করব।'

'যে কাজের সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টি জড়িত, তার জন্য আল্লাহ্ সাহসও দিয়ে দেন'– খতীব বললেন– 'কিন্তু আমি তো তোমার সাহায্য নিয়ে পালাব না। তার পরিবর্তে আমি এখানে মৃত্যুবরণ করাকেই বরণ করব।'

'কেন?'– জেল কর্মকর্তা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন– 'আপনি কি আমাকে পাপী মনে করে আমার সাহায্য নিতে অস্বীকার করছেন?'

'না'– খতীব বললেন– 'বরং আমি তোমার সাহায্য এ কারণে নিতে চাচ্ছি না যে, তুমি নির্দোষ। আমি তো তোমার সহযোগিতায় এখান থেকে পালিয়ে যাব। কিন্তু তুমি পেছনে থেকে যাবে এবং ধরা পড়বে। আমার অপরাধের শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে, যা আমার পক্ষে মারাত্মক অন্যায় হবে।'

'আমিও আপনার সঙ্গে যাব'– জেল কর্মকর্তা বললেন– 'আপনার গত রাতের বক্তব্যে এখান থেকে আমার মন উঠে গেছে। আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজে গিয়ে যোগ দেব। আর যেহেতু আমি কয়েদী নই, সেহেতু আমি সহজেই পালাতে পারব। কিন্তু আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। এই জগতে আমার কেউ নেই। হৃদয়টা জুড়ে আছে শুধু আগুন। এই আগুন আমাকে নেভাতেই হবে।'

'হ্যাঁ'– খতীব বললেন– 'এভাবে হলে আমি তোমার সাহায্য নিতে পারি।'

'আপনার মেয়ে আমাকে বলেছিল, সে নাকি মসুলের শাসনকর্তার নিকট যাবে'– কর্মকর্তা বললেন– 'তার নিকট সে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভের আবেদন জানাবে।'

'না'– খতীব শংকিত হয়ে বললেন– 'তার সাইফুদ্দীনের মতো শয়তান

চরিত্রের লোকটির নিকট যাওয়া উচিত হবে না। তুমি আবার গিয়ে তাকে বলে আস, সে যেন সাইফুদ্দীনের নিকট না যায়।'

'আমি তো সকাল ছাড়া যেতে পারব না'– কর্মকর্তা বললেন।

জেল কর্মকর্তা খতীবের নিকট থেকে চলে যান। খতীব কুরআন শরীফখানায় চুম্বন করেন। তারপর বুকের সঙ্গে লাগিয়ে মনে মনে বললেন– 'এখন আর আমি কারা প্রকোষ্ঠে একা নই।' তিনি গেলাফটা খুলে প্রদীপের আলোতে বসে কুরআন খুললেন। পাতা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ এক টুকরো কাগজ বেরিয়ে আসে। সায়েকার লেখা একখানা চিরকুট– 'আল্লাহ সঙ্গে আছেন– জিনরা আছে– পয়গম্বর সত্য– তার বার্তা শুনুন– ঈমান তাজা আছে।'

খতীবের বিমর্ষ মুখে মুচকি হাসির আভা ফুটে ওঠে। তিনি চিরকুটখানা প্রদীপের আগুনে পুড়ে ফেললেন। চিঠির মর্ম তিনি বুঝে ফেলেছেন। 'পয়গম্বর সত্য' দ্বারা উদ্দেশ্য, লোকটা যা বলছে, সত্য বলে মনে হচ্ছে; আপনি তার পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করুন। 'জিনরা আছে' দ্বারা উদ্দেশ্য সায়েকার নিরাপত্তা দানের জন্য লোক আছে। তারা তাকে পাহারা দিচ্ছে।

যে সময়ে খতীব সায়েকার পত্রখানা পুড়ে ফেলার জন্য আগুনে ধরেন, ঠিক সে সময় সায়েকার ঘরে করাঘাত পড়ে। সায়েকা দরজা খুলে দেয়। তার হাতে প্রদীপ। বাইরে দণ্ডায়মান লোকটাকে সে চিনে ফেলে– সাইফুদ্দীনের দেহরক্ষী। সে সাইফুদ্দীনের সঙ্গে সায়েকার সাক্ষাতের সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। সে সায়েকাকে বলল– 'আমি আপনাকে আপনার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কয়েদখানায় নিয়ে যেতে এসেছি। সাক্ষাতের পর আবার আপনাকে আপনার ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

সায়েকা প্রস্তুত ছিল। সে বিলম্ব না করে বের হয়ে আসে এবং হাঁটতে শুরু করে। দেহরক্ষী তাকে বলল– 'পিতার সঙ্গে শুধু কুশল বিনিময় আর ঘরের খোঁজ-খবর বলার অনুমতি থাকবে। আপনাকে কারা প্রকোষ্ঠের জানালা থেকে তিন পা দূরে রাখা হবে। এমন কোন কথা বলবেন না, যা মসুলের শাসনকর্তা গাজী সাইফুদ্দীনের মর্যাদায় আঘাত হানবে।'

বডিগার্ড সামনে সামনে হাঁটছে। সায়েকা তার দু'-তিন পা পেছনে। দু'জনই চুপচাপ হাঁটছে। অন্ধকার রাত। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তারা গলির পর গলি অতিক্রম করছে। একটি গলিতে মোড় নিতেই বডিগার্ড হঠাৎ থেমে যায়। সে পেছন দিকে তাকায়। সায়েকা জিজ্ঞেস করে– 'কী ব্যাপার?'

'তুমি কি পেছনে কারো পায়ের শব্দ শুননি?' বডিগার্ড জিজ্ঞেস করে।

'না'– সায়েকা জবাব দেয়– 'আমিই তো তোমার পেছনে পেছনে হাঁটছি। সম্ভবত তুমি আমার আওয়াজই শুনতে পাচ্ছ।'

'না, আমি অন্য একটি শব্দ শুনেছি।' বডিগার্ড ফিস ফিস করে বলল এবং সামনের দিকে হাঁটা দিল।

'এত ভয় পাচ্ছ কেন?'– সায়েকা বলল– 'পেছনে পেছনে কেউ যদি এসেই থাকে, আসুক না।'

বডিগার্ড কোন উত্তর দেয় না। এই গলি শেষ হয়ে গেছে। সম্মুখে কোন জনবসতি নেই। মাটি উঁচু-নীচু। খানা-খন্দকও আছে। জেলখানাটা ওদিকেই, বসতির পেছনে কিছু দূরে। দু'জনই পা টিপে টিপে সাবধানতার সাথে অগ্রসর হচ্ছে। এখন চারদিকে ঝোপ-ঝাড় ও গাছপালা। বডিগার্ড আবারো থমকে দাঁড়িয়ে চকিত নয়নে পেছন দিকে তাকায়। সে কারো হাঁটার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তরবারীটা বের করে হাতে নেয় সে। পেছনের দিকে চলে যায়। দু'তিনটি ঝোঁপের চারপাশে ঘুরে-ফিরে দেখে। কিন্তু কিছুই নেই।

'এবারও নিশ্চয়ই পেছনে কারো পায়ের শব্দ শুনেছ?'– বডিগার্ড সায়েকাকে বলল– 'এবারের শব্দটা আমি স্পষ্ট শুনেছি।'

সায়েকা শব্দটা শুনেছে। কিন্তু সে মিথ্যা বলে– 'ওটা আসলে তোমার মনের ভয়। আর যদি কোন শব্দ শুনেই থাক, তাহলে তা খরগোশ কিংবা অন্য কোন জন্তু-জানোয়ার হবে। তুমি ওসব শব্দকে ভয় করছ কেন?'

'আমার ভয় করার কারণ হল'– সাইফুদ্দীনের বডিগার্ড বলল– 'তুমি অতিশয় রূপসী ও যুবতী মেয়ে। তোমার মূল্য সম্ভবত তুমি জান না। কেউ যদি তোমাকে অপহরণ করে কোন আমীর বা শাসনকর্তার নিকট বিক্রি করে, তাহলে সে লাল হয়ে যাবে। এখন তুমি আমার দায়িত্বে। আমার হাত থেকে যদি কেউ তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে মহারাজা আমার মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করে ফেলবেন। তুমি আমার পাশাপাশি হাঁট।'

সায়েকা বডিগার্ডের পাশে চলে আসে। দু'জন হাঁটতে শুরু করে। একটু সামনে থেকে সরু গলিপথের শুরু। তারা সে পর্যন্ত চলে যায় এবং সরু পথে হাঁটতে শুরু করে। একটু সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পর গলির মাথা থেকে অন্য একটি পথ বেরিয়ে আরেক দিকে চলে গেছে। বডিগার্ড সায়েকাকে নিয়ে সে পথে এগুতে শুরু করে। কয়েক পা অগ্রসর হওয়ামাত্র তারা কারো ধাবমান পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়, যা পরক্ষণেই হঠাৎ করে থেমে যায়। পেছন দিক

থেকে কে যেন ছুটে আসে এবং ডানদিকে চলে যায়। বডিগার্ড একটি গাছের পেছনে একটি ছায়া অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে ফেলে। সে তরবারী উঁচু করে গাছটার দিকে ছুটে যায়। অমনি পেছন থেকে সায়েকার ক্ষীণ একটা চীৎকার কানে আসে তার। কে যেন সায়েকার গায়ের উপর একটা বস্তা ছুঁড়ে মেরে ঝাঁপটে ধরে। তার মুখে কাপড় গুঁজে দেয় আগেই। বডিগার্ড অন্ধকারের মধ্যে শুধু এটুকু দেখতে পায়, যে জায়গাটায় সায়েকা একাকী ছিল, এখন সেখানে দু'টি ছায়া ধস্তাধস্তি করছে।

বডিগার্ড সেদিকে ছুটে যেতে উদ্যত হয়। এমন সময় পেছন দিক থেকে কে একজন তাকে ঝাপটে ধরে। তার মুখেও কাপড় গুঁজে দেয়া হয় এবং চাটাইয়ের ন্যায় মোটা একটা কাপড় দ্বারা তাকে পেঁচিয়ে ফেলা হয়। বডিগার্ড স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী যোদ্ধা। কিন্তু তারা সংখ্যায় অধিক এবং একেকজন শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ।

সায়েকাকে বস্তায় ভরে বস্তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। এদিকে বডিগার্ডও বস্তাবন্দী। লোকগুলো তাদেরকে তুলে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ে।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর বস্তা দু'টি পিঠে তুলে নেয়া হল। অন্ধকারের মধ্যে পাশ দিয়ে অতিক্রমকারীদেরও বুঝবার উপায় নেই যে, দু'জন মানুষকে অপহরণ করে বস্তায় ভরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারা একটি অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়ে এবং কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে।

ঘরে ঢুকে তারা সায়েকাকে এক কক্ষে এবং বডিগার্ডকে আরেক কক্ষে নিয়ে যায়। আলাদা আলাদা কক্ষে বস্তার মুখ খুলে দেয়া হয়। সায়েকা বস্তা থেকে বেরিয়ে এলে তার মুখের কাপড় বের করে ফেলা হয়। কক্ষে প্রদীপ জ্বলছিল। সায়েকা সামনে দু'ব্যক্তিকে দেখে চমকে উঠে কম্পিত কণ্ঠে বলল– 'তোমরা এ পন্থাটা কেন অবলম্বন করেছ?'

'নিরাপদ পন্থা এটাই ছিল'– একজন জবাব দেয়– 'অন্যথায় কেউ পথে তোমাকে আমাদের সঙ্গে চলতে দেখে ফেলত। তাই তোমাকে লুকিয়ে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল।'

'তাহলে আগে আমাকে বিষয়টা বললে না কেন?'– সায়েকা জিজ্ঞেস করে– 'আমি তো মনে করেছিলাম, লোকগুলো তোমরা নও, দস্যু এবং আমাকে সত্যি সত্যিই বুঝি অপহরণ করা হচ্ছে।'

'আমাদের কাজের পন্থা-পদ্ধতি অনেকটা এরূপই হয়ে থাকে।' অপর ব্যক্তি বলল।

'তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলে যে, লোকটা আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে?' সায়েকা জিজ্ঞেস করে।

'তুমি যখন তার সঙ্গে ঘর থেকে বের হও, তখনই আমরা নিশ্চিত হই যে, সাইফুদ্দীনের লোক তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে'– একজন বলল– 'তোমাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়াই যদি তার উদ্দেশ্য হত, তাহলে তার জন্য সোজা ও সংক্ষিপ্ত পথ ছিল।'

'লোকটা কয়েকবার তোমাদের পায়ের শব্দ শুনেছিল'– সায়েকা বলল– 'এমন অসাবধান হওয়া ঠিক নয়।'

'ব্যাপার তা নয়। আসলে অন্ধকারে আমরা তোমাদের দূরত্বের ব্যবধান আন্দাজ করতে পারিনি। তাছাড়া দূর থেকে তোমাদেরকে দেখা যাচ্ছিল না। ফলে অনুসরণ করার জন্য কাছাকাছি থাকতে হয়েছে।' তারা বলল।

সায়েকার চেহারায় প্রশান্তির আভা। মেয়েটা সাইফুদ্দীনের বডিগার্ডের হাতে অপহরণ ও লাঞ্ছিত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে।

অপর কক্ষে বডিগার্ডকে বস্তা থেকে বের করে তার মুখ থেকে কাপড় বের করা হয়। তার সামনে তিনজন মুখোশধারী দাঁড়িয়ে আছে। তার তরবারীটা মুখোশধারীদের হাতে।

'তোমরা কারা?'– মুখে প্রভাব ও গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বডিগার্ড মুখোশধারীদের জিজ্ঞেস করে– 'আমি মসুলের শাসনকর্তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করব।'

'মসুলের শাসনকর্তার হেফাজত এখন আল্লাহ্ করলে করতে পারেন'– এক মুখোশধারী বলল– 'তুমি তোমার নিজের জীবন বাঁচানোর চিন্তা কর। মেয়েটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?'

'কয়েদখানায় তার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করানোর জন্য'– বডিগার্ড জবাব দেয়– 'মনে রেখ, তোমরা যে মেয়েটাকে অপহরণ করেছ, তাকে তোমরা গিলতে পারবে না। এ খতীব ইবনুল মাখদুমের কন্যা এবং মসুলের শাসনকর্তা তার হেফাজতের জন্য নিজের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীকে প্রেরণ করেছেন। এ থেকেই অনুমান করতে পার যে, তোমরা কোথায় হাত দিয়েছ। মসুলের শাসনকর্তা মেয়েটার সন্ধানে শহরের প্রতিটি ঘর অনুসন্ধান করবেন। তোমরা শহর থেকে বের হতে পারবে না। সাইফুদ্দীন এক্ষুণি সংবাদ পেয়ে যাবেন যে, তার এক দেহরক্ষী এবং খতীবের মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে শহর সীল করে দেয়া হবে। আচ্ছা, মেয়েটিকে তোমরা কোথায় রেখেছ?'

'শোন বন্ধু!'– এক মুখোশধারী বলল– 'মেয়েটা এখানেই আছে। তাকে অপহরণ করা হয়নি, বরং তাকে অপহরণের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। আমরা জানি, মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনের জন্য এই মেয়েটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সন্ধানে তিনি তার গোটা বাহিনীকে মাঠে নামাবেন। তার কারণ, মেয়েটা অতিশয় রূপসী ও যুবতী এবং তার পিতা কয়েকখানায় বন্দী। মেয়েটা সাইফুদ্দীনের পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি তাকে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। আমরা জানি, সাক্ষাতের এই অনুমতিদান একটি প্রতারণা। সাক্ষাতের নামে দূরভিসন্ধি বাস্তবায়নের জন্যই তিনি সময়টা রাতে নির্ধারণ করেছেন। আচ্ছা, তুমি বল তো, খতীবের সঙ্গে তার মেয়ের সাক্ষাৎ দিনে করানো হয়নি কেন? ঘর থেকে বের করেই তুমি তাকে ভুল পথে নিয়ে এসেছ। তখনই আমরা তোমাদের পিছু নিয়েছি। তোমরা দু'-তিনবার থেমে পেছন দিকে তাকিয়েছিলে। তোমরা যাদের উপস্থিতি আন্দাজ করেছিলে, তারা আমরাই। যাদেরকে তুমি ঝোঁপের মধ্যে সন্ধান করতে গিয়েছিলে, তারাও আমরা। কিন্তু তুমি আমাদেরকে দেখনি। দেখবে কিভাবে? আমাদেরকে দিনের আলোতেও কেউ দেখতে পায় না।'

'তোমরা এই মেয়েটার উপর জুলুম করেছ'– বডিগার্ড বলল– 'আমি তাকে তার পিতার নিকট নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

'তুমি মেয়েটাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলে'– এক মুখোশধারী তরবারীর আগাটা তার ধমনির উপর রেখে চাপা কণ্ঠে বলল– 'তুমি তাকে সাইফুদ্দীনের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলে। তোমাদের শাসনকর্তা কত দয়ালু মানুষ, তা আমাদের জানা আছে যে, তিনি খতীব ইনবুল মাখদুমের ন্যায় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে জেলে পুরতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না। আর এখন তার কন্যাকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি প্রদান করলেন! তুমি শুধু এতটুকুই জান, খতীব অপরাধী। কিন্তু তোমার একথা জানা নেই যে, এই মহামান্য আলেমে দ্বীন মসুলে নিঃসঙ্গ নন এবং তিনি যখন কয়েকখানায় আবদ্ধ, তখন তার কন্যাও ঘরে একাকী নয়। আমরা সাইফুদ্দীনের সিংহাসন উল্টে দেব। দিন তার শেষ হয়ে এসেছে। আমরা তাকে যে কোন সময় খুন করতে পারি। কিন্তু হাসান ইবনে সাব্বাহর ঘাতকদের ন্যায় কাউকে খুন করতে সুলতান আইউবী আমাদের নিষেধ করে দিয়েছেন। আমরা ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধ করে শত্রুকে নিধন করি।'

'তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর লোক?' বডিগার্ড জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ'– এক মুখোশধারী জবাব দেয়– 'আমরা আইউবীর কমান্ডো বাহিনীর সদস্য।'

মুখোশধারী বডিগার্ডের ধমনিতে স্থাপন করা তরবারীটায় একটু চাপ দেয়। বডিগার্ডের পিঠ দেয়ারের সঙ্গে গিয়ে ঠেকে। মুখোশধারী বলল– 'তুমি সাইফুদ্দীনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী এবং সবসময় তার সঙ্গে থাক। তার সব গোপন তথ্য তোমার জানা আছে। তুমি তাকে মেয়ে অপহরণ করে নিয়ে দাও। বল, একদম খোলাখুলিভাবে বল, সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে তার পরিকল্পনা কী? যদি বলতে অস্বীকার কর কিংবা যদি বল আমি কিছু জানি না, তাহলে তোমারও সেই দশাই হবে, যা সাইফুদ্দীন বন্দীশালায় তার প্রতিপক্ষের ব্যাপারে ঘটিয়ে থাকে।'

'তোমরা যদি সৈনিকই হয়ে থাক, তাহলে ভালভাবেই জান যে, শাসক ও রাজা-বাদশার সামনে একজন দেহরক্ষীর কোন মূল্য থাকে না'– বডিগার্ড জবাব দেয়– 'মসুলের শাসনকর্তার পরিকল্পনা কী, তা আমি কিভাবে বলব বলল।'

এক মুখোশধারী তার মাথাটা উদোম করে চুলগুলো মুঠি করে ধরে একটা মোচড় দেয় এবং ঝটকা টান দিয়ে একদিকে নত করে ফেলে। অন্য একজন পা ধরে টান দিয়ে তাকে মাটিতে উপুড় করে ফেলে দেয়। একজন তার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে যায়। দাঁড়ানো অবস্থায় কয়েকবার চাপ দিলে বডিগার্ডের প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তারপর তাকে বিভিন্ন রকম নির্যাতনের একটু একটু স্বাদ উপভোগ করানো হয় এবং তাকে বলা হয়, 'এখান থেকে তুমি জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে না।'

'আমাকে উঠতে দাও।' কোঁকাতে কোঁকাতে বডিগার্ড বলল।

তাকে তুলে বসানো হল। সে বলল– 'সাইফুদ্দীন সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান।'

'এটা কোন তথ্য নয়'– এক মুখোশধারী বলল– 'বল, তিনি কখন এবং কিভাবে যুদ্ধ করতে চান? তিনি কি তার বাহিনীকে হাল্‌ব ও হাররানের বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে লড়তে চান, নাকি আলাদা লড়বেন?'

'তার বাহিনী অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে'– বডিগার্ড জবাব দেয়– 'কিন্তু তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করবেন যে, তার বিজয় সম্পূর্ণ আলাদা দেখা যাবে। হাল্‌ব ও হাররানের লোকদেরকে তিনি বিশ্বাস করেন না।'

'সালারদের প্রতি তার নির্দেশনা কী?'– মুখোশধারী জিজ্ঞেস করে।

'তার পরিকল্পনা হল, সালাহুদ্দীন আইউবীকে পাহাড়ী এলাকায় ঘিরে ফেলা হবে।' বডিগার্ড জবাব দেয়।

'বাহিনী কোন্ পথে যাবে?'

'হামাত শিং-এর পথে।'

'খৃস্টানরা কী পরিমাণ সাহায্য করছে?'

'খৃস্টানরা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে'– বডিগার্ড জবাব দেয়– 'কিন্তু সাইফুদ্দীন তাদেরকেও ধোঁকা দেবেন। খৃস্টান বাহিনীর কয়েকজন কমান্ডার মসুলের বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।'

এই দু'মুখোশধারী এবং অপর কক্ষে সায়েকার কক্ষে উপবিষ্ট দু'ব্যক্তি সুলতান আইউবীর কমান্ডো গুপ্তচর। খতীব ইবনুল মাখদুমের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল। বরং বলা যায়, খতীব তাদের পৃষ্ঠপোষক ও নেতা ছিলেন। এই দলটি সুলতান আইউবীর জন্য চোখ ও কানের কাজ দিত। মসুলে থেকে যখনই যে তথ্য সংগ্রহ করতে পারত, তা সুলতান আইউবীর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছিয়ে দিত। তারা মসুলে চাকুরি-ব্যবসা ইত্যাদি কাজ নিয়ে অবস্থান করত। খতীব ইবনুল মাখদুম গ্রেফতার হওয়ার পর তারা রাতে পালাক্রমে তার বাসভবন পাহারা দিত। সায়েকার সঙ্গ দেয়ার জন্য দু'টো মেয়ে রাতে ঘুমাতে এসে যে ছায়া দেখে ভয়ে পেয়েছিল, এরাই সেই ছায়া। সায়েকা তাদেরকে বলেনি যে, ছায়াগুলো মানুষ। বরং সে ধারণা দিয়েছিল, এগুলো জিন। লোকগুলোর জানা ছিল, সায়েকা সাইফুদ্দীনের নিকট পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি আনতে গেছে। ফিরে এসে মেয়েটা এদের একজনকে অবহিত করেছিল যে, রাতে এক লোক এসে তাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাবে। সে এও বলেছিল যে, সাইফুদ্দীন তার সঙ্গে আপত্তিকর কথা বলেছেন এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। লোকটি তার দলের সকলকে বিষয়টি অবহিত করে। তারা সবাই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। তাদের মনে সন্দেহ জাগে, কয়েকখানায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে সায়েকাকে অন্য কোন স্থানে উধাও করে ফেলা হতে পারে। তাই সূর্য ডোবার পর পাঁচজন লোক সায়েকার ঘরে ঢুকে লুকিয়ে থাকে। সায়েকা বডিগার্ডের সঙ্গে বেরিয়ে গেলে তারাও তাদের পিছু নেয়। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাদের সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হয়। তারা সাফল্যজনকভাবে সায়েকাকে রক্ষা করে এবং সাইফুদ্দীনের দেহরক্ষীকে ধরে ফেলে। তারা তার মুখ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য বের করে। তন্মধ্যে এ তথ্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, সাইফুদ্দীনের ভাই ইজ্জুদ্দীন বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে এক অংশকে নিজের কমান্ডে রেখে দিয়েছেন। এই অংশটা রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ তাদেরকে পরে

প্রয়োজন অনুপাতে প্রেরণ করা হবে। প্রথম হামলার নেতৃত্ব দেবেন সাইফুদ্দীন নিজেই। দ্বিতীয়ত, যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি পাওয়া গেছে, তাহল, হাল্‌ব থেকে গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীনের নিকট দূত এসেছে। বার্তা হল, তিনটি বাহিনীকে যৌথ কমান্ডে রাখা হবে এবং খৃস্টানদের সাহায্যের উপর বেশি ভরসা রাখা যাবে না। প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যও ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

এসব তথ্য প্রদান করে বডিগার্ড দাবি জানায়, 'এবার আমাকে মুক্তি দাও।'

মুখোশধারীরা দেব দেব করে কাল ক্ষেপণ করে। সায়েকাকে সে কক্ষেই থাকতে দেয়া হল। তাকে নিজ ঘরে নিয়ে রাখা নিরাপদ নয়। বডিগার্ডকে ভবনটির একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটকে রাখা হল।

❁ ❁ ❁

হাররান ও হাল্‌ব থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে খৃস্টান সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার। এখানকার অধিকাংশ তৎপরতা গোয়েন্দা বিষয়ক। এখানে যে ক'জন খৃস্টান সম্রাট ও কমান্ডার অবস্থান করছেন, তারা সরাসরি নিজেরা সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ করার পরিবর্তে তাঁর মুসলিম বিরুদ্ধবাদীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আগেই বলে এসেছি যে, খৃস্টানরা বড় বড় মুসলিম আমীরদেরকে খৃস্টান সামরিক উপদেষ্টা দিয়ে রেখেছিল। তারা তাদেরকে সামরিক পরামর্শ প্রদান ছাড়াও সৈন্যদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করত। নিজেদের আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখার জন্য তারা মুসলিম আমীরদেরকে বিলাসিতার উপকরণ সরবরাহ করত। তাদের গুপ্তচররাও এই আমীরদের দরবারে অবস্থান করত এবং তাদের হেডকোয়ার্টারে খবরাখবর প্রেরণ করত।

হাররান থেকে গোমস্তগীনের এক খৃস্টান উপদেষ্টা তাদের এই হেডকোয়ার্টারে এসে পৌঁছে। তখন খৃস্টানদের দু'জন বিখ্যাত যুদ্ধবাজ সম্রাট রেমন্ড ও রেজিনাল্ট হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত ছিলেন। রেমন্ড সেই সম্রাট, যাকে সুলতান আইউবী এই অল্প ক'দিন আগে যথাযথ কৌশল প্রয়োগ করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর রেজিনাল্ট হলেন সেই বিখ্যাত খৃস্টান রাজা, যাকে সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী এক যুদ্ধে বন্দী করেছিলেন। তাকে এবং অন্যান্য খৃস্টান কয়েদীদের হাররানে গোমস্তগীনের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। সে সময় গোমস্তগীন বাগদাদের খেলাফতের একজন দুর্গপতি ছিলেন। জঙ্গীর ওফাতের পর গোমস্তগীন কেন্দ্রীয় খেলাফতের সঙ্গে বিদ্রোহ করে স্বাধীন শাসক হিসেবে

আবির্ভূত হন এবং খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় করার লক্ষ্যে রেজিনাল্টের ন্যায় মূল্যবান বন্দীকে অন্য সকল খৃস্টান কয়েদীর সঙ্গে মুক্ত করে দেন। নূরুদ্দীন জঙ্গী ঘোষণা দিয়েছিলেন, রেজিনাল্টের বিনিময়ে তিনি খৃস্টানদের থেকে দাবি-দাওয়া আদায় করে নেবেন। কিন্তু জঙ্গী মৃত্যুবরণ করার পর আমীরগণ বিলাসিতা ও ক্ষমতার নেশায় পড়ে তার সকল পরিকল্পনা উলট-পালট করে দেয় এবং খৃস্টানরা সালতানাতে ইসলামিয়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে।

হাররান থেকে এক খৃস্টান উপদেষ্টা– প্রকৃতপক্ষে সে একজন গোয়েন্দা– রেমন্ড ও রেজিনাল্টের নিকট এসে পৌঁছে এবং হাররানের তাজা ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে। সে বলল– 'হাল্‌ব থেকে আল-মালিকুস সালিহ গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীনের নিকট উপহারসহ বার্তা প্রেরণ করেছেন, অরা যেন তাদের সেনাবাহিনীকে তার বাহিনীর সঙ্গে যৌথ কমান্ডে দিয়ে দেন। সেখানে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে যে, গোমস্তগীনের দু'জন সালার হাররানের কাজীকে হত্যা করে ফেলেছে এবং হাল্‌ব থেকে আল-মালিকুস সালিহ বার্তার সঙ্গে উপহার হিসেবে যে দু'টি সুন্দরী মেয়ে প্রেরণ করেছিলেন, সালারদ্বয় তাদেরকে পালাবার সুযোগ করে দেয়। তারপর তারা স্বীকার করে, তারা সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থক এবং তারই জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করছিল। এ দু'সালার পরস্পর আপন ভাই। গোমস্তগীন তাদেরকে কয়েদখানায় আবদ্ধ করে রেখেছেন। তার মাত্র একদিন আগে আমাদের এক সঙ্গী উপদেষ্টা গোমস্তগীনের বাসভবনে নিমন্ত্রণে গিয়ে রহস্যজনকভাবে খুন হয়। পরদিন তথ্য পাওয়া গেল, গোমস্তগীনের হেরেমের এক মেয়ে ও একজন দেহরক্ষী নিখোঁজ রয়েছে।'

খৃস্টানদের এই বৈঠকে অট্টহাসির ধুম পড়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে এই হাসাহাসির ধারা। অবশেষে হাসি থামিয়ে রেমন্ড বললেন– 'এই মুসলিম জাতিটা এতই যৌনবিলাসী হয়ে উঠেছে যে, তার শাসক ও আমীর-উজীরগণ যুদ্ধ ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও যৌনতায় প্রভাবিত অবস্থায় নিয়ে থাকে। একটু ভেবে দেখুন, গোমস্তগীনের ন্যায় একজন প্রতাপান্বিত ও যুদ্ধবাজ দুর্গপতির সেনাবাহিনীর কমান্ড যে দু'জন সালারের হাতে ছিল, তারা তার শত্রু সালাহুদ্দীন আইউবীর সেনা অধিনায়ক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা উপহার হিসেবে আসা মেয়ে দু'টোর খাতিরে কাজীকে খুন করেছে এবং মেয়েগুলোকে সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্য পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা ধরা পড়ে গেছে। গোমস্তগীনের হেরেমের যে মেয়েটি নিখোঁজ হয়, তাকে সেই রক্ষীসেনা-ই

ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। তবে আমাদের লোকটা কোন্ চক্করে পড়ে খুন হল, তা অবশ্য বলতে পারব না। মুসলমান আমীর, শাসক ও দুর্গপতিদের হেরেমের অবরুদ্ধ জগত অত্যন্ত রহস্যময়। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, এই জাতি ভোগ-বিলাস ও নারীপূজার কারণেই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'আমি দু'টি কথা বলতে চাই'– খৃস্টান সামরিক বাহিনীর ইন্টেলিজেন্স প্রধান অপর এক খৃস্টানকে বলল– 'প্রথম কথা হল, আপনি বলেছেন, উপহারস্বরূপ আসা মেয়ে দু'টোকে হাররান থেকে ভাগিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আপনার এ ধারণা সঠিক নয়। আমি গুপ্তচরবৃত্তিতে অভিজ্ঞ। দুশমনের সামরিক তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া সামরিক নেতৃবর্গ-কর্মকর্তা ও অন্যান্য পদস্ত কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও রণকৌশল সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করাও আমার বিভাগের দায়িত্ব। আমি আপনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলছি, নারী ও মদের ব্যাপারে সালাহুদ্দীন আইউবী শক্ত একটা পাথর। এই একটা কারণেই আপনি তাঁকে না পারবেন বিষ খাইয়ে খুন করতে, না পারবেন কোন রূপসী নারীর জালে আবদ্ধ করে ঘাতকদের দ্বারা হত্যা করাতে। প্রকৃতির অমোঘ বিধান হল, যে লোক মানসিক বিলাসিতায় অভ্যস্ত নয়, তার প্রত্যয় দৃঢ় ও শক্ত হয়ে থাকে। এমন মানুষ যখন যে পরিকল্পনা হাতে নেয়, তা বাস্তবায়ন করেই তবে নিঃশ্বাস ফেলে। আপনার শত্রু সালাহুদ্দীন আইউবীর মধ্যে এই গুণ বিদ্যমান। এ কারণেই তার মাথা পুরোপুরি কাজ করে থাকে এবং তিনি এমন এমন কৌশল প্রয়োগ করেন, যা আপনার কল্পনায়ও আসে না। যার ফলে আপনার পা উপড়ে যায়। আমি আইউবী সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে অনুমিত হচ্ছে, তিনি অনৈতিক চাহিদা ও বিলাসিতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। নিজ সেনাবাহিনীর মধ্যেও তিনি এই গুণ সৃষ্টি করে রেখেছেন। তা না হলে খোলা ময়দানের লড়াইয়ে অভ্যস্ত সৈন্যরা বরফাবৃত উপত্যকা ও পার্বত্য এলাকায় এই তীব্র শীতের মওসুমে যুদ্ধ করতে পারত না। আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মধ্যে এই গুণ সৃষ্টি করতে না পারবেন, ততক্ষণ আপনি সালাহুদ্দীন আইউবী নামক আপনার এই শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন না।

'আমার দ্বিতীয় কথা হল, অন্যান্য মুসলিম আমীর, উজীর ও শাসনকর্তাদের মধ্যে যে নারীপূজা শুরু হয়ে গেছে, তা আমার বিভাগেরই কৃতিত্ব। ইহুদী পণ্ডিতগণ এক শতকেরও বেশি সময় ধরে মুসলমানদের চরিত্র বিনষ্টের অভিযান পরিচালিত করে আসছেন। এটা মূলত তাদেরই সাফল্য যে, আমরা নারী, সোনা-দানা ও মনি-মাণিক্যের মাধ্যমে মুসলিম নেতৃবর্গের চরিত্র ধ্বংস

করে দিয়েছি। আমরা চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য রূপসী ও বিচক্ষণ মেয়েদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক উপহারের নামে তাদের নিকট প্রেরণ করে থাকি। এখন তারাও একজন আরেকজনকে নারী উপহার দেয়া শুরু করেছে। তাদের জাতীয় চরিত্র নিঃশেষ হয়ে গেছে। এটা আমাদের সাফল্য যে, আমরা তাদের মাঝে বিভেদ ও রাজত্বের মোহ সৃষ্টি করে দিয়েছি।'

'এই জাতিটাকে আমরা শেষ করে দেব'– রেজিনাল্ট বললেন– 'চরিত্র বিনষ্ট করার মাধ্যমেই তাদের সর্বনাশ ঘটাতে হবে। সালাহুদ্দীন আইউবী এই ভেবে উৎফুল্ল হয়ে থাকবেন যে, তিনি ভাই রেমন্ডকে পিছু হটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি জানেন না, রেমন্ড যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছপা হয়েছেন ঠিক; কিন্তু তার জাতির বুকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছেন। ময়দানে অবতীর্ণ হয়েই লড়াই করব, এটা জরুরী নয়। আমরা অন্য অঙ্গনেও লড়তে পারি।'

'এই অভিযানকে আরো তীব্রতর করে তোলা প্রয়োজন'– হাররান থেকে আগত উপদেষ্টা বলল– 'আমি আপনাদেরদেরকে গোমস্তগীনের ঘরের ঘটনাবলী শুনিয়েছি। তাতে প্রমাণিত হচ্ছে, ওখানে সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর ও নাশকতা কর্মী শুধু অবস্থানই করছে না; গোমস্তগীনের বাসভবন এবং তার সেনাবাহিনীর উচ্চতর পদেও পুরোপুরি তৎপর। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের ব্যবস্থা নেয়া দরকার।'

'আমাদের কী ঠেকাটা পড়েছে যে, আমরা সাইফুদ্দীন, আল-মালিকুস সালিহ ও তাদের যৌথ বাহিনীর অপরাপর আমীর প্রমুখকে সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতা থেকে রক্ষা করব?'– এক খৃস্টান কমান্ডার বলল– 'আমরা তো তাদের ধ্বংসের গতিকে আরো তীব্রতর ও ত্বরান্বিত করব। হোক তা আমাদের হাতে কিংবা তাদেরই জাতি ভাইয়ের হাতে। এই যেসব মুসলমান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, আপনি কি সত্য মনে তাদেরকে আমাদের বন্ধু মনে করে বসেছেন? তা-ই যদি হয়, তাহলে তার অর্থ হবে, আপনি খাঁটি খৃস্টান নন। আপনি বুঝতে পারেননি যে, আমাদের শত্রুতা না ছিল নূরুদ্দীন জঙ্গীর সঙ্গে, না আছে সালাহুদ্দীন আউইবীর সঙ্গে। সালাহুদ্দীন আইউবী যদি কখনো আমার সম্মুখে এসে পড়েন, তাহলে আমি তাকে শ্রদ্ধা করব। তিনি একজন যোদ্ধা, রণাঙ্গনের রাজা। আমাদের শত্রুতা হচ্ছে সেই ধর্মের সঙ্গে, যার নাম ইসলাম। যারা এই ধর্মের সুরক্ষা ও এর প্রচার-প্রসারে কাজ করবে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব। আমাদের এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর মৃত্যুর পরও এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। সে লক্ষ্যে

আমরা মুসলমানদের মধ্যে এমন কু-চরিত্র সৃষ্টি করছি, যা তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যেও বিস্তার লাভ করতে থাকবে। আমরা এমন পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করছি যে, মুসলমান তাদের নিজস্ব রীতি-নীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে আমাদের সৃষ্টি করা ও শেখানো চরিত্র-সভ্যতা লালন করবে।'

'আমাদেরকে তাদের আসল ধর্ম ও কালচার বিকৃত করতে হবে'– রেমন্ড বললেন– 'আমাদের এই অভিযান যখন পূর্ণতা লাভ করবে, সে সময়ে আমরা বেঁচে থাকব না। এই অভিযানের ফল আমরা দেখতে পাব না। আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, আমরা যদি এই অভিযান অব্যাহত রাখি, তাহলে এমন একটা সময় আসবে, যখন ইসলাম যদিও বেঁচে থাকে, তা হবে ইসলামের বিকৃত রূপ, যা পালনে মানুষ শুধুই বিভ্রান্ত হবে। মুসলমান হবে নামের মুসলমান। তাদের স্বাধীন-স্বতন্ত্র কোন রাজ্য থাকেও যদি, সেটি হবে পাপের আড্ডাখানা। ইহুদী ও খৃস্টান পন্ডিতগণ এই জাতিটার মধ্যে পাপের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

'সে যাই হোক, তারা এখন আমাদের সাহায্যের অপেক্ষায় বসে আছেন'– খৃস্টান উপদেষ্টা বলল– 'গোমস্তগীন আমাকে সে উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছেন।'

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এ বিষয়ে মতবিনিময় চলে। শেষে সিদ্ধান্ত হয়, সৈন্য পাঠিয়ে তার কোন সাহায্য করা হবে না। দেই দিচ্ছি বলে কালক্ষেপণ করতে হবে। তাকে এই বলে আশ্বস্ত করতে হবে যে, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর হামলা করে তাকে আলরিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ করতে বাধ্য কর। আমরা তারই কোন একটা স্পর্শকাতর স্থানে সেনা অভিযান চালিয়ে তাকে এমন বেকায়দায় ফেলে দেব যে, তিনি আলরিস্তান ত্যাগ করে পেছনে সরে যেতে বাধ্য হন। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হল, হাল্‌ব, হাররান ও মসুলের সৈন্যদের জন্য এই উপদেষ্টার সঙ্গে তীর-ধনুক ও দাহ্য পদার্থ পাঠিয়ে দেয়া হবে। তাছাড়া পাঁচশত ঘোড়াও প্রেরণ করা হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, অধিকাংশ ঘোড়াই যেন এমন হয়, যেগুলো আমাদের সৈন্যদের কাজে আসে না, কিন্তু বাহ্যিকভাবে সুস্থ ও সবল।'

'আর ভবিষ্যতে সেই আমীর প্রমুখকে অল্প অল্প করে অস্ত্র সরবরাহ করা হবে'– রেজিনাল্ট বললেন– 'সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে তাদেরকে বিলাসিতার দিকে টেনে আনতে হবে। তাদেরকে বুঝ দিয়ে রাখতে হবে যে, যখনই তাদের অস্ত্র কিংবা ঘোড়ার প্রয়োজন পড়বে, তা সরবরাহ করা হবে। এভাবে তারা নিজেরা নিজেদের ব্যবস্থা গ্রহণে উদাসীন হয়ে পড়বে এবং আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে

থাকবে। এসব সাহায্য-সহযোগিতা এবং আমাদের উপদেষ্টাদের মধ্যস্থতায় আমরা তাদের মন-মস্তিষ্কের উপর জয়লাভ করে ফেলব।'

'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা কিন্তু বলা হয়নি'– এক কমান্ডার বলল– 'শেখ সান্নানের পাঠানো নয় সদস্যের ঘাতক দল রওনা হয়ে গেছে। আশা করছি, এবার তারা সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা না করে ফিরবে না। তারা যে শপথ নিয়ে গেছে, তাতে তারা এ কথাও বলেছে যে, জীবন বাজি রেখে তারা আইউবীকে হত্যা করবে। অন্যথায় তারা জীবিত ফিরে আসবে না।'

সেদিনই পাঁচশত ঘোড়া, কয়েক হাজার ধনুক, লক্ষাধিক তীর ও দাহ্য পদার্থ ভর্তি কয়েকটি মটকা হাল্‌বের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সঙ্গে একখানা বার্তাও দেয়া হয়, যাতে লেখা ছিল– 'এই সাহায্যের ধারা চলতে থাকবে। আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর এক্ষুণি আক্রমণ করুন।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাঁর হেডকোয়ার্টারে বসে আছেন। তাঁর নিকট সর্বপ্রথম আনতানুন ও সাদিয়া গিয়ে পৌঁছে। সাদিয়া গোমস্তগীনের হেরেমের সেই মেয়ে, যে একজন খৃস্টান উপদেষ্টাকে খুন করে আনতানুন নামক রক্ষী সেনার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। আনতানুন সুলতান আইউবীর এমন এক গোয়েন্দা, যে আবেগের বশবর্তী হয়ে সীমালংঘন করে ফেলেছিল। যার ফলে সে গ্রেফতার হয়েছিল। সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখত কৌশল করে তাকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সুলতান আইউবীর ইন্টেলিজেন্স প্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আনতানুন ও সাদিয়াকে সুলতানের নিকট নিয়ে যান। আনতানুন সুলতানকে তার ইতিবৃত্ত অবিকৃতরূপে শোনায়। আনতানুনের এই কর্মনীতি সুলতানের পছন্দ না হলেও তিনি তাকে এই বলে ক্ষমা করে দেন যে, যেরূপ সাফল্যের সঙ্গে তুমি গোমস্তগীনের রক্ষী বাহিনীতে ঢুকে পড়েছিলে, তা তোমার বিরাট কৃতিত্ব। সাদিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে হেরেম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়াও তার আরেক কৃতিত্ব। সুলতান আইউবী আনতানুনের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেন, একে সেনাবাহিনীতে পাঠিয়ে দাও। কারণ, গুপ্তচরবৃত্তির নাজুক কাজের জন্য এর আবেগ নিয়ন্ত্রিত নয়। আর সাদিয়াকে দামেস্ক পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ দেন।

'আমি আনতানুনকে বিয়ে করতে চাই'– সাদিয়া বলল।

'তা-ই হবে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'কিন্তু বিয়েটা হবে দামেস্কে। যুদ্ধের ময়দান শহীদ হওয়ার স্থান– বিয়ের জায়গা নয়।'

'মহামান্য সুলতান!'– আনতানুন বলল– 'আমি আপনাকে অসন্তুষ্ট করেছি। তার শাস্তিস্বরূপ যতক্ষণ না আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারি, ততক্ষণ বিয়ে করব না।' সে সাদিয়াকে উদ্দেশ করে বলল– 'তুমি সুলতানের আদেশ মোতাবেক দামেস্ক চলে যাও। সেখানে তোমার বসবাসের ভাল ব্যবস্থা হবে। আমার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।' সে আবার সুলতান আইউবীকে বলল– 'আমি কোন একটা কমান্ডো বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে কাজ করতে চাই; আপনি আমার এই আবেদনটুকু মঞ্জুর করুন। আমি গেরিলা হামলার প্রশিক্ষণ নিয়েছি।'

আনতানুনকে একটি কমান্ডো দলে পাঠিয়ে দেয়া হল। বৈঠক থেকে বিদায় নেয়ার সময় সাদিয়ার প্রতি এক নজর তাকালও না সে।

পরদিন যখন সাদিয়ার দামেস্ক রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক তখন সেই মেয়েগুলো এসে পৌঁছে, যাদেরকে আল-মালিকুস সালিহ গোমস্তগীনের নিকট উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে রয়েছে সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখতের প্রেরিত দু'ব্যক্তি। হাররানে কী সব ঘটনা ঘটছে, তারা সুলতান আইউবীকে তার কাহিনী শোনায়।

'ফিলিস্তিনের মুসলমানরা যে আপনার পথ পানে তাকিয়ে আছে, তা কি আপনি জানেন?' এক মেয়ে বলল– 'সেখানকার মেয়েরা আপনার নামে গান গায়। মসজিদে মসজিদে আপনার বিজয়ের জন্য দু'আ হয়।'

অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে খৃস্টানরা কিভাবে মুসলমানদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছে এবং পৃথিবীটাকে তাদের জন্য জাহান্নামে পরিণত করেছে, মেয়েটা তার বিবরণ প্রদান করে।

'সেখানে শুধু আমাদের মেয়েদের নয়; জাতীয় মর্যাদারও শ্লীলতাহানি চলছে'– অপর এক মেয়ে বলল– 'আমি বরং বলব, জাতির শ্লীলতাহানি আমাদের শাসকরাই করছে। আমাদেরকে গোমস্তগীনের নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছিল। আমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলেছি, আমরা আপনাদেরই কন্যা। কিন্তু তারা আমাদের কোনই আবেদন-আর্তি শোনেননি, তারা আমাদেরকে একজন অপরজনের নিকট উপহার হিসেবে দান করা শুরু করেছেন।'

'ফিলিস্তীনের পথের প্রতিবন্ধকও তারাই'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি ফিলিস্তীনের উদ্দেশ্যেই ঘর থেকে বের হয়েছিলাম। কিন্তু আমার ভাইয়েরা আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেছে। যা হোক, এখন তোমরা

নিরাপদ। তোমাদের আগে আরো একটি মেয়ে এখানে এসেছিল। তাকে দামেস্ক পাঠানো হচ্ছে। তোমরাও তার সঙ্গে চলে যাও।'

'আমরা প্রতিশোধ নিতে চাই'– এক মেয়ে বলল– 'আমাদেরকে এখানেই রেখে দিন এবং কাজ দিন। আমরা এখন আর কোন হেরেম কিংবা কোন গৃহে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাই না।'

'আমি এখনো জীবিত আছি'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তোমরা দামেস্কে চলে যাও। সেখানে তোমাদেরকে কেউ আবদ্ধ করে রাখবে না। সেখানে আরো কয়েকটি মেয়ে বিভিন্ন উপায়ে আমাদের সাহায্য করছে। সেখানে তোমাদেরকেও কোন একটা দায়িত্ব দেয়া হবে।'

মেয়েগুলোকে বিদায় দিয়ে সুলতান আইউবী অস্থির মনে এদিক-ওদিক পায়চারি করতে শুরু করেন। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তার সঙ্গে আছেন। তিনি বললেন– 'মিশর থেকে রিজার্ভ ফোর্স এখনো এসে পৌঁছেনি। তিনটি বাহিনী যদি আমাদের উপর আক্রমণ করতে এসে পড়ে, তাহলে আমরা সমস্যায় পড়ে যাব। মনে হচ্ছে, আমাদের সৈন্য যে কম এবং আমি সাহায্যের অপেক্ষায় আছি, তা দুশমন জানে না। তাদের স্থলে যদি আমি হতাম, তাহলে এক্ষুণি আক্রমণ করে বসতাম এবং রসদের পথ বন্ধ করে দিতাম।'

'মিশর থেকে সাহায্য আসবে, তাতে সন্দেহ নেই'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'মোহতারাম আল-আদেল এমন লোক তো নন যে, তিনি সময় নষ্ট করবেন। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, দুশমন আমাদের সরবরাহ পথ বন্ধ করেনি।'

সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন, সে সময়টা ছিল সুলতান আইউবীর জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও বিপদসংকুল। তিনি মিশর থেকে বিশেষ সাহায্যের অপেক্ষা করছিলেন। সে মুহূর্তে যদি আল-মালিকুস সালিহ, সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগীনের সম্মিলিত বাহিনী সুলতান আইউবীর উপর হামলা করে বসত, তাহলে তাকে সহজেই পরাজিত করতে পারত। কারণ, তার সৈন্য ছিল খুবই কম। তিনি পাহাড়ী অঞ্চলে মরু এলাকার কৌশল প্রয়োগ করতে পারতেন না। কিন্তু তার শত্রুপক্ষ কী ভাবছিল, তা কে জানে। খৃস্টানরা তার উপর আক্রমণ করার পরিবর্তে মুসলিম আমীরদেরকে তার বিরুদ্ধে লড়াতে চাচ্ছিল। তারাও দেখল না যে, সুলতান আইউবী এক অসহায় অবস্থায় বসে বসে আল্লাহর নিকট দু'আ করছেন– 'ইয়া আল্লাহ! এই অসহায় পরিস্থিতিতে দুশমন যেন আমার উপর ঝাঁপিয়ে না পড়ে; তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

যুদ্ধ বেঁধে গেলে ফৌজের ঘোড়া ও উটগুলাকে যে নদী থেকে পানি পান করাতে হবে, সেটির দখল বজায় রাখার শক্তিও তার ছিল না। খৃস্টান কিংবা তার মুসলিম শত্রুপক্ষ যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করত, তাহলে গেরিলাদের দ্বারা তারা আইউবীর রিজার্ভ বাহিনীর আগমন ও রসদের পথটা বন্ধ কিংবা নতুন বাহিনীর আগমনের গতি শ্লথ করে দিতে পারত। সুলতান আইউবী টহল কমান্ডোদের দ্বারা সে পথটা নিরাপদ করে রেখেছিলেন।

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ– যিনি সে সময়কার প্রত্যক্ষদর্শী ও ঘটনার বিশ্লেষক– তার রোজনামচায় 'সুলতান ইউসুফ (সালাহুদ্দীন আইউবী)-এর উপর কি বিভীষিকা নেমে এসেছিল' শিরোনামে লিখেছেন–

'আল্লাহ যদি তাদেরকে (শত্রুপক্ষকে) বিজয় দান করতে ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা তখনই সুলতান আইউবীর উপর হামলা করে বসত। কিন্তু আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করতে চান, সে লাঞ্ছিতই থাকে। তারা সুলতান আইউবীকে এতটুকু সময় ও সুযোগ দিয়ে দেয় যে, মিশর থেকে নতুন ফোর্স এসে পৌঁছে যায়। সুলতান তাদেরকে তার বাহিনীর সঙ্গে একীভূত করে নতুন বিন্যাস তৈরি করে নেন। তিনি হামলার আগে সবক'টি ঘোড়াকে পানি পান করিয়ে নেন এবং প্রচুর পানি রিজার্ভ করে রাখেন।

সুলতান আইউবীর ব্যাকুলতার অবস্থা এই ছিল যে, তিনি রাতে ঘুমাতেন না। তিনি যেখানে যেখানে সেনা স্থাপন করেছেন, সব ক'টি পয়েন্টে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন, ভাবতেন এবং এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা দুশমনের হামলা প্রতিহত করার পরিকল্পনাটা ঝালাই করে নিতেন। হামাত শিংয়ে যে স্থানে একটি পাহাড় শিং-এর ন্যায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, তিনি সেটিকে দুশমনের জন্য ফাঁদ হিসেবে প্রস্তুত করে রাখেন। কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে, এত স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা তিনি কেবল প্রতিরোধ যুদ্ধই লড়তে পারতেন। যুদ্ধের পটভূমি পাল্টে দেয়ার জন্য যে জবাবী আক্রমণের প্রয়োজন, তার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। তার গোয়েন্দারা তাকে তথ্য প্রদান করেছিল যে, খৃস্টানরা মুসলিম আমীরদেরকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে এমনভাবে লড়াবার চেষ্টা করবে, যাতে যুদ্ধ প্রলম্বিত হয়, যেন সুলতান আইউবী পাহাড়ী এলাকা থেকে বের হতে না পারেন এবং অবরুদ্ধ থেকে প্রতিরোধ লড়াই করতে করতে শেষ হয়ে যান।

কিন্তু সুলতান আইউবীর গোয়েন্দারা তাকে এ তথ্য জানাতে পারেনি যে, নয় সদস্যের একটি ঘাতক দল তাকে হত্যা করতে আসছে। অপরদিকে সুলতানের

দৃষ্টিও নিজের জীবনের প্রতি নয়, রণাঙ্গনের উপর নিবদ্ধ। তিনি পর্যবেক্ষণের জন্য দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সৈন্য ছড়িয়ে রেখেছেন।

এর পরদিনই হাররান থেকে সুলতান আইউবীর এক দূত এসে পৌঁছে। সে সংবাদ নিয়ে আসে, সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখত কারাগারে আটক রয়েছেন। তারা কাজী ইবনুল খাশিবকে খুন করেছেন। গোয়েন্দা এই হত্যাকাণ্ডের কারণ জানতে পারেনি। সংবাদটা শোনামাত্র সুলতান আইউবীর চেহারার রং বদলে যায়। এই দু'সহোদরের সঙ্গে তিনি অনেক আশা-ভরসা যুক্ত করে রেখেছিলেন। তাদের জানা ছিল, গোমস্তগীনের ফৌজের কমান্ড এই দু'ভাইয়ের হাতে থাকবে এবং তাদের বাহিনী লড়াই না করে স্বেচ্ছায় তার হাতে আত্মসমর্পণ করবে। গোয়েন্দা এ তথ্যও প্রদান করে যে, এখন গোমস্তগীন নিজে ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে ফৌজের কমান্ড করবেন। গোয়েন্দা আরো জানায়, গোমস্তগীন তার বাহিনীকে যৌথ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে লড়াই করবেন।

'হাসান ইবনে আবদুল্লাহ!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'শামসুদ্দিন ও শাদবখতকে যেন বেশিদিন গোমস্তগীনের কারাগারে থাকতে না হয়। এর নিকট থেকে জেনে নাও, হাররানে আমাদের কতজন লোক আছে এবং তারা তাদেরকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনতে পারবে কিনা। আমার আশংকা হচ্ছে, গোমস্তগীন তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। এরা যে আমার গোয়েন্দা, গোমস্তগীন তা জেনে ফেলেছে। আমি হাররান গিয়ে অবরোধ করে দুর্গ জয় করে তাদেরকে মুক্ত করব, এতটুকু সময় অপেক্ষা করতে পারব না। গোমস্তগীন কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই তুমি তাদেরকে কয়েকখানা থেকে মুক্ত করে আন। আমি আমার এই দুই সালারের জন্য দুইশ' কমান্ডোর জীবন খোয়াতেও প্রস্তুত আছি। হাররানে পর্যাপ্ত লোক না থাকলে এখান থেকে কমান্ডো পাঠাও।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।' হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন।

❁ ❁ ❁

হাল্‌ব এখন সুলতান আইউবীর বিরোধী পক্ষের কেন্দ্র। সাহায্য হিসেবে খৃস্টানদের প্রেরিত তীর-ধনুক ও দাহ্য পদার্থের মটকা ও ঘোড়াগুলো হাল্‌ব পৌঁছে গেছে। খৃস্টানরা হাল্‌বের লোকদের মধ্যে একটি গুণ এই প্রত্যক্ষ করেছিল যে, তারা অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে সুলতান আইউবীর অবরোধের মোকাবেলা করেছিল। সালতানাতের রাজধানীও এখন হাল্‌ব। খৃস্টান উপদেষ্টাগণ মসুলে সাইফুদ্দীনকে এবং হাররানে গোমস্তগীনকে সংবাদ

পাঠায় যে, আপনাদের সম্মিলিত বাহিনীর জন্য সাহায্য এসে গেছে, আপনারা বিলম্ব না করে চলে আসুন। ঐতিহাসিকদের বিবরণ মোতাবেক হাল্‌ব নগরীর বাইরে একস্থানে এই তিন মুসলিম শাসকের সাক্ষাৎ ঘটে এবং সেখানে বসে তাদের মাঝে একটি অলিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি কি ধরনের হবে, তা ঠিক করে খৃস্টান উপদেষ্টাগণ।

সেই রাতের ঘটনা। মসুলের কারাগারে বসে খতীব ইবনুল মাখদুম প্রদীপের আলোতে কুরআন পাঠ করছিলেন। তার কন্যা সায়েকা সেই ভবনটির একটি কক্ষে অবস্থান করছে, বস্তাবন্দী হয়ে যে ভবনে এসে সে পৌঁছেছিল, তার সঙ্গে যে রক্ষী সেনাকে ধরে আনা হয়েছে, সে অন্য কক্ষে। ভবনটিতে তারা ব্যতীত আরো দু'জন লোক আছে, যারা তাদেরকে তুলে এনেছিল। তাদের অবশিষ্ট সঙ্গীরা কয়েদখানার বাইরে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেয়ালের উপরিভাগ দুর্গের দেয়ালের মত, যার উপর মোর্চার মত তৈরি করা আছে। উপরে কয়েকজন সান্ত্রী ঘোরাফেরা করছে। তাদের সংখ্যা বেশি নয়। যে জেল কর্মকর্তা খতীবকে পালাবার সুযোগ করে দেয়ার ওয়াদা দিয়েছিলেন, তিনি সান্ত্রীদের প্রতি দৃষ্টি রেখে ঘোরাফেরা করছেন। যে দেয়ালের নীচে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, তিনি তার উপরের সান্ত্রীকে ডেকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

জেল কর্মকর্তা কি যেন একটা ইঙ্গিত করেন। নীচে লুকিয়ে থাকা লোকগুলো উপর দিকে একটি রশি ছুঁড়ে দেয়। রশির এক মাথা একটি লাঠির মধ্যখানে বাঁধা। লাঠিটা কাপড় পেঁচানো, যাতে দেয়ালের উপরে নিক্ষিপ্ত হয়ে শব্দ না করে। লাঠিটা উপরে গিয়ে আটকে যায়। একে তো অন্ধকার, তদুপরি কর্মকর্তা সান্ত্রীকে নিয়ে দূরে চলে গেছেন। চারজন লোক রশি বেয়ে উপরে উঠে যায়। তারা এই রশিটাই টেনে তুলে নিয়ে দেয়ালের অপরদিকে ছেড়ে দেয়। চারজন খঞ্জর বের করে নিজ নিজ মুখে চেপে ধরে রশি বেয়ে নীচে নেমে যায়। জেল কর্মকর্তা তাদেরকে ভেতরের মানচিত্র বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ভেতরে কিছুটা আলো আছে। স্থানে স্থানে প্রদীপ জ্বলছে। জেল কক্ষের সারিতে মাথায় এক স্থানে একটুখানি বারান্দা। এই সান্ত্রী ওখানে পায়চারি করছে। চার ব্যক্তি লুকিয়ে যায়। সান্ত্রী তাদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলে একজন বলল, 'এদিকে একটু আসুন তো ভাই।' সান্ত্রী দ্রুতগতিতে তাদের নিকট গিয়ে পৌঁছে। অমনি দু'ব্যক্তি তাকে ঝাপটে ধরে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে খঞ্জর মেরে কাজ সমাধা করে দেয়।

চার ব্যক্তি চুপি চুপি সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। একজন একটু বেশি

এগিয়ে যায়। অপর তিনজন বিক্ষিপ্তভাবে চুপিসারে তাকে অনুসরণ করে এগুতে থাকে। সামনের লোকটি কয়েদখানার গোলাকার একটা জায়গায় পৌঁছে যায়। খতীবের প্রকোষ্ঠটা এখানেই। লোকটা খতীবের কুঠুরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। খতীব দরজার দিকে তাকান। তিনি কুরআনখানি বন্ধ করে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে আসেন। লোকটার হাতে বড় একটা চাবি। জেল কর্মকর্তা এক কর্মকার দিয়ে চাবিটা তৈরি করে দিয়েছেন। কয়েকখানার চাবি সম্পর্কে সে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। লোকটি চাবিটা তালায় ঢুকায়। তালা খুলে যায়। খতীব এখন কক্ষের বাইরে। তালাটা খুলে দিয়েই কমান্ডো ফেরত রওনা হয়ে যায়।

পিছন দিকে কতটুকু সরে আসার পর কমান্ডো কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বর– 'কে? দাঁড়াও।' এদিক থেকে জবাব দেয়া হয়– 'কাছে আস দোস্ত!' লোকটি কমান্ডোর নিকটে এগিয়ে আসামাত্র একটি খঞ্জর তার হৃদপিণ্ডে গেঁথে যায়। লোকটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লে পেছন দিক থেকে আরেকটি খঞ্জর তাকে আঘাত হানে। লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কমান্ডো খতীবকে নিয়ে রশির নিকট চলে যায়।

সর্বপ্রথম এক কমান্ডো দেয়ালের উপরে ওঠে। তারপর উঠেন খতীব। জেল কর্মকর্তা সান্ত্রীকে এখনো দূরে কোথাও আলাপে মাতিয়ে রেখেছেন। খতীবসহ একে একে সব কমান্ডো দেয়ালের উপর উঠে যায়। তারপর রশিটা টেনে তুলে বাইরের দিকে ছেড়ে দেয় এবং সকলে নীচে নেমে আসে। জেল কর্মকর্তা কয়েদখানার বাইরের দিক থেকে শিয়ালের হুক্কা হুয়া ডাকের ন্যায় শব্দ শুনতে পায়। সে সান্ত্রীকে আরেক দিকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে সেই জায়গায় চলে আসে, যেখানে রশি ঝুলানো হয়েছিল। সে দ্রুত রশিটা সরিয়ে ফেলে।

সায়েকা ও বডিগার্ড যে গৃহে অবস্থান করছে, এরা সকলে সেখানে চলে যায়। পিতাকে দেখে সাায়েকা আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

যখন ভোর হল, তখন মসুল থেকে কয়েক মাইল দূরে চারটি ঘোড়া ছুটে চলছিল। একটির আরোহী খতীব। একটিতে সায়েকা। একটিতে সাইফুদ্দীনের কারা কর্মকর্তা এবং চতুর্থটিতে অপর এক ব্যক্তি। এ লোকটি সুলতান আইউবীর গুপ্তচর। যে দলটি সাইফুদ্দীনের বডিগার্ডকে ধরে এনেছিল, লোকটি তাদের একজন। এ লোকটিই বডিগার্ড থেকে বড় মূল্যবান তথ্য বের করেছিল। তারা যখন মসুল থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছিল, ততক্ষণে বডিগার্ড সমাধিস্থ হয়ে গেছে। রাতে এ দলটি মসুল ত্যাগ করার সময় বডিগার্ডকে খুন করে গিয়েছিল।

সাইফুদ্দীনের কয়েদখানার অবস্থা শোচনীয়। ভেতরে দু'জন সান্ত্রীর লাশ পড়ে আছে। খতীব উধাও। কর্মকর্তার পাত্তা নেই। বডিগার্ড খতীব কন্যা সায়েকাকে নিয়ে যথাসময়ে না পৌঁছায় সাইফুদ্দীন ধরে নিয়েছিলেন, বডিগার্ড গাদ্দারী করেছে। তার ধারণা, মেয়েটার রূপ-সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে লোকটার মাথা বিগড়ে গেছে। তাই সে মেয়েটাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। কিন্তু তার কল্পনায়ও আসেনি যে, তার দেহরক্ষী সায়েকাসহ আইউবীর কমান্ডোদের হাতে ধরা পড়েছে।

সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখত গোমস্তগীনের কারাগারে বন্দী। সুলতান আইউবী নির্দেশ প্রদান করেছেন, তাদেরকে ওখান থেকে বের করে আনার ব্যবস্থা কর। কিন্তু তারা হাররানে যেসব লোক তৈরি করে রেখেছেন, তারা সে ব্যবস্থা আগেই করেছে। এই দুই সালার সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে এক একজন ও দু-দু'জন করে নিজেদের লোক ঢুকিয়ে রেখেছেন। তবে তাদের পলায়নে বড় সমস্যা হল, তারা যেখানে বন্দী রয়েছেন, সেটা কয়েদখানার পাতাল কক্ষ। সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য বিশেষ কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেছেন। সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখতের মুক্তির পথ বেরিয়ে এসেছে। হাল্ব থেকে গোমস্তগীনের তলব এসেছে। তিনি তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, উপদেষ্টা ও রক্ষীদের নিয়ে হাল্বের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন। শামসুদ্দীন ও শাদবখতের বন্দী হওয়ার সংবাদ গোমস্তগীনের একান্ত ঘনিষ্ঠ লোকজন ব্যতীত কেউ জানত না। কাজী ইবনুল খাশিবের হত্যাকাণ্ডের খবরও গোপন রাখা হয়েছে। সেনাবাহিনী পর্যন্ত এখনো জানে না, তাদের ঊর্ধ্বতন দু'জন সালারকে কয়েকখানায় নিক্ষেপ করা হয়েছে।

গোমস্তগীনের রওনা হয়ে যাওয়ার একদিন পর জেলার দেখতে পান যে, তিনজন অশ্বারোহী কারাগারের দিকে ছুটে আসছে। ঘোড়াগুলো আরো নিকটে আসার পর দেখা গেল, তাদের সঙ্গে আরো দু'টি শূন্য ঘোড়া রয়েছে। ঘোড়াগুলো কয়েদখানার গেটে এসে দাঁড়িয়ে যায়। এক আরোহী হাররানের সামরিক পতাকা উঁচিয়ে রেখেছে। এই পতাকাটা যুদ্ধের ময়দানে প্রধান সেনাপতির হাতে থাকে। অশ্বারোহীদের মধ্যে একজন কমান্ডার। অপর দু'জন সাধারণ সৈনিক। সম্ভবত তারা রক্ষীবাহিনীর সদস্য। জেলার প্রধান ফটকের ফাঁক দিয়ে বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি কমান্ডারকে চিনেন। ফটক খুলে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন। কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করেন 'কেন এসেছ?'

‘রাজা-বাদশাদের আদেশ-নিষেধের কোন তাল থাকে না’– কমান্ডার বলল– ‘আমাদের শাসনকর্তা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এমন দু’জন সালারকে জেলে পুরে রেখেছেন, যাদের ছাড়া ফৌজ এক পা-ও চলতে পারে না। এখন আবার আদেশ করলেন, তাদেরকে জেল থেকে বের করে আন।’

‘তার মানে আপনারা সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখকে নিতে এসেছেন?’ জেলার জিজ্ঞেস করেন।

‘হ্যাঁ’– কমান্ডার বলল– ‘তাদেরকে জলদি নিয়ে যেতে হবে।’

‘দুর্গপতি গোমস্তগীনের লিখিত কোন নির্দেশনামা নিয়ে এসেছেন?’– জেলার জিজ্ঞেস করেন– ‘তিনি তো বাইরে কোথায় যেন চলে গেছেন?’

‘আমি তার নিকট থেকেই এসেছি’– কমান্ডার বলল– ‘আমি রাতেই এসে পড়েছি। তখন তার এতটুকু হুঁশ ছিল না যে, নির্দেশনামা লিখে দেবেন। আমাদের ফৌজ হাল্‌ব ও মসুলের ফৌজের সঙ্গে মিলে সুলতান আইউবীর উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে। সময় নষ্ট করলে আইউবীই উল্টো আমাদের উপর হামলা করে বসবেন। বিপদ বেড়ে গেছে। গোমস্তগীন এ ব্যাপারেই হাল্‌ব গেছেন। মাথার উপর বিপদ দেখার পর এখন তার হুঁশ ফিরে এসেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, এ দু’সালার ব্যতীত তিনি লড়াই করতে পারবেন না। তাই আমাকে হাল্‌বের রাস্তা থেকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। পতাকাটা দিয়ে বলেছেন, তাদেরকে এই পতাকা উড়িয়ে পূর্ণ মর্যাদার সাথে নিয়ে আস। আপনি জলদি করুন।’

জেলার কমান্ডারকে ভেতরে নিয়ে যান। সৈনিকদ্বয়ও তাদের সঙ্গে চলে যায়। তারা পাতাল কক্ষে ঢুকে পড়ে। শামসুদ্দীন ও শাদবখত আলাদা আলাদা দু’টি কক্ষে আবদ্ধ। প্রথমে একজনকে বের করে আনা হল। কমান্ডার তাকে সামরিক কায়দায় সালাম করে বলল– ‘হাররানের আমীর গোমস্তগীন আপনার মুক্তির নির্দেশ পাঠিয়েছেন। আপনার ঘোড়া ও ব্যক্তিগত দেহরক্ষী আমাদের সঙ্গে আছে। আপনার জন্য নির্দেশ হল, প্রস্তুতি নিয়ে এক্ষুণি হাল্‌ব পৌঁছে যাবেন।’

‘মনে হয়, মদের নেশা কেটে গেছে।’ সালার বললেন।

‘আমি এমন কেউ নই যে, আপনার অভিমত সমর্থন কিংবা প্রত্যাখ্যান করতে পারি’– কমান্ডার বলল– ‘আমার কাজ নির্দেশ পৌঁছানো আর আপনার সঙ্গে যাওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।’

জেলার মনোযোগ সহকারে তাদের কথাবার্তা শ্রবণ করেন। তিনি নিশ্চিত

হন যে, বিষয়টা সঠিক। কিন্তু অপর সালারকে বের করে আনতে গিয়েই জেলারের মনে সন্দেহ জাগে। এই সালার কমান্ডারকে দেখামাত্র আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন– 'তোমরা এসে পড়েছ? সব ঠিক আছে তো?' তিনি জেলারের উপস্থিতি অনুধাবন করে সে অনুপাতে কথা বলতে ব্যর্থ হন। জেলার আনাড়ী লোক নন। তার কর্মজীবনটা পুরোটাই কাটে কারাগারে। তিনি কক্ষের তালা খুলে দিয়েছিলেন। মনে সন্দেহ জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার তালাটা লাগিয়ে দেন এবং বললেন– 'লিখিত নির্দেশনামা ব্যতীত আমি এদেরকে মুক্তি দিতে পারব না।'

কমান্ডার থাবা দিয়ে তার হাত থেকে চাবিটা ছিনিয়ে নেয়। সালারদের দেহরক্ষী হিসেবে আসা সৈনিকদ্বয় জেলারের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। তারা খঞ্জর বের করে খঞ্জরের আগা জেলারের পিঠের উপর ঠেকিয়ে রাখে। কমান্ডার তাকে কানে কানে বলল– 'এ মুহূর্তে তুমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কমান্ডোর কব্জায় আটক রয়েছ। তুমি তো জান, আইউবীর কমান্ডোরা কী করতে পারে। আর একটা শব্দও যেন মুখ থেকে বের না হয়।'

কমান্ডার তালা খুলে কক্ষের দরজা খুলে ফেলে। জেলারকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, যাতে আশপাশ থেকে কেউ বুঝতে না পারে যে, এখানে কোন অপরাধ হচ্ছে। ভেতরে ঢুকিয়ে তাকে ছিদ্রওয়ালা দরজার নিকট থেকে সরিয়ে আড়ালে নিয়ে যায়। এক সৈনিক দ্রুত এক টুকরো রশি দ্বারা, যা বড়জোর পৌনে এক গজ লম্বা হবে– তার গলাটা পেঁচিয়ে ধরে রশিটাকে একটা মোড় দেয় এবং দু'-তিনটি ঝটকা টান মারে। জেলারের চোখ দু'টো কোটর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। লোকটি শীতল হয়ে যায়।

নিথর-নিস্তব্ধ জেলারকে পাথরের মেঝেতে ফেলে রাখা হল। লাশের উপর একখানা কম্বল ছড়িয়ে দেয়া হল। সালার আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে এই সমস্যাটা সৃষ্টি করে দিলেন।

শামসুদ্দীন ও শাদবখতকে নিয়ে বের হয়ে কমান্ডার দরজায় তালা লাগিয়ে দেয় এবং চাবিটা নিয়ে নেয়। বাইরের দরজাগুলোর চাবিও জেলারের নিকট ছিল। কমান্ডার সেগুলোও নিয়ে নেয়। এই দলটি সেখান থেকে রওনা হয়। তারা পাতাল কক্ষ থেকে উপরে উঠে আসলে পাতালের সান্ত্রী নীচে গিয়ে শূন্য প্রকোষ্ঠগুলো পর্যবেক্ষণ করে। সে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছিল, জেলার দু'জন কয়েদীকে মুক্তি দিচ্ছেন। কয়েদী দু'সালারকে সে বেরিয়ে যেতেও দেখেছে। কিন্তু নীচে গিয়ে দেখতে পায়, এক প্রকোষ্ঠে কে একজন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে

আছে। লোকটা কে, চিনতে পারল না সে। অপর কক্ষটি শূন্য। সে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা লোকটাকে ডাক দেয়। কিন্তু তার কোন সাড়া নেই। দরজা তালাবদ্ধ। সান্ত্রী দেয়ালের ছিদ্রপথে হাতের বর্শাটা ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। বর্শার আগা লোকটি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বর্শার আগা দ্বারা লোকটাকে খোঁচা মারে। তারপরও সে উঠল না। বর্শা দ্বারা গায়ের কম্বলটা সরিয়ে লোকটার মুখমণ্ডল উদাম করে। সহসা চমকে উঠে সান্ত্রী। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাটা দিয়ে উঠে তার। ইনি যে কারাগারের জেলার! চোখ ও মুখমণ্ডলে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, লোকটা মৃত।

সান্ত্রী সেখান থেকেই চিৎকার শুরু করে দেয়– 'সাবধান! সাবধান! আসামী পালিয়ে গেছে।' সে দৌড়ে উপরে উঠে আসে। তার ডাক-চিৎকারের সূত্রে নাকাড়া বাজতে শুরু করে। ততক্ষণে পলায়নরত দলটি প্রধান ফটকে পৌঁছে গেছে। সান্ত্রীরা ছুটে বেড়াচ্ছে। প্রধান ফটকের চাবিগুলো কমান্ডারের নিকট। তারা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয় এবং ভেতরের তালায় চাবি ঢুকায়। সান্ত্রী দূর থেকে চিৎকার করে বলল– 'ওদেরকে ধরে ফেল? ওরা আমাদের জেলারকে খুন করে পালাচ্ছে।'

নাকাড়ার আওয়াজে কয়েদখানার সকল সান্ত্রী যার যার ডিউটিতে পৌঁছে গেছে। বাইরের রক্ষীরাও ছুটে এসেছে। ফটক খুলে গেছে। যে নাকাড়া বাজানো হয়েছে, তা হচ্ছে বিপদ সংকেত। তাই বাইরে থেকে ছুটে আসা রক্ষীসেনারা তাদের প্রশিক্ষণ মোতাবেক দ্রুততার সাথে ফটকে ঢুকে পড়ে। তাদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় বিপদ এই হতে পারে যে, হয়ত কয়েদীরা বিদ্রোহ করে বসেছে কিংবা কারাগারের কোথাও আগুন লেগে গেছে। যে সান্ত্রী ডাক-চিৎকার করে ফিরছিল, সে বাইরে থেকে আগত সান্ত্রীদের ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। এই হুলস্থুল পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে পলায়নপর লোকগুলো ফটক অতিক্রম করে বেরিয়ে যায়। বাইরে ঘোড়া দণ্ডায়মান। তারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে।

ঘোড়া ছুটতে শুরু করলে একজন পেছন দিকে থেকে চিৎকার দেয়– 'থাম, অন্যথায় মারা যাবে।' তারা ক্ষিপ্রগতিতে ঘোড়া হাঁকায়। পেছন থেকে একসঙ্গে এক ঝাঁক তীর ধেয়ে আসে। দু'টি তীর কমান্ডারের পিঠে গেঁথে যায় এবং একটি এক সালারের ঘোড়ার পেছন অংশে আঘাত হানে। কমান্ডার দেহে দু'টি তীর নিয়েও আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। সালার শামসুদ্দীনের ঘোড়া তীর খেয়ে লাফিয়ে ওঠে। শামসুদ্দীন ঘোড়াটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন এবং তাকে

কমান্ডারের ঘোড়ার পাশে নিয়ে গিয়ে লাফ দিয়ে তার ঘোড়ায় চড়ে বসেন। কমান্ডারের হাত শিথিল হয়ে আসে। শামসুদ্দীন তার হাত থেকে ঘোড়ার লাগামটা নিয়ে নেন। পেছন থেকে আরো তীর আসে। কিন্তু ঘোড়ার গতি দ্রুত থাকায় নিশানা ব্যর্থ হয়।

তারা পেছন দিকে তাকায়। সাইফুদ্দীনের কয়েদখানা এখন তাদের থেকে অনেক দূরে। কিন্তু দশ-বারজন অশ্বারোহী তাদেরকে ধাওয়া করছে। সামনে উন্মুক্ত মাঠ। পলায়নকারীরা তীব্রগতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলছে। তাদের অস্ত্রের অভাব। উভয় সালার নিরস্ত্র। কমান্ডার ধীরে ধীরে নিথর হয়ে আসছে। মোকাবেলা করার মত শক্তি তার নেই। সামনে টিলা ও পার্বত্য এলাকা। এক সালার বললেন– 'তোমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাও। একাকী হয়ে যাও।'

ধাওয়াকারীরা এখনো অনেক দূরে। তারা দেখল, পলায়নকারীরা পরস্পর আলাদা হয়ে পাহাড়ের অভ্যন্তরে হারিয়ে গেছে। তাদের গতি শ্লথ হয়ে যায়। পলায়নকারীরা তাদের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

[চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত]
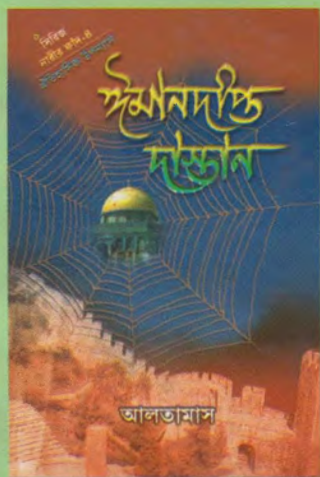
দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃষ্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে আটকিয়ে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরী করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান

আবাবীল পাবলিকেশন্স